

# সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প



It isn't cover

*If you want to download  
a lot of ebook,  
click the below link*



**Get *More*  
Free  
eBook**

**VISIT  
WEBSITE**

*[www.banglabooks.in](http://www.banglabooks.in)*

**Click here**



# সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

( প্রথম গদ্য )

পুষ্প

বাসুদেব এভিনিউ, কলকাতা পঞ্চাঙ্গ

সম্পাদনা  
সুদর্শন বসু

প্রথম প্রকাশ  
৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩

প্রকাশক  
আশিস দত্ত  
পদ্ম  
১০, বি ব্লক, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলকাতা-৫৫  
প্রবন্ধ—ঘোষ লাইব্রেরী

মুদ্রক  
চিন্তাজিৎ দে  
অরোরা প্রিন্টার্স  
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯



## ভূমিকা

দেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে বাঙলা সাহিত্যের  
শ্যাপট বা পরিসর অনেক ছোট, নিম্নদৃষ্টিদের এ অপবাদ দীর্ঘদিনের।  
ক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি অনেক, অবকাশ নেই তর্কের জাল বুননে সন্দেহাতীতভাবে  
বক্তনকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার—তবুও বাংলা সাহিত্যে সামান্যতার কয়েকটি  
কাণের অন্ততঃ একটির স্বামী শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় নিজেই, একথা রসিকরা  
মেশাই স্মরণ করেন। অনতিদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়ণে  
হু উচ্চারিত এ কথাটি তাঁর অমিত সম্ভাবমূল্যতা থেকে ক্রম উত্তরণ  
এ প্রাপ্তি বিষয়ক স্থিতির দ্যোতক।

চট্টোপাধ্যায়ের লেখার মূল্য বিষয় মানুষ, বহু উৎকর্ষতা নিয়ে  
দুঃ-আধাসুদুঃ মানুষ এবং ক্রমবিস্তারিত উদাসীনতা থেকে হৃদয়হীনতা।  
তার আছে সারি সারি নিঃসঙ্গ মানুষ, দীর্ঘ পদযাত্রায় ক্লান্ত, কুণ্ঠায়  
হায্য ভিক্ষার পথেও যান না, জানেন প্রায় সকলেই ভিক্ষুক, দাতা নেই,  
হীতা সারি সারি। অসম্ভব নিঃপ্রভ মূখ শ্রী চট্টোপাধ্যায় তাঁর  
গল্প সাজান—হাসির কি? এত আদ্র মূখ নিয়ে হাসির গল্প লেখা সম্ভব?  
শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের হাসির গল্প তাই হাসির গল্প হলেও বিমর্ষ,  
ঃ এবং নিঃসঙ্গ। এরই মধ্যে বহমান জীবন এবং মৌক  
শস্ত্র প্রয়াসের দ্বৈতদ্বৈত।

বর্মান শ্রেষ্ঠ গল্পের সংস্করণে সন্নিবেশিত গল্পসমূহের মধ্যে তাঁর  
খিঞ্জ স্বাদের ৫৭ মেজাজের ১৩টি গল্প রয়েছে। মূল লক্ষ্য ছিল  
মেকের সাহিত্যজীবনের প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পসমূহকে ধরা।  
আ করি এই সংকলন পাঠক-সমাজে যথোচিত মর্যাদা লাভ করবে।



উৎসর্গ  
শ্রীঅশোক দাস  
বঙ্কুবরেষু

# সূচীপত্র

তৃতীয় পদ্রুঘ	৯৮
বৃদ্ধবৃদ্ধ	২৮
টেকি	৪৫
পি এ	৬৬
প্যান্টের বোতাম	৭৩
অ্যাকোয়ারিয়াম	৮২
মোনার বাংলা	১০৩

ডেলিভারি	১২৩
ভাসের ঘর	১২৯
স্পেসাল অফিসার	১৫৬
আজ আছি কাল নেই	১৬২
আমার ভূত	১৭০
মাইডিং	১৭৬







## তৃতীয় পুরুষ

সদরে গাড়ি থামার শব্দ হল। মিটার ফ্যাগ তোলার স্কীপ একটু শব্দও শোনা গেল। বস্কমের কান সজাগ ছিল বলেই, রেডিও চলা সত্বেও শুনতে পেল। খাটের বাজুতে ঠেসান দিয়ে, ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে, বস্কম সকালের কাগজ পড়িছিল, রেডিও-ও শুনছিল, পাশের বাড়ির শাশুড়ী বউয়ের প্রার্থনিক প্রাতঃকালীন বগড়ার দিকেও কান রেখেছিল। এখন গাড়ি থামার শব্দ এবং মিটার ফ্যাগ তোলার ক্রিং শব্দটাও শুনল। বস্কম একসঙ্গে অনেক দিকে মনোযোগ দিতে পারে বলেই, তার জীবনে বোধ হয় কিছু হল না। বহুমুখী মন নিয়ে বস্কমের কেরিয়ারের বারোটা বেজে গেল। বস্কমের মেকাস'দের অন্তত সেই রকমই ধারণা।

ক্রিং শব্দটা হতেই বস্কম চট করে উঠে রেডিওটা বন্ধ করে দিল। হাত দিয়ে মাথার চুল খানিক এলোমেলো করে নিল। খাটের মাথা থেকে একটা

চাদর নিয়ে গায়ে জড়ালো। এখন এই রকম একটা অসুস্থতার মেক-আপ নিয়ে তাকে প্রতিমার সামনে দাঁতে হবে। তাতেও শেষ রক্ষে হবে কিনা সন্দেহ। বস্কিমের বউ ফিরে আসছে নার্সিং হোম থেকে, তাদের জন্সেন্ট ডেন্চার, প্রথম সন্তান কোলে নিয়ে। ফিরিয়ে আনছে বস্কিমের পিসতুতো বোন। বিয়ের বছর না ঘুরতেই, বস্কিম প্রাউড ফাদার।

বস্কিম কিস্তি জানে, সে মোটেই প্রাউড নয়, বরং কাওয়ার্ড। সে নৈকে কোনো দিনই ফাদার বস্কিম বনে ভাবতে পারেনি। তার ধারণা, ফাদার হবার যোগ্যতা একমাত্র তার ফাদারেরই আছে। তিন কি বড় জোর চার বছর বয়সে মা মারা যাবার পর তার জীবন একেবারে কানায় কানায় পিতৃময়। তার মন, ভাব, ভাবনার আকাশ আচ্ছন্ন করে পিতা পরমেশ্বর। শৈশবে পিতৃভক্তির আতিশয্যে বস্কিম স্নর করে সকাল সন্ধ্যা পিতৃপ্রার্থের মন্ত্র পাঠ করত—পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম। বস্কিমের এক জ্যাগাইমা ঘাঁঠোঁটকাটা, কটুভাষী, কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে পরিচয় আছে, তিনি একদিন বস্কিমের ভুল খরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ‘এ কি রে? এ তো মাথা ন্যাড়া করে, ঘাটে বসে পিণ্ডাৎসর্গের সময় পড়তে হয়।’ বস্কিম সত্য মিথ্যে জানার জন্যে পিতা পরমেশ্বরকে প্রশ্ন করেছিল। ভয়ও ছিল, প্রার্থের মন্ত্র পড়ে জীবিত পিতার পরলোকের পথ প্রশস্ত হবে ফেলছে না তো! তিনি বলেছিলেন, ‘ও সব সংশয়বাদীদের কথা। ভক্তিমার্গে এসব বাধা ইগনোর করবে। পিতা আর পরমপিতার শ্রদ্ধা তিনটি শব্দের তফাৎ— প র আর ম। পিতাকে যে সন্তান পরম পিতা করে নিতে পারে তার আর মার নেই। পিতার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। নে সেই গানটা গা। তোর দাদুর সেই গানটা।’ বস্কিম সংশয়মুক্ত মনে, সিংগল রিডের হারমোনিয়াম বাজিয়ে, চাঁচা ছোলা গলায় গেরেছিল, সুখে ডালে বসি ডাকিছো পাখি রে, ডাকিছো কি সেই পরমাপত্নী।

চোখ বুজিয়ে বস্কিম বহুব্যবহার মাকে দেখবার চেষ্টা করেছে। পারেনি। দেবদেবীর মূর্তিও আসতে চায় না। চোখ বুজলেই পিতা পরমেশ্বর—সিনিক্যাল মুখ, পাতলা নাক, ডগাটা অঙ্গ একটু বেকে কমার মত পাতলা ঠোঁটের ওপর বুকে পড়ে গজাল গোঁফ জোড়াকে যেন জিজ্ঞেস করছে—কি হে ভান্না, ঠিকঠাক আছ তো! মাথার সামনে থেলার মাঠের মত একটি মসৃণ টাক। তাঁকু দুটি চোখ, লিভারের গ্যাঁড়াকলে প্রায়ই হলুদ বর্ণ।

সোনালী ফ্লেমের শোখীন চশমা। একেবারে স্ট্রেট ইরেকট্ মেন্দুসন্ত। সামনে লুটানো কৌচা। ফাইন ধূতি। কালো ককঝকে জুতোর ওপল্ল রাস্তার মিহি ধুলো। সাদা টেনিস সার্ট। ক্রিম কালারের কোট। গটগট করে মিলিটারিদের মত হাঁটা। জুতোর গোড়ালির শব্দ কি! খট্‌খট্‌। নিম্নল ববে কামানো দাড়ি। সদা গম্ভীর মুখ। সে মুখে মেরেল মূর্চক হাসি বস্কিম কখনও দেখিনি। বছরে একবার বিজয়ার দিন একটু সিন্ধি খেয়ে পরমেশ্বর যখন হাসতেন, বস্কিম সে হাসির নাম রেখেছিল—একতলা-দোতলা। হাসির রোল লাফাতে লাফাতে ধাপে ধাপে উপরে উঠে যেত, আবার নেমে আসত ধাপে ধাপে। স্বরযন্ত্রের স্বচ্ছন্দ বিহার। পাড়ায় আর একজন মাত্র মানুষের এই রকম হাসি ছিল। তাঁর নাম ছিল সন্তোষদা। বাড়ির পাশেই পান বাড়ির দোকানের মালিক। তাঁর হাসির অবশ্য একটা ডিফেক্ট ছিল। পরমেশ্বরের হাইটে উঠত ঠিকই, তবে ওই খোল ফাটা তুবাড়ির মতো। শেষ ধাপে উঠেই হাসি হয়ে যেত ব্রুকাইটিসের কাশি। সন্তোষদা কাশতে কাশতে শেষকালে বুকটা চেপে ধরে, ‘ওরে বাবারে, ওরে বাবারে’ বলে আত্ননাদ করে উঠতেন। সন্তোষদা দিনে শখানেক বাল্ল হাসতেন। তখন বাঙলা দেশে হাসির কাল চলেছে। বিবতীর বিস্কুয়েন্ট টাকা হাওয়ায় উড়ছে। পরমেশ্বর হাসতেন বছরে একবার। সেই কারণে একটায় ছিল নাদ, অন্যটায় আত্ননাদ।

বস্কিমের মনে যে ফাদার ফিগার বা ফিগার ফাদার ছিল, তা পরমেশ্বরের আদলে ঢালা। ঠুম্রি নয়, একেবার ধূপদ। বস্কিম নিজেকে একেবারে উল্টো। পরমেশ্বর তাকে ইটারনাল সান করে গড়ে তুলেছিলেন। তার ভেতর থেকে পিতৃনির্ঘাসের শেষ বিস্কুটুকু বের করে নিয়ে বস্কিমকে এমন কায়দায় মানুষ করেছিলেন, মেয়েছেলে দেখলেই যেন গো-বৎসের মত হাম্মা, মা মা করে ওঠে। বস্কিম নিজেকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল—ফাদার হবার কোনো কোয়ালিটিই তার মধ্যে নেই। সারা পৃথিবীতে বাবাদের যদি কোনো স্ট্যাডার্ড স্পেসিফিকেশান তৈরি করে কোয়ালিটি মার্ক দেবার প্রথা থাকত, তাহলে সেই স্ট্যাডার্ড তৈরি হত পরমেশ্বরকে দেখে। পরমেশ্বর চিরকালের ফাদার, বস্কিম চিরকালের সন্তান। বস্কিমের ভাব সন্তানভাব। তার ভেতরটা কেবলই বাবা বাবা করছে। কিন্তু বিখির বিখানে, সেই বস্কিম আজ ফাদার। পরমেশ্বরের সমর্থন ছাড়াই এই অর্শনিসম্পাত। সে নিজেকে এককাল



বাবা, বাবা করেছে, এইবার তাকে বাবা বাবা করবার এতটুকু একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে।

প্রতিমা বৃকের কাছে এতটুকু একটা তোয়ালের পাসে'ল ধরে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে আসছে। বণ্ঠিকম লাজুক লাজুক মুখে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। মৃদু দেখলে মনে হবে বণ্ঠিকমই যেন মাদার। আর প্রতিমা যেভাবে উঠে আসছে মনে হচ্ছে সেই যেন ফাদার। যেন পরমেশ্বর বাজার করে ফিরছেন, বগলে একটা এক পাউণ্ড রুটি। বণ্ঠিকম চোরের মত এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে দেখল। যেন কত বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছে! দু'জন থেকে তিনজন হয়েছে। প্রতিমার গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটা এখন কিছ্‌রুতেই আর চেপে রাখা গেল না, সারা শরীরে এবং ব্যবহারে মায়ের দয়ার মতই শনৈঃ শনৈঃ প্রকাশিত হল, তখন পরমেশ্বর ছেলেকে বলেছিলেন—‘মাল্টিপ্লিকেশান ইজ এ রুল বাট ডোন্ট মেক ইট এ ন্যাচারাল প্র্যাকটিস।’ সেই সারমন শোনার পর থেকেই বণ্ঠিকমের লজ্জা ও অপরাধ বোধটা আরো বেড়ে গেছে।

আর তিনটে ধাপ ভাঙলেই প্রতিমা দোতলায় উঠে আসবে। বণ্ঠিকম সারা মৃদু একটা নির্বোধের হাসি ছাড়িয়ে, লম্বা-তজ্‌নীটা একটা হৃকের মত সামনে বাড়িয়ে, চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল—‘এইটা, এইটা?’ প্রতিমা কোনো উত্তর দিল না। শৃদু একটু থেমে কটমট করে তাকাল। বণ্ঠিকম ভয়ে ভয়ে বলল—‘একটু হাত দেবো?’ স্পর্শ করার জন্যে আঙুলের হৃকটা একবার বাড়িয়েও ছিল। তোয়ালের মোড়কটা বৃকের কাছে আড়াল করে প্রতিমা বললে—‘না।’ প্রতিমার স্বাভাবিক গলাই লাউডস্পীকারের মত। ‘না’টা একটু জোরেই বলেছিল। সারা বাড়িটা যেন শিউরে উঠল। বণ্ঠিকম তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়াল। প্রতিমা গট গট করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। প্রতিমার কাঁধের পাশে হলদে কাপড়ের একটা সাইড ব্যাগ ঝুলছে। সাইড ব্যাগে কি আছে, কে জানে! আসল বস্তুটা ব্যাগে নেই তো।

বণ্ঠিকম জানে প্রতিমার পক্ষে সবই সম্ভব। একবার একটা দুর্ধৃচোর হৃলোকে বাজারের ব্যাগে ভরে মাইলখানেক দূরে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। যদিও বেড়ালটা প্রতিমা ফেরার আগেই ফিরে এসে আবার ঘরে বসান্ধানে গ্যাট হয়ে বসেছিল। এই সিঁড়িতেই একবার প্রথম রাতে একটা ছিঁচকে চোরের হাত থেকে নতুন তোয়ালে, গেঞ্জি, আরো কি কি সব কেড়ে নিয়ে, চোয়ালে

একটা আন্ডারকাট ঝেড়েছিল। চোরটা শেষ ধাপে ছিটকে পড়ে বলেছিল—মা, এমন ঘৃষি থানার বড় দারোগার হাত থেকেও খালাস হবে না। ঘৃষির প্রশংসায় খুঁশি হয়ে প্রতিমা চোরকে নতুন গেঞ্জিটা উপহার দিয়েছিল। পরমেশ্বর অবশ্য বলেছিলেন, বাইরের লোকের সামনে ঘোমটা দিয়ে বেরোলে শালীনতা বজায় থাকে। প্রতিমা বলেছিল, এর পর চোরে আপনার তোয়ালে কি জ্বুতো চুরি করতে এলে ঘোমটা দিয়েই ঘৃষি চালাব। এই প্রতিমাই পরমেশ্বরের হাট্ এটাকের সময়, পাড়ার এক জুনিয়ার ডাক্তারকে সাইকেলের পেছনে বসিয়ে পড়ি কি মরি করে নিয়ে এসেছিল। বিষ্কম তখন অফিসে। পরমেশ্বর সুস্থ হতে হতে বলেছিলেন, বউমার জন্যে এ যাত্রা বেঁচে গেলুম। সুস্থ হখে বলেছিলেন--হি-ওম্যান। গোর্ফ থাকলে ওই বিষ্কমের স্বামী হত। প্রতিমা সব পারে, কেবল মেয়েছেলে হতে পারে না।

বিষ্কম পারে পায়ে ঘরে এসে ঢুকল। প্রতিমা ইতিমধ্যে খাটে পা মূড়ে বসেছে। কোলের ওপর তোয়ালেতে এতটুকু একটা লাল মত মানুষ। মানুষের বাচ্চা যে এত জঘন্য দেখতে হয় বিষ্কমের ধারণাই ছিল না। মাথায় কয়েক গুচ্ছ লোম। ওকে চুল বলা যায় না। মূখটা অনেকটা আলুপোড়ার মত। গায়ের চামড়া যেন রোস্টেড রাঙাআলু। পেটে একটা কাপড়ের পটি। ওই জায়গাটাতেই ছিল প্রতিমার সঙ্গে নাড়ীর যোগ। জীবনের ভাইটাল সাম্প্লাই লাইন। কোথায় দুখের টিনের গায়ে আঁকা সেই একমুখী কোঁকড়া চুল, নীল আকাশের মত চোখ বাচ্চা! একটু আগের স্পর্শ করায় ইচ্ছেটা তার আর নেই। প্রতিমাকে কত সুন্দর দেখতে। এক মাস নার্সিং হোমের যত্নে থেকে রং যেন ফেটে পড়ছে। মূখের চামড়া একেবারে টাল তেলা তেলা। চোখ দুটো মনে হচ্ছে অরোলিং ক্রিনিং করে নতুন ফিট করা হয়েছে। মণি দুটো বকবকে কালো। সেই প্রতিমার জঠর থেকে এইরকম একটা আগলি জিনিস বেরোলো। নিজের সৃজনী শক্তির ওপর বিষ্কমের ঘোষা ধরে গেল।

বিষ্কম রাস্তার ধারের জানালার গরাদ ধরে দাঁড়াল। মানুষের বাচ্চা সে একটু বড় অবস্থায় দেখেছে। ফ্রেশ ফ্রম এবডোমেন, সে দেখেনি। পাশের বাড়ির গরুর বাচ্চা সে ডেলিভারী হতে দেখেছে। মার পেট থেকে পড়েই খোলা মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়লো। চারটে পা তখনো ছোটায় অভ্যস্ত নয়। খড়াস খড়াস করে বার কতক আছাড় খেল। তবু পৃথিবীর মাটিতে পর

স্বাখবার কি আনন্দ। ধবধবে সাদা রং। বড় বড় নতুন চোখ। বস্কিম ভাবে বিভোর হয়ে মনে মনে বলেছিল—ও ক্রিয়েটর! কি সুন্দর, কি সুন্দর! মানুষের বাচ্চা গরুর মত হবে সে একসপেকটও করে না, ডিজাখারেবলও নয়। তাহলেও এই কি একটা স্যাম্পল! সে ছাগলের বাচ্চা, খরগোসের বাচ্চা, কুকুরের একসঙ্গে আটটা বাচ্চা, বেড়ালের বাচ্চা, মুরগীর একগাদা বলের মত বাচ্চা দেখেছে। একমাত্র পাখির বাচ্চা ছাড়া এত কুৎসিত প্রোডাকসন সে আর দেখেনি।

বস্কিম জানলার পাশ থেকে সরে এসে, খাটের আর একদিকে বসে একটু উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করল, ‘এই রকমই হয় বুদ্ধি?’ প্রতিমা এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি। রাগে জ্বলে যাচ্ছিল। পুরো একটা মাসের বারুদ, এক কথায় ভিস্‌কুভিয়াসের মত ফেটে পড়ল—‘হ্যাঁ এইরকমই হয়। স্বার্থপর, চোর, জোচ্চোর, ধাম্পাবাজ, চিটিংবাজদের ছেলে এইরকমই হয়। কথা বলতে লজ্জা করছে না। এ ছেলে তোমার নয়।’ ভার্গিয়াস বুদ্ধি করে বস্কিম ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। এ সব ডায়ালগ পিতা পরমেশ্বরের কানে গেলে রক্ষে নেই। একেই তিনি সেদিন বলেছিলেন—‘আমার ছেলেটা সেন্টাল ইনোসেন্ট ছিল। পাঠশালা পড়ে পেকে গেল।’ কথা হচ্ছিল বোনের সঙ্গে। বস্কিম ওস্তার হিয়ার করেছিল। ‘জেনে রাখবি, ভাল যখন খারাপ হয় তখন খারাপকেও সে ছাড়িয়ে যায়।’ পরমেশ্বরের সঙ্গে প্রথম থেকেই প্রতিমার সম্পর্ক খুবই খারাপ। দর্শনেই অ্যালার্জি। বিয়েটা নেহাত গোলেতালে হয়ে গেছে। পরমেশ্বরের বন্ধু অক্ষয়বাবু আবার হাত দেখেন। বস্কিমের মনে আছে, বেশ কিছুকাল আগে পরমেশ্বর বলেছিলেন—‘দেখ তো অক্ষয় এর হাতটা একবার। একমাত্র ছেলে। সংসারে থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।’ বস্কিম তখন মা বলতে মূর্ছা যায়।

অক্ষয়বাবু হাত দেখে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—চন্দ্র ইজ ভেরি গুড। উচ্চ চিন্তার কারক। বহুস্পতি ইজ ভেরি স্ট্রং। সেভ করবে। বার্চিং বার্চিং নিয়ে যাবে শেষ জীবন পর্যন্ত। তবে তবে। বার কতক তবে তবে করে বললেন—সন্ন্যাসী। নো চানস। শুরুরটা ফেরোসাস হয়ে আছে। বাঘের মত। বরং একটু সাবধানে থাকা উচিত। আচোট কাগজ, চোট করে দিতে পারে। ওয়ান ড্রপ অফ ইক, ফিনিশ। সাদা আর সাদা থাকবে না বাবালাইন, স্পটেড, কলারিকত।

পরমেশ্বর মুখে এই শাস্তটিকে ‘ফেক’ বলতেন। বলতেন বোগাস। কিন্তু যেহেতু অক্ষয়বাবু একটা খারাপ সম্ভাবনার কথা বলেছেন, পরমেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ধুবসত্য বলে ধরে নিলেন। পরমেশ্বর ভাল দেখতে পান না, দেখতে পারেন না, ভালতে তাঁর বিশ্বাসও নেই। অক্ষয়বাবু ভাল কিছু বললে জ্যোতিষশাস্ত্র বাজে হয়ে যেত। খারাপ বলে পরমেশ্বরের বিশ্বাসে শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। আব বস্কিমও সেই শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথেই আচোট কাগজে চোট খেল। প্রতিমাই সেই কালির আঁচড় ধরেই মেরে দিয়েছে। খানায় ফেলে দিয়েছে।

বস্কিম-রূপ-দুর্গকে দখলে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিলেন পরমেশ্বর। পারেন নি। প্রতিমার কাছে সেই দুর্গের পতন হয়েছে। মেবারের রানা মোগলাই বাহিনীর ধাক্কায় পরাজিত। পরমেশ্বরের প্রতিরোধ চূরমার। অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে ছেলের নোটবুকে শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন—স্ট্রীয়াঃ সমস্তা সকলা তৎগৎসু। চার্বকি না অন্য কোনো একটা মূর্খির মেয়েছেলে সম্পর্কে এটা ড্যামেজিং কোটেশনও ছেলেকে শিখিয়েছিলেন। সবটা বস্কিমের মনে নেই। একটু যা মনে আছে তা হল—মৃত, পুরুষ ভাবিতে। অর্থাৎ বর্তমানে একটা মাংসের দলা নিয়ে যে প্রতিমা খাটে বসে আছে আইবুড়ে বেলায় তার বাইরের রূপ দেখে—ডোন্ট গেট চাম্‌ড। তত্ত্বদর্শী মূর্খি বলছেন—বস্কু, সি ইজ নাথিং বাট কিছন্ন মল, কিছন্ন মৃত, কিছন্ন কফ, কিছন্ন পিত্ত। এত করেও ছেলে বাঁচল না। লাইফ সেভিং কিট নিয়েই বস্কিম ভুড় ভুড় বরে জলে ডুবে গেল। হিতোপদেশের গল্পে আছে নিমন্ত্ৰমানকে উদ্ধার করা করে তাঁরে দাঁড়িয়ে উপদেশ ছুঁড়ে দিতে হয়। পরমেশ্বর উপদেশের মধ্যে একটি উপদেশই ছেলেকে দিলেন—‘গোয়িং দি ফ্যামিলিওয়ে, সব সময় মনে রাখবে, রেট অফ মাল্টিপ্লিকেশন ইজ ডাইরেক্টলি প্রোপোরশনাল টু রেট অফ একসপেনডিচার।’ এই একটি কথা বলেই পরাজিত পরমেশ্বর, পুত্র আর দুচোখে দেখতে পারি না—পুত্রবধুর সংসারে, নিজের চারপাশে একটা ম্যাভিনো লাইন দাঁড় করিয়ে দিলেন। বস্কিম যদি হিটলার হত তাহলে হয়তো রিংসক্রিগ করে উড়িয়ে দিতে পারত। সে নেহাতই জরু কা গোলাম।

বস্কিম বিছানায় হাতের চেটো দুটো ইকির মিকির চার্মাচিকির খেলার ধরনে পেতে, মিনমিনে গলায় বউকে বললে—‘চেঁচাছো কেন? পাড়ার লোককে আমাদের প্রাইভেট কথা শুনিয়ে কোনো লাভ আছে?’ বস্কিমের



আবেদনে কোনো লাভ হল না। প্রতিমার স্বাভাবিক গলাই ‘জি’শাপে বাঁধা, তার উপরে উত্তেজিত। বঙ্কিম একটু কম্পনাপ্রবণ, নরম প্রকৃতির লোক। হৃদয়টি প্রীতিচেন্যের, শরীরটাই যা কেবল অকেজো বঙ্কিমের। ছেলে কোলে প্রতিমাকে যীশু কোলে মাতা মেরী ভেবে এই প্রচণ্ড মন্থরা অবস্থাতেও ভালবাসা যায় কিনা, বঙ্কিম চেষ্টা করে দেখল। প্রতিমা কাঁদিয়ে উঠল, ‘চৈ’চাবো না মানে? আমি ঢাক পেটাবো। তোমরা বাপ-ব্যাটা মানুস না অমানুস?’ মেরীমাতাকে চিন্তায় আনা গেল না। বঙ্কিম ‘বাপ’ শব্দটাকে সহ্য করতে পারে না। বাবা বলতে দোষটা কি? সেও এবার শব্দর মশাইকে সসদর বলবে, শাশুড়ীকে সাউড়ি। বঙ্কিম মৃদু প্রতিবাদ করল। স্ত্রীকে প্রয়োজন শাসন করা যায়, কিন্তু যে স্ত্রী সদা মা হয়েছে তাকে এখনি কি কড়া কথা বলে! সহজ ডেলভারি নয়, সিজারিয়ান। অনেক স্টিচ পড়েছে, এখনও পুরো শুকোয়নি। স্টিচটা কোথায়! স্টিচ কেমন! বঙ্কিমের জানার কৌতূহল ভীষণ। প্রতিমা নিজের বউ হয়েছে এমন বিহেত করছে, যেন পরস্ত্রী! বঙ্কিম বললে—‘ব্যাপারটা তোমার সঙ্গে আমার, এর মধ্যে বাপ বাপ করে সেই এলুফ বৃদ্ধকে টানছ কেন?’ প্রতিমা কোনো যুক্তিই মানে না, ঘোড়ার ডিম। সে সেই একই ভল্যুমে বললে—‘টানবো না মানে? এইবার গলায় ছাতার বাঁট লাগিয়ে দুটোকেই টানবো। লজ্জা করে না, বাপ ব্যাটায় পরামর্শ করে খরচের ভয়ে ভুঁড়িটা একটু বড় হতেই.’ বঙ্কিম সামলে দিলে—মাইণ্ড ইণ্ডর ল্যাগুয়েজ। বাপ তবু সহ্য করা যায়, ভুঁড়ি শব্দটা দেখতেও যেমন শুনতেও তেমনি আগলি। প্রতিমা বললে, ‘গ্লাথো তোমার আগলি, আগলির নিকুচি করেছে। আমার ইচ্ছে করছে,’ দাঁত কিড়মিড় করে প্রতিমা বললে, ‘তোমার কাপড় খুলে...!’ আর নয়। বঙ্কিম বললে, ‘তোমার পেটে ওয়ার্ম’স হয়েছে, যেরকম দাঁত কিড়মিড় করছে, নাক ঝুঁটে ইচ্ছে করে? এক ডোজ ‘সিনা’ দিতে পারলে ভাল হত।’

‘ওয়ার্ম’স যেটা হয়েছিল সেটা এখন কোলে। সিনা খেয়ে তোমার ওয়ার্ম’স মারো। রোগটা ভীষণ ছোঁয়াচে।’

বঙ্কিম আর বসতে পারল না! দাঁড়িয়ে পড়ল। অসম্ভব। সে যদি হিপনোটিক্সম জানত! এ-ময়েকে বশে আনার ক্ষমতা রাখে একমাত্র সার্কাসের রিং মাস্টার। পরমেশ্বর ঠিকই বলেছিলেন—যেসব মহিলার গড়ন ডেরো পিপপড়ের মত হয়, দেখতে ভাল হলে কি হবে, স্বভাবে তারা প্রতিমার মত

হয়। গুরুজন-বাক্য শোনেনি, তখন তো প্রেম-যমুনায় ঢেউ গুনেছে, এখন তো ম্যাও সামলাতেই হবে। অবশ্যই এ তরফের কিছন্ন ল্যাপসেস আছে। জা বলে বাড়িতে ঢুকেই এইভাবে তাদের পিঁণ্ড চটকানোর কোনো মানে হয়। এটা কি ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে শোভন! বিষ্কমের কি দোষ! সে তো হেল্পলেস হাবি। সংসারের কন্ট্রোল গিয়ার তো পরমেশ্বরের হাতে। বিষ্কম যা রোজগার করে, ডিউটিফুল ছেলের মত মাসে মাসে তুলে দেয় পরমেশ্বরের হাতে। সংসার নামক স্টেজকোচের সঙ্গে সেই কেবল টিকিটধারী যাত্রী, প্রতিমা তার লাগেজ। গাড়ির গায়ে যাত্রীদের জন্যে, পরমেশ্বরের গুয়ানিঁং, মাল নিজ দায়িত্বে রাখুন। মাল এবং মালের জন্যে ড্রাইভার কাম কনডাক্টার পরমেশ্বরের কোনো রেসপনসিবিলিটি নেই। বিষ্কম নিজের দায়িত্বে ফাদার।

পরমেশ্বর হিসেবী মানদুষ। তাঁর নানা হিসেব। অসংখ্য খামে অসংখ্য ফান্ড। খামগুলোর রং গোলাপী। কারণ বিষ্কমের ফুলশয্যার তত্ত্বে স্বশ্রু-মশাই মেয়েকে চিঠি লেখার জন্যে যে রাইটিং সেট দিয়েছিলেন তার মধ্যে এই খামগুলো ছিল। বিয়ের পর আর প্রেম থাকে না। গোলাপী খাম ইউসলেস। পরমেশ্বরের কাজে লেগে গেছে। কোন খাম ‘এডুকেশন ফান্ড,’ কোনো খাম ‘ফেস্টিভ্যাল ফান্ড,’ একটা ‘অফেসানাল বুক পারচেজ ফান্ড,’ এইভাবে ‘ট্রিটমেন্ট ফান্ড,’ ‘লুচি, ফান্ড,’ ‘আমিউজমেন্ট ফান্ড।’ সবচেয়ে বড় ফান্ড, যেটা খামে ধরে না, সেটা হল—‘হাউস বিলডিং ফান্ড।’ মাসে মাসে থোক টাকা ব্যাঙ্ক জমা পড়ছে—সবার আগে বাসস্থান। পরমেশ্বর বলেন, সব কিছন্ন কার্টেল করে আগে একটা মাথা গোঁজার ঠাই। বেশ কণ্ঠেই সংসার চলে। প্রতিমা জানে, কতদিন রাতে কুমড়োর ঘ্যাট আর রুটি খেয়ে, দুজনে পাশাপাশি শূদ্রে, মৃখে বড় এলাচের দানা ফেলে মাঝরাত অবধি গজগজ করেছে, দখীচির হাড় দিয়ে বাড়ি তৈরি হবে অবশেষে, সেই বাড়ি হবে আমাদের সমাধি, তোমার আমার প্রেমের তাজমহল সেই খামফান্ড বা ফান্ডখামে প্রেগনান্সির কোনো প্রতিদান ছিল না। পরমেশ্বরের হিসেবে—বিষ্কমের একসপেকটেড ফাস্ট ইন্সদ্য—পাঁচ বছর পরে। বিষ্কম যদি স্লিপ করে, বিষ্কমের বাবা কি করবেন? পদ্রোটেই এখন বিষ্কমের দায়িত্ব।

ফাস্ট ইন্সদ্য, রিসক অনেক, এ বাড়িতে দেখাশোনা করার দ্বিতীয় কোনো মহিলা নেই, এইসব যুক্তিপূর্ণ কথা বলে প্রতিমাকে বাপের বাড়ি পাঠার করা হয়েছিল। তাতে অপরাধটা কি হয়েছে! বেশির ভাগ মেয়েই ভে

প্রথম মা হবার সময় বাপের বাড়িতেই হ'ল। বণ্ঠিকম বললে—‘ঠিক আছে, আমি পার্টটাইম করে, যা খরচ হয়েছে হিসেব করে তোমার বাপকে ইনস্টলমেন্ট শোধ করে দেবো, দরকার হলে ইন্টারেস্টও দেবো।’ বণ্ঠিকম ইচ্ছে করেই বাপ বলল। বাপে বাপে কাটাকাটি।

‘তোমার টাকায় তারা...’

তারা যা করে দেন, অন্তত, প্রতিমা যা বললে বণ্ঠিকম উচ্চারণ করতে পারবে না।

‘টাকাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল মন। সেই ছ'মাসে আমি গেছি, তোমাদের বাড়ি থেকে কেউ একবার দেখতে গেল না। আড়াই টাকা দামের গোটাঁকতক চার্টার আপেল হাতে বরে অন্তত একজনও কেউ একদিন যেতে পারত। তোমার কথা ছেড়েই দিচ্ছি। তুমি তো এগটা মেঘ। লাইব্রেরির হোলি ল্যান্স।’

বণ্ঠিকম দমে না গিয়ে নিজেদের ডিফেন্সে বললে ‘আব কে আছে যে যাবে? যেতে হলে বাবাকেই যেতে হয়। তিনি এসব পছন্দ করেন না।’

‘কি পছন্দ করেন না?’

বণ্ঠিকম বললে—‘মানুষের বাচ্চা হওয়া। আমি সন্মাবার পরই মা মারা গেলেন তো, সেই থেকে বাচ্চাতক। তাছাড়া আব একটা মাথাব্যাক ব্যাপার আছে। ওই হিজড়ে।’

‘হিজড়ে মানে?’

‘একদল হিজড়ে আসে না, বিগ্ৰীভাবে হাততালি দিতে দিতে, কাব হল গো, কার হল, খোঁকা হল না খুঁকি হল।’ বণ্ঠিকম সদর করে বলল। ‘এনিহাউ ওটাকে স্টপ করতে হবে।’

প্রতিমা অবাক হয়ে বলল, ‘বাস্থা, একখানা বাড়ি বটে। পাগলের বংশ বলব, না শয়তানের বংশ! এমন জানলে গভ'পাত করিয়ে আসতুম।’

পাগল কিংবা শয়তান দুটো বিশেষণই বণ্ঠিকমের পছন্দ হল না। হজম করা ছাড়া উপায় নেই।

প্রতিমার আর এক প্রশ্ন আক্রমণ—‘তোমার কি হয়েছিল শুননি? মাসখানেক না, হয় অসুখে ভুগেছ। তারপর? একবার নার্সিংহোমে যেতে কি হয়েছিল? মজা মারবার সময় মেরেছিলে, তারপর যে মরছে সে মরছে, তাই না? স্বাধ'পর, খলিফা।’

বিক্রম বললে, 'ছি ছি, সে কি কথা? আসলে লজ্জা করছিল। সবাই আঙুল দাঁতের বলাবে, ওই দেখ, ওই ছেলের বাবা। বিচ্ছিন্ন ব্যাপার যা করে ফেলেছে ফেলেছে। আমাদের মধ্যেই থাক। লোক জনাজানি করে লাভ কি?' বিক্রম এমনভাবে বলল, যেন কত অপরাধ বরে ফেলেছে! কুমারী বা বিধবার সম্মান হয়েছে!

বিক্রমের বাচ্চা এই সময় ওয়া ওয়া করে কেঁদে উঠল! 'ওমা, বাঁদে যে! থামো থামো, বাবা কি মনে করবেন?'

'তোমার বাবাও একদিন কেঁদেছিলেন। সব বাবাই কেঁদেছিল। যাও, বাইরে যাও, আমি একে খাওয়াবো।'

'কি খাওয়াবে?'

'আদিত্যেতা। শিগগির পরিবার একটা বাটিতে একটু গরম জল করে আন।'

এতদিন পিতাপুত্র বান্ধা বরে খাওয়াদাওয়া করছিল। মাঝে মধ্যে পরমেশ্বরের বোন এসে সাহায্য করছিলেন। এই তিন চাব মাস বিক্রম তার ব্যাচেলার লাইফ ফিরে পেয়েছিল। পরমেশ্বরও বেশ খুশি খুশি ছিলেন যেন হারানো ছেলে ফিরে পেয়েছেন। দিনের মধ্যে এক আধবার বিক্রম হাসতেও দেখেছে। আজ আবার অন্য পরিস্থিতি। বিক্রম বাসনাঘরে ঢুকে দেখল পরমেশ্বর গম্ভীর মুখে উল্লুনে চায়ের কেটলি চাপিয়ে উবু হয়ে দু'হাতে মাথা ধরে বসে আছেন। বিক্রম একটু লজ্জা পেল। চাটা তারই করা উচিত ছিল। আমতা আমতা করে বলল, 'সরুন, আমি করছি।' জল পান্ন ফুটে এসেছে সৌ সৌ শব্দ করছে। পরমেশ্বর একটা হাত কপাল থেকে সরিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। হাতটাকে আবার মথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—'আমিই করছি, তুমি এখন আদারওয়াইজ এনগেজড। তোমার সময় কোথা?' তবু বিক্রম চামচের পেছন দিয়ে চায়ের কোটোর ঢাকনা খোলায় বাস্ত হল। খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল—'ক'কাপ জল আছে?' পরমেশ্বর সেই ভাবেই বসে থেকে বললেন—'তিন কাপ। এক কাপ বেশি নিয়েছি।' বিক্রম বুকল। পরমেশ্বর প্রতিমারও জল নিয়েছেন। বিক্রম বলল—'আপনি ঘরে যান, আমি চা দিয়ে আসছি।' পরমেশ্বরকে বাসনা ঘর থেকে সরাতে না পারলে বিক্রম তার ছেলের জন্যে গরম জল বসাতে পারছে না। একেই প্রতিমা তেমন কাজের নয়, গোছানো নয় বলে প্রথম



থেকেই পরমেশ্বরের অফুরন্ত অভিজোগ। এখন বীক্ষমকে বউয়ের ফরমাইশ খাটতে দেখলে কি বলে বসবেন কে জানে! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পরমেশ্বর উঠে দাঁড়ালেন। উঠতে বেশ কষ্ট হল। ইদানীং কোমরে বাত আশ্রয় করেছে। যেতে যেতে বলে গেলেন—‘কড়ায় চি’ড়ে ভেজে রেখেছি। চায়ের আগে দিও। ও কতদূর কি জানে জানি না, তবে তোমার কিছু জানা উচিত, এই সমস্ত চি’ড়ে ভাজা, ঘিয়ে রসুন ভাজা, সাবু—এইসব খাওয়া উচিত।’

জলে চা ভিজছে। পরমেশ্বর যে পি’ড়েটায় বসেছিলেন সেই পি’ড়েতে এখন বীক্ষম। তারও মাথায় হাত। দিনটা আনন্দের না দুঃখের বোঝা দায়। বীক্ষম তার মায়ের অভাব এতদিনে ভাল করে বুঝল। সেদিনও বুঝেছিল, বুঝেছিল ফুলশয্যার দিন সকালে, যোদিন পরমেশ্বর তাদের ঘরে নতুন খাট ফিট করে ছেলের ফুলশয্যার শয্যা তৈরি করে দিচ্ছিলেন। রজনীগন্ধার মালা ঝুলিয়ে দিচ্ছিলেন চার দিকে। বীক্ষম সেদিন অসম্ভব লজ্জা পেয়েছিল। সে কেবলই ভাবছিল, কয়েক ঘণ্টা পরেই এই খাটে একটা মেয়ের সঙ্গে সে শোবে, শুধু শোবে না, নিজেদের আইবুড়ো অবস্থার উপর রঙীন মশারি ঝুলিয়ে দেবে, অন্ধকার মাঝ-রাতে ঘরের হাওয়ায় পরীর মত ডানা মেলে ফুলের গন্ধ উড়বে। এখন পরমেশ্বর অন্য ঘরে। নিদ্রাহীনতার রুগী। নিজের বিছানায় স্মৃতি সঙ্গী করে ভোরের অপেক্ষায় জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকবেন।

বীক্ষম স্টেনলেস স্টিলের বাটিটাকে অন্তত দশবার ধুলো। পৃথিবীতে সদ্য আগত অতিথি উষ্ণ জল খাবে। জল খাবে, কি অন্য কিছু খাওয়াবে প্রতিমাই জানে। অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে, কোনোরকম জীবাণু যদি একবার ঢোকে, কত রকম কি হতে পারে—পোলিও, ডিপথেরিয়া, জিআইএস, ব্যাসিলাই ডিসেন্ট্রি। পরমেশ্বরের হোমিওপ্যাথি বই পড়ে ভয়ংকর ব্যাধির জগতের অনেক তথ্য বীক্ষমের নখদর্পণে। প্রতিমার আবার চোরা অম্বল নেই তো! চেক করতে হবে। ভাবনার শেষ নেই। শিশুদ্রব্য হার এদেশে এখনও খুব বেশি। তাছাড়া এ ফ্যামিলির ফাস্ট ইস্যু বাঁচে না। রেকর্ড আছে। পরমেশ্বরের প্রথম কন্যা সন্তান দুমাস না তিন মাসের হয়ে পটল তুলেছিল। বেঁচে থাকলে বীক্ষমের একটা দিদি থাকত। বীক্ষমের জ্যাঠামশায়েরও সেই একই ব্যাপার।

দুর্ভাবনা আর গরম জল নিয়ে বীক্ষম ঘরে ঢুকতেই প্রতিমা তাড়াতাড়ি বীক্ষমের দিকে পিছন ফিরে বসল। ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছে। বীক্ষমের একটু হিঃসের মত হল। মনে মনে বললে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। বিছানার উপর

একটা ময়লা এক টাকার নোট অবহেলায় পড়ে আছে। বণ্ডিকম জিজ্ঞেস করল—  
 ‘এটা কি?’ ‘তোমার ছেলের মুখ দেখে গেল।’ ‘এর মধ্যে আবার কে মুখ দেখে  
 গেল?’ প্রতিমা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—‘বামুনদি।’ এই বামুনদি, এক  
 সময়, বণ্ডিকমদের যখন বোলবোলা ছিল, তখন রান্নার কাজ করত। বন্ধুকে পিঠে  
 করে বণ্ডিকমকে মানুষ করেছে। এখন অন্য বাড়িতে কাজ করলেও, পুরোনো  
 মনিব বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি। বণ্ডিকম টাকাটা মাথায় ঠেকিয়ে তুলে  
 রাখল।

গরম জলের বাটিটা নিয়ে প্রতিমা বললে, ‘বিন্দুক?’ ‘সর্বনাশ, বিন্দুক কোথায়  
 পাবে বণ্ডিকম! মুখটা কাঁচুমাচু করে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল। প্রতিমা  
 বললে, ‘নিকালো।’ এমনভাবে বললে, যেন চোরকে চোরাই মাল বের করতে  
 বলছে জাঁদরেল দারোগা। ‘বিন্দুক তো নেই।’ ‘কেন নেই? তোমাদের  
 হিসেব, এই হিসেবটা নেই কেন?’ বণ্ডিকম বললে, ‘চামচে দিয়ে আপাতত ম্যানেজ  
 করা যায় না!’ প্রতিমা বোলাটা দেখিয়ে বললে, ‘বের কর। জানতুম আমি  
 তোমাদের মুরোদ কত।’ ঝুলি থেকে বিন্দুক বেরোলো। ‘কিনলে?’ প্রতিমা  
 বললে, ‘কিনবো কেন? বাপের বাড়ি থেকে বাগিয়েছি। এই বিন্দুকে আমি দখল  
 থেতুম।’ বণ্ডিকম অবাক হয়ে বিন্দুকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। মার বিন্দুকে  
 ছেলে দুধ খাবে। কি আশ্চর্য! দেখা শেষ করে বণ্ডিকম বললে, ‘দাঁড়াও ধুয়ে  
 আনি।’ প্রতিমা বললে, ‘ভাগ, পোবার কি আছে? পরিষ্কারই তো আছে।’  
 ‘অ্যাপারেটলি পরিষ্কার, মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেললে অসংখ্য জীবাবলু জড়িয়ে  
 আছে। বয়েল করে স্টেরিলাইজ করে আনি। তুমিও হাতটা ডিসইনফেকটান্ট  
 দিয়ে ভাল করে ধোও।’ প্রতিমা অবজ্ঞার সঙ্গে বললে, ‘অত সব পারবো না।’

বিন্দুক ফোটাতে ফোটাতে বণ্ডিকম খুব ঘাবড়ে গেল। বউ দেখা দিল ব্যাকটেরি-  
 লজির এ-বি-পি জানে না। ফুলস ট্রিড হোস্টার এজেন্সি ফিলার। ওঃ, বাড়িতে  
 গিলীবালি কেউ নেই! কোর্ট থেকে কোনো হুন্সিলা বের করা যায় কি? ডিস-  
 ওর্বিডিয়েন্ট মাদার ছেলেটাকে দেখা দিল মেরেই ফেলবে। মা বেঁচে থাকলে যা হয়  
 একটা কিছু করা যেত। বণ্ডিকমের মঙ্গলের জন্যে বণ্ডিকমের মা পাঁচু ঠাকুরের দোর  
 ধরেছিলেন। পাঁচু ঠাকুর আবার কোন দেবতা! দোর ধরাটা কি? কে বলে  
 দেবে বণ্ডিকমকে!

খাটে বসে প্রতিমা পা নাচিয়ে নাচিয়ে চিড়ে ভাজা চিবোচ্ছে। চিড়ের  
 মূচমূচ শব্দের সঙ্গে খাটের জয়েন্টের কিচকিচ শব্দ। চায়ের কাপ থেকে রোদের

‘গায়ে ফিকে ধোঁয়া উঠছে। ঘরে একটা বেশ স্নুথ-স্নুথ ভাব। শিশু-শিশু গম্ভ।  
বস্কম বললে, ‘দোর ধরতে জানো?’ প্রতিমা একটু হাই তুলে বললে, ‘সে  
আবার কি? দোর মানে দরজা। কার দরজা?’

‘শাচী ঠাকুরের দরজা।’ বস্কম ব্যাপারটাকে একটু ব্যাখ্যা করল। প্রতিমা  
বললে, ‘অস্নুথটা তো মেয়েদের হয়, তোমার হল কি করে?’

‘কি অস্নুথ!’

‘আঁতুড়ে বাই। পুয়ের পেরাল ইনস্যানিটি বইটা পড়ে দেখ—প্রসবের পর বা  
পূর্বে বলস্কয় প্রভৃতি কারণে কোন কোন রমণী উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।  
ওষুধটাও দেখে নাও—হায়োসায়ামাস ৩, ট্র্যামোনিরাম ৩, ক্যানাবিস ইন্ডিকা ৬,  
লক্ষণ মিলিয়ে তোমার বাবার বাস্ত থেকে এক ডোজ খেয়ে নাও।’

‘তুমিও পড়েছ?’

‘পড়বো না? আমার বাবারও ওই বই একটা আছে।’

বস্কমের আর কথা বলার সময় নেই। প্রসূতি পরিচর্যা, পরমেশ্বরের চর্চা  
সব একসঙ্গে ঘাড়ে পড়েছে। এখুনি এক বাল্যের গরম জল চাই। প্রতিমার স্নান।  
দুপরের খাওয়া। পরমেশ্বরের তৃতীয় পক্ষের চা। বইয়ে লেখা আছে, প্রথম  
সন্তাহে ডাল বা কোন গুরুপাক তরকারি খাওয়া সংগত নয়। তা হলে মাছের  
ঝোলই বোধহয় বিধেয়।

বাধরুমে গরম জল দিয়ে বস্কম যখন ঘরে এল, প্রতিমা তখন ঘুমন্ত ছেলেকে  
ঘাঁটু ঘাঁটু করে আদর করছে। ‘ব্যাটা ভীষণ শয়তান। সারা দিন পড়ে পড়ে  
ঘুমোবে, রাত্তিরে চিল-চেঁচান চেঁচাবে।’ বস্কমকে দেখে বললে ‘রাতে তোমার  
ভার। তুমি সামলাবে। আমি পড়ে পড়ে ঘুমোবো।’ বস্কম বললে, ‘তাহলে  
ঈশ্বরের কাছে দুটো জিনিস এখুনি বর হিসেবে চেয়ে নিতে হয়, সারা রাত  
চুষবে কি?’

গরম জল দিয়েই সমস্যা মিটল না। প্রতিমার পরবর্তী ফরমাশ, পিঠে একটু  
সাবান আর স্পঞ্জ ঘষে ময়লা তুলে দিতে হবে। প্রস্রাবটা লোভনীয়। প্লেজেন্ট  
জব। কিন্তু দুজনে বাধরুমে ঢুকলে, পরমেশ্বর যদি জানতে পারেন—জয় মা,  
জয় মা বলে চিৎকার করে বৃষ্টিয়ে দেবেন, পৃথিবীতে অনাচারের বর্গক্ষেত্র ক্রমশই  
বড় হচ্ছে, যা কিছু ভরসা তুমি মা।

দুজনে চোরের মত পা টিপে টিপে বাধরুমে ঢুকল। প্রতিমার তেলা পিঠে  
জল ঢেলে সবে সাবানের ফেনা করেছে, বস্কম দরজা ভেদ করে একটা ক্ষীণ ওয়া

‘ও’ শব্দ কানে এল। বৃষ্টির অভিশাপ পূর্ণ হল না। অনেক দিন পরে একটু স্ট্রীসঙ্গ, একটু আদর আনন্দ। স্পঞ্জটা হাত থেকে নিয়ে প্রতিমা ধলল, ‘আগে কোলে তুলে নিয়ে হাঁটুটা নার্চয়ে নার্চয়ে সদর করে আয় রে আয় রে কর, ধূমিয়ে পড়বে। ঘাড়ের কাছে হাত দিয়ে তুলবে, আবার ঘাড় মটকে দিও না। রক্ততালু এখনও তপতপে, ওখানে খোঁচাখুঁচি করো না।’

বৃষ্টি বাথরুম থেকে বেরিয়েই পরমেশ্বরের সামনে পড়ে গেল। প্লাস্টিকের মগ হাতে দাঁড়ি কামাবার জল নিতে আসছিলেন। বৃষ্টির মুখটা শুকিয়ে গেল। তবু স্ক্রুইং আপ কারেজ, আমতা আমতা করে বলল, ‘একটু এনগেজড আছে, দিন আমি গরম জল রান্নাঘর থেকে এনে দিচ্ছি।’

পরমেশ্বর গম্ভীর মুখে বললেন, ‘আমিই পারবো।’

তৃতীয়বারের চা দিতে গিয়ে বৃষ্টি দেখলে, পরমেশ্বর হাতের তালুতে দাঁড়ি কামাবার ব্দরুশের জল ঝাড়ছেন মনোযোগ দিয়ে। মুখ যেন আধাটের মেঘ। টোবলের রং-চটা প্লাস্টিক কভারের একপাশে কাপ নামিয়ে রেখে বৃষ্টি বলল, ‘চা।’ একটি ডিশে সকালের পুজোর দুটো প্রসাদী বাতাসা, আঢাকা, পিঁপড়ের ভোগ হয়ে পড়ে আছে। বৃষ্টি জানে, একটা তার, অন্যটা তৃতীয় পক্ষের। ফুঁ দিয়ে পিঁপড়ে উড়িয়ে বাতাসা দুটো হাতে নিয়ে বৃষ্টি বেরিয়ে যাচ্ছিল, পরমেশ্বর জানালার ফ্রেমের পেরেকের স্তুতো বেঁধে ব্দরুশটা ঝোলাতে ঝোলাতে বললেন—‘তোমাদের অফিসে মেটরনিটি লিভের ব্যবস্থা আছে?’

বৃষ্টি বললে—‘আজ্ঞে হ্যাঁ, আছে।’

‘তা হলে নিয়ে নাও।’

বৃষ্টি অবাক। তার মুখ দিয়ে বোরিয়ে এল, ‘সে তো মেয়েদের।’

পরমেশ্বর বললেন, ‘স্পেশাল কেস কর। দেখ গ্রাণ্ড করে কন্যা! প্রয়োজন হবে। শিশুপালন তো তোমাকেই করতে হবে। কে ওর দায়িত্ব নেবে! বৃদ্ধো বয়েসে আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। ওর মা তো ফেলে সরে পড়বে। বেড়ালের স্বভাব। ফেলাইন হ্যাঁবিট। শী ইজ নট এ মাদারলি টাইপ।’

বৃষ্টি ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে এল। মনে মনে বলল, খেল শুরুর। ছ’ মাস ফ্রন্টিয়ারে সিজফার্নার ছিল। নাও শালা হোর্সটলিটি বিগনস।

পরমেশ্বর নমো-নমো ঋণ শেষ করে কাগজ পড়ছেন। প্রতিমা খেতে বসেছে। বৃষ্টি হাত নেড়ে নেড়ে ছেলের মুখের মাছি তাড়াচ্ছে। হঠাৎ তার একটু কেরামতি করার ইচ্ছে হল। অধীত বিদ্যা একবার যাচাই করে দেখলে

মন্দ কি ! বইয়ে পড়েছে, নাভিতে রেড়ির তেলের প্রদীপের সেক দিলে তাড়াতাড়ি শূন্যকিয়ে যায়। বড়ো আঙুলটা শিখায় গরম করে আলতো করে চেপে ধর। প্রদীপ পায় কোথায় ! কিন্তু লাইটার আছে ! ছেলের পেটের পিটিটা খুলে ফেলল। লাইটারে বড়ো আঙুল তাতিয়ে আলতো করে চেপে ধরল। প্রথমবারে কিছু হল না, দ্বিতীয়বার দিতেই ছেলে কাকিয়ে কেঁদে উঠল। প্রতিমা এঁটো হাতে ধড়মড় করে ছুটে এল, যেভাবে মুরগীর মা ছুটে আসে।

‘কি করছ, কি ? ও কি, ওটা খুলেছো কেন ?’

বিস্কম অপরাধীর মত মুখ করে বলল—‘নশো সাতচাল্লিশ পাতা।’

‘তার মানে ?’

‘নাভিতে প্রদীপের সেক দেবার কথা আছে। প্রদীপের অভাবে লাইটার।’

প্রতিমা ছো মেরে লাইটারটা কেড়ে নিয়ে জানালা গিলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল। রাগে মুখ ধমধমে, বুকোঁছ, ছেলে সহ্য হচ্ছে না, যতক্ষণ না শেষ করতে পারছো ততক্ষণ শাস্তি নেই।’ বাঁ হাতে ছেলেকে বুক তুলে নিল।

বিস্কম মনে মনে বললে, ভুল, ভুল, পরমেশ্বরের অ্যাসেসমেন্ট ভুল। কে বলে, শী ইন্ট্রা এ মাদারলি টাইপ। শূন্যকিয়ে শূন্যকিয়ে বাথরুমে গান গাইলে কি হবে, মা হওয়া কি মুখের কথা ! বিস্কমও এবার প্রতিমার পক্ষ নিয়ে গাইবে—মা যদি নিদ্রা হয়, তা হলে কি প্রাণ রহিত ? বিস্কম লাইটার উদ্ধারেব জন্যে রাস্তায় দৌড়ল, রাস্তায় নেই, আটকে আছে কার্নিসে।

প্রতিমা এমনিই একটু ফাঁকিবাঁজ টাইপের। সংসারে সে বউ হতে চায়, বিব নয়। অথচ বাঙালী কনজারভেটিভ পরিবারে হাম ভি মিলিটারি, তোম ভি মিলিটারি গোছের বউ কেউ চায় না। বউ হবে ডিগনিফায়ড মেড-সারভেন্ট। মুখ বুজে হুকুম তামিল করবে—পানি লাও, চা বানাও, চিং হও, উপড় হও, ত্রিভঙ্গমূরারি হও। বদলে, বছরে চারখানা শাড়ি, আঁচলে এক গোছা চাঁদ, চার বেলা আহার, সপ্তাহে একটা সিনেমা, দশ কি বারো বছরে তিন থেকে চারবার প্রজনন। ব্যতিক্রম হলেই তুমি শালা জাঁহাবাজ মহিলা। প্রতিমা ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে গেছে। তাকে ‘ইয়েস ওম্যান’ বলা চলে না। অতএব তিনি এখন তোফা ঘুমোবেন। আর বিস্কমচন্দ্র ব্যস্ত হবে সরষের বালিশ তৈরিতে। বিস্কমের পিসীমা কথায় কথায় বর্লোছিলেন, সরষের বালিশে শোয়ালে মাথাটি নিটোল গোল হবে, একেবারে পাকা বেলের মত ! বিস্কমের সেই কেতাব আবার বলছে, ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে একশ দিন পৰ্যন্ত শিশুকে চিৎভাবে শয়ন না করাইয়া

ভান বা বাম পার্শ্ব শয়ন করানো ভাল। সারা মাসের রান্নার সরষে বালিশের খোলে ভরে যে জিনিস তৈরি হল তাকে বালিশ না বলে সরষের কাঁথা বলাই ভাল।

ঘুমন্ত শিশুর মাথার তলায় সেই বল বেয়ারিং বালিশ ঢোকাতে গিয়ে দনুটো মারাত্মক ঘূর্নাট আবিষ্কার করল। প্রথমত চিৎ, দ্বিতীয়ত হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। বস্কিমের বই বলছে, সব সময় নজর রাখ। হাঁ হয়েছে কি বদুজিয়ে দাও। ম্যাক কক্সসাহেব বলেছেন, ওই হাঁ পথে যত রোগজীবাণু শিশুর শরীরে ঢুকবে। প্রথম অসুখই টি-বি। ইস, দিনের বেলায় না হয় ঘুরতে ফিরতে একবার করে এসে বদুজিয়ে দেওয়া গেল। রাতের বেলায় টর্চলাইট জেদলে বে-পাহ'রা দেবে। মা আর ছেলে দুজনেই হাঁ। বস্কিম প্রথমে ছেলেরটা বোজাল। বউয়েরটা বোজাতে একটু বেগ পেল। টেম্পার করা ঠোঁট। যেই বোজায়, সঙ্গে সঙ্গে প্যাট বরে খুলে যায়। বোজা, খোলা, খোলা, বোজা করতে করতে প্রতিমার ঘুম ভেঙে গেল। বস্কিম অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল—‘হাঁ করে ঘুমোনো চলবে না। জীবাণু ঢুকে যাবে।’ প্রতিমা বিশাল একটা হাই তুলে বলল—‘আদেলের আংটি হল, দেখতে দেখতে প্রাণটা গেল। নাও, একটা ফর্দ কর—দুধ এক টিন বড়, গ্রাইপ-ওয়াটার একটা, রবার ক্লথ দু মিটার, গোল মশারি, তোয়ালে এক ডজন।’

বস্কিমের মুখ শূন্য হয়ে গেল—টাকা? ব্যাংকার তো পরমেশ্বর। বস্কিম জিজ্ঞেস করল, ‘এখনই দুধ কেন? এখন তো তোমার দুধই যথেষ্ট।’ প্রতিমা বললে, ‘যথেষ্ট নয় বলেই তো বলা হচ্ছে।’ কিন্তু এখনই টিনের দুধ। বই বলছে, মায়ের দুধের একমাত্র বিকল্প গাধার দুধ। পাশেই ধোপা আছে, গাধাও আছে, গাধী তো নেই! চারিদিকে তত গাধা। গাধীরা কোথায় থাকে? গাধারা কোথায় জন্মায়। বদুঝি সব শালা খুঁজর, আসলে কেউ পিওর গাধা নয়। দুধ নিয়ে মহা চিন্তা হল তো। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলে—‘খাটোলে গিয়ে রাম খেলোয়ানকে জিজ্ঞেস করে আসব, ওরা কি করে গরুর দুধ বাড়ায়?’

প্রতিমা বললে, ‘আমি জানি, ফুকো দেয়, আর রোজ পাঁচ সের ভোলি বিচিলির সঙ্গে খাওয়ায়। দুধ না কিনে যাও ফুকোর ডাক্তার ডেকে আন!’

বিকেলের চা পর্বের উপর সন্ধ্যা নামল। বহুকালের প্রথা, ঠাকুরঘরে প্রদীপ দোঁধিয়ে শাঁখ বাজানো। প্রতিমা কোনো কালেই করেনি। এখন তো

সাত খুন মাপ। অতিদুঃ পক্ষাঘাত। পরমেশ্বরই করেন। মেয়েদের হাতে শেষ-সন্ধ্যার প্রদীপ পড়েছিল তিরিশ বছর আগে। বিষ্কম শাঁখের আগুয়াজ শুনলো। পরমেশ্বর বাজাচ্ছেন। পরমেশ্বরের এই শাঁখ সন্ধ্যায় মাংগলিক নয়, প্রতিমার অক্ষমতার পেছনে শিঙে ফেঁকা। প্রথম ফু—অপদার্থ। দ্বিতীয় ফু—শ্লেচ্ছ স্বভাব। তৃতীয় ফু—দেখবো, দেখবো, কতদিন এই ভেড়া-স্বামীর পদসেবা পাস হতভাগী। সন্ধ্যা উৎরে অশ্বকার বেশ ঘন হল। পরমেশ্বর খবরের কাগজে মূড়ি ঢেলে তেল মেখে খাচ্ছেন। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাদামভাজা, একটা করে গোলমরিচের দানা। কুড়িটা বাদাম, পাঁচটা মরিচ হল ডোজ। বিষ্কম পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকলো।

পরমেশ্বর আড়চোখে দেখে শুকনো গলায় বললেন—‘আয়।’

গলার স্বরে আর বেশী দূর কথা এগোক এমন কোনো ইংগিত নেই। তবু বিষ্কমকে বলতে হবে—দুঃখের কথা, রবার ক্লথের কথা, তোয়ালের কথা। বিষ্কম আমতা আমতা করে বলল—‘ওটাকে একবার দেখলেন না!’ ওটা শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করল যেন নিউটার জেন্ডার। একটা কীটপতঙ্গ বিশেষ। পিতৃহের অহংকারকে বাথটবের ঠান্ডা জলে চুঁবিয়ে মারা। পরমেশ্বর ইস্-সু করে এবটা শব্দ করলেন—মরিচের ঝাল হতে পারে, বা ভেতরে জমে থাকা বিষাক্ত হাওয়াব আউটলেটও হতে পারে। নির্বিকার মুখে বললেন—‘দেখার সময় এলেই দেখব। আমার সব কিছুর একটা নিয়ম আছে।’ নিয়মের লাটাকলে পরমেশ্বর বাঁধা। বিষ্কম প্রস্তুত হল পরের প্রসঙ্গের জন্যে। মোস্ট ডেলিকেট ইস্যু টাকা। একটা ঢোক গিলে বললে—‘কিছুর টাকার প্রয়োজন ছিল, কয়েকটা জিনিস, এই যেমন..।’ পরমেশ্বর একটা মরিচ মূখে ফেলতে যাচ্ছিলেন, ফেলা হল না, দু’ আঙুলে ধরে রেখে বললেন, ‘আই অ্যাম সিরি বিষ্কম, আমার হাত এখন একেবারে খালি। ধারখোর করে জোগাড়ের চেণ্টা করতে হবে।’ তার মানে তুমি ধারটার করে ম্যানেজ কর। পরমেশ্বর আর একটু ধোঁগ করলেন—‘আমি তো প্রিপেরারড হবার কোনো চান্সই পেলাম না। সব কিছুর একটা প্রিপারেশন চাই। তুমি প্রিপেরারড না হলে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলে, প্রিপেরারড না হলে ফানার হলে, পজাটি ডেকে আনলে।’ বিষ্কমকে বেশ মোলায়েম করে কড়কে দিলেন। বাছাধন এইবার বোঝ, বাপ হলে বাপ বাপ কর।

দব শুন প্রতিমা বললে, ‘এইবার লোকের বাড়ি কি-গিরি করতে বেরোই,

গুইটাই আর বাকি থাকে কেন। বাড়ি-খোঁপা করে, মখে দোস্তাপান ঠুসে 'বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়াই।'

বিশ্বম বললে, 'কাল থেকেই চেষ্টা করি, মারোয়াড়ীর গদিতে পার্ট টাইম। না জোটে ফুটপাথে গামছা বিক্রি। মধ্যবিস্তার আবার মান-সম্মান! ছেলেটাকে মানুস করতে হবে তো। আপাতত ঘাড়টা বেচে যা লাগে কিনে আনি।'

প্রতিমা বললে—'মাইরি আর কি! ঘাড়টা আমার বাবার দেওয়া। বেচতে হয় তোমার বাপের টাকিঘাড়টা বেচ গে যাও।'

শেষ পর্যন্ত অংশ্য কাউকেই কিছু করতে হল না। সাত দিনের দিন পরমেশ্বর বিশ্বমের মার একটা মপেনে বিশ্বমের ছেলের গলায় পরিয়ে দিলেন। স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরেছেন। কপালে চন্দনের টিপ। রুদ্ধ চোখে কোমল দৃষ্টি। দূর হাতের উপর শিশুকে শুষিয়ে বিশ্বমের ঠাকুরদার ছবির সামনে চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড় করে বললেন—'এসেছেন, তিনি এসেছেন।'

সেই শিশু পরমেশ্বরের হাতে বড় হতে হতে এখন বারো বছরের দুর্দান্ত কিশোর। পরমেশ্বর বাহাত্তর বছরের সাত্তিক বৃদ্ধ। বিশ্বমের চুল পেকেছে। ছুটির দিন প্রতিমা পাকা চুল তুলে দেয়। তা না হলে কুটকুট করে। অস্থির করে মারে। বিল্ডিং ফ্যান্ডের ঢাকায় নতুন বাড়ি হয়েছে। দোতলার ঘরে দাদু আর নাতি হইহই করে ক্যারাম খেলে।

বৃদ্ধ নাতিকে বলেন, 'তোমার বাবার অনেক গুণ ছিল। মহাপুরুষ হতে হতে একটুর জন্যে পুরুষ হয়ে গেছে।' নাতি বলে, 'রেগে গেলে বাবাকে মহাপুরুষের মত দেখায়।' পরমেশ্বর হাসতে হাসতে বলেন, 'ইয়েস, ঠিক বলেছো। রাগ হল পুরুষের অলংকার, তোমার যা ইন্টেলিজেন্স আর অবজার্ভেশান, মনে যদি না যাও তুমি মহাপুরুষ হবে। দোঁখ রবিরেখাটা একবার।'

রোজ একবার করে নাতির রবিরেখা দেখেন। নাতি তখন দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের গলায় বলে, 'দাদি আর একটা, আর একটা দাদি।'

পরমেশ্বর তাঁর সামান্য পেনসানের টাকায় এই হনুমানের জন্যে ফল-পাকড়-কলা স্টোর করে রাখেন। যেমন রাখতেন মা-মরা বিশ্বমের জন্যে আজ থেকে পরমেশ্বর বছর আগে। নাতি এখন নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের শয্যাসজ্জা। নিদ্রাহীন বৃদ্ধ মাঝরাতে ঘরঘর পায়চারি করেন। ল্যাম্পপোস্টের আলোর অন্ধকার দূলে ওঠে। স্ত্রীর ছবির সামনে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আর পাঁচটা বছর আমাকে সময় দাও। আমার শেষ বৃত্তিটা করে যাই। তুমি জান, আমি সহজে কখনও হারি না। জাস্ট ফাইভ ইয়ারস, মাই প্রব উইল বি ডান। আমার বস্তু ভরসা এই ছেলেটা। তোমারও তো নাতি গো। বেঁচে থাকলে, কি বল?'



# বুদবুদ

‘আমি বিভূতি’ মাইকের ডাঙাটা বাঁহাতে চেপে ধরে ডানহাত হাওয়ায় ছুড়ে মণ্ডে দাঁড়ানো যুবকটি একটা অশ্রুত অঙ্গভঙ্গী করল। গলায় একটা গাঢ় নীল রঙের রুমালের ফাঁস। এক মাথা কাঁকড়া কাঁকড়া চুল। ডান হাতে স্টিলের কব্জিবালা। গলায় সোনালী পদক। বুক, পালোয়ানের মত টান টান। চোখে রঙীন চশমা। ‘আপনারা আমি কিস্তি দেবো না, কিস্তি করবোও না। ভোট দিতে হয় দেবেন, না দিলে গলায় ন্যাপাফিন দিয়ে আদাশ করবো।’ ‘সে টেকনিক আমার জানা আছে।’

আমার পাশে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। দুখের মত সাদা চুল। টকটকে ফর্সা রং, ভাঙা গাল। চোখে নিস্কেল-ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। কনুইয়ের খোঁচা মেরে বললেন, ‘এই তো চাই। শাবাশ ভাই। বাপের বেটা।’ খোঁচাটার খুব বিরক্তি বোধ করলুম। থিয়েটার কি সিনেমায় এই ধরনের সহদর্শক ভীষণ জ্বালাতনের। মেসেজেলে হলে মধুর লাগে। বড়োর



খোঁচায় মধু নেই। মনে মনে একটা গালাগাল দিলুম—‘ঘাটের মড়া।’

মণ্ডের যুবক তখন বলছে, ‘আমি মশাই সাতচল্লিশের প্রোডাক্ট। আমার বাবা ছিলেন জেনুইন দেশসেবক। বিপ্লব-টিপ্পব করেছিলেন। দূ-চারটে পটকা মটকা ছুঁড়েছিলেন খেঁকুরে সাহেবদের দিকে। ওরা বলতেন বোম। আমি জ্ঞানি পটকা। বোম হল আমাদের কালের মাল। মণ্ডা-মিঠাইয়ের মত আমরা ঘরে ঘরে তৈরি করি। আর মানুষ মারার উৎসব তো লেগেই আছে। কারুর একটু বেচাল দেখলেই ডজনখানেক টপকে দি। সব সময় একটা-দুটো মাল পকেটে মজুত। আমাদের কাছে জীব-জন্তুর দাম আছে, মানুষকে আমরা পশু বলেও মনে করি না। মানুষ হল ভূঁস মাল, তরফের বিচারি গোছা গোছা আঁটি বাধা গরুর খাদ্য।’

বৃন্দ ৩৫লোক খ্যাচ করে একটা খোঁচা মেরে বললেন, ‘বাঃ বাঃ ছোক্রা আছা বলছে।’ একটু কাত মেরে বসলুম। বিভূতি বলেই চলেছে—‘গরুরদেব বলেছিলেন, মরতে মরতে মরণটাকে শেষ করে দে একেবারে। ওই একটা লাইনই মনে আছে গরুর। ছেলেবেলায় আমার বিপ্লবী বাবা এইসব খুব বলতেন নেচে নেচে। আমার বাবাকে দেখে সার বুঝেছি মশাই, টাকাটাই সব। মানি মানি মানি সুইটার দ্যান হনি। ভোগের জন্যে টাকা, যোগের জন্যে টাকা। টাকা থাকলে মান, সম্মান ইজ্জৎ, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। টাকা না থাকলে আমার বাবা। বেশ ছিলেন বামুন্ডুলে মানুষ। পাটি ইস্তাহার আদর্শ নিয়ে বাসুভুক, নিরালম্ব। হঠাৎ কি হল শাদি করে বসলেন কচি একটা মেয়েকে। আমার মা ছিলেন পরলা নম্বর ইডিরট। আদর্শবান পুরুষ দেখে স্বয়ম্বর হয়ে গেলেন। মা ছিলেন বাইশ সালের প্রোডাক্ট। চরকায় সুতো কাটতেন। লাল পাড় খন্দরের শাড়ি পরতেন। স্বদেশী গান গাইতেন চোখ-মুখ লাল করে। আমার সেই স্বদেশী মা এখন মিড-ওয়েইফ! মানুষের বাচ্চা বের করেন। আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমার টাকার মা আমার পেছাপ করে দেন বলেছেন। হে ধাত্রী পাম্মা! টাকার মহিমা তুমি কি বুঝবে বল? সে বোঝে আমার বৌ।’

বৃন্দ ফিসফিস করে বললেন, ‘একটু অশ্লীল হয়ে যাচ্ছে।’ আমি শুনলুম না। আমার কান বিভূতি দিকে।

‘বিয়ের ব্যাপারটা আমি আগেই সেয়ে নিয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন লেট ম্যারেজ আরলি অরফ্যান, আরলি ম্যারেজ লেট অরফ্যান।

তেলকলগুলার এক ডবকা মেয়েকে বের করে এনেছি। স্বপ্নদুটা খুব বাগড়া দিচ্ছিল। ছোটো মত একটা ঝেড়ে দিলুম। ফল্দ ব্যাটা এখন পণ্ডিত মিশে গেছে। বৌ আর তেলকল দুটোরই আমি এখন মালিক। তাই আমার এত তেলানি। মেয়েদের কাছে বাপের চে প্রেম বড়। প্রেমের চে পরসা বড়। স্মাগল্ড সোনা দিয়ে আমার বোকে মদুড়ে দিয়েছি। বাপের শোক ভুলে গেছে। মেয়েরা মশাই মজার জিনিস। ফিনফিনে মেনিমুখো ছেলের চেয়ে মেয়েরা গুন্ডাফুন্ডাদেরই একটু বেশী পছন্দ করে। আমার অফিসিয়াল বৌ একটা। আনঅফিসিয়াল অনেক। বন্ধুতেই পারছেন মেয়েদের উপর এমনই আমার হোল্ড আছে। আমিও বিপ্লবী তবে আমার ফাদারের ফ্যাশানে নয়। আমার পথ আলাদা পথ।

সবাই বলে বৃটিশের জেল বাবাকে বীর্ষহীন করে দিয়েছিল। আমার জন্মটা বকলমে। কে জানে শালা কে কি বলে। জ্ঞান হয়ে তক দেখে এসেছি আমার জীবিকাহীন বিপ্লবী বাবা আর স্বদেশী মা সংসার চালাতে অষ্টপ্রহর চুলোচুলি করছেন। অন্নপূর্ণার আবদারে মহাদেবের কাছা কোঁচা খুলে ঘাবার ধোগাড়। দেশ স্বাধীন করে বাবা আমার কখন মন্দির দোকানের কর্মচারী কখন বিড়ি বাঁধার শ্রমিক ; এরই মধ্যে দিয়ে পথ করে করে আমার যৌবন। ফাদারের হেডঅফিসে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। গঙ্গার ধারে গিয়ে উবু হয়ে বসলেন। সারাদিনের কাজ ঢেউ গোনা, আর বিড়িবাড় করে বকা। হাতে একটা গাছের ভাঙা ডাল নিয়ে ঘুরতেন। বাবা বলে ডাকলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেন। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বলতেন, ‘মারবি? মার মার এই নে খুলে দিচ্ছি’ বলে কাপড় খুলে দিতেন। বিশ্বাস করুন হৃদয়টা আমার পাথরের তবু সে দৃশ্য আজও আমি ভুলতে পারিনি, গঙ্গার পাড়ে গাছের ডাল হাতে আমার সর্বভাগী, উলঙ্গ বাবা। তাই আমি আজ ভোগী। আমার বাবার ত্যাগ, আমার মার ত্যাগ, আমি এক জীবনের ভোগ দিয়ে ঊসুল করে নোবো। আমি হারেম বানাবো, মদের ফোরার ছোটাবো, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার, আমার টোঁবলে। কাউকে কিছুর দোবো না। দাঁড়ান একটু জল খেরিনি।’ বিভূতি এক চুমুক জল খেল।

‘বাবার জন্যে পেনসানের ব্যবস্থা করতে গেলুম। কর্তৃপক্ষ জানানেন তিনি যে বিপ্লবী ছিলেন সার্টিফিকেট চাই। কে সার্টিফিকেট দেবে? কোনোট

প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী। শুনলেন কথাটা! বিপ্লবীদেরও ক্লাস আছে। প্রতিষ্ঠিত বিপ্লব হওয়া চাই, নদীর ধারের নুড়িই সিংহাসনে শালগ্রাম। শূকতলা কয়ে গেল। একজনকে ধরলুম। সে মাল বললে পাগলের আবার সার্টিফিকেট। এক কলি গানও গাইলেন সেই গাইয়ে বিপ্লবী—যার পিতা-মাতা বংশ পাগল ভাল কি হয় তাদের ছেলে। অবশ্য পেনসনের আর প্রয়োজন হল না। একদিন দেখা গেল গঙ্গার একটা পরিত্যক্ত ভাঙা ঘাটে বিপ্লবী বিপিনবাবু মুখ ধুবড়ে পড়ে আছেন হাতে তখনো সেই গাছের ডালটা মূঠো করে ধরা পাশে মুখ চুন কবে বসে আছে তাঁর শেষ জীবনের ফ্রেণ্ড একটা লোড়ি কুত্তা, যার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর দার্শনিক আলোচনা চলত।’

পাশের বৃক্ষ হঠাৎ খড়মড় করে উঠে পাশের প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথমটা বৃক্ষেতে পারিনি বৃক্ষ কি করতে চাইছেন? মণ্ডের দিকে মুখ করে যতদূর সম্ভব চিৎকার করে বললেন, ‘ও বাবা বিভূতি। তোর বাবা এখনো মরেনি রে। এই দেখ বেঁচে আছি। এই দেখ পাশে আমার ছেঁড়া কেডস বড়ে আঙুলটা ঝেরিয়ে আছে।’ বৃক্ষ ডানপাটা তুলে দেখাতে গিয়ে খড়াস করে পেছন দিকে পড়ে গেলেন। দর্শকের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলেন, বৃদ্ধো মরে রে। প্যাসেজের পাশে যাঁবা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে দু-চারজন দৌড়ে এলেন। বিভূতি মাইক ছেড়ে মণ্ডের সামনে এসে বললে, ‘কে আপনি?’

বৃক্ষকে ততক্ষণে ধরাধরি করে দাঁড় করানো হয়েছে। যন্ত্রণার গলায় বললেন ‘আমি তোর বাবাকে।’

বিভূতি বললে, ‘আপনি তা হলে আমার গডফাদার। সুরাট কংগ্রেসে সুরেন বাড়ুজ্যের দিকে জুতো ছুঁড়েছিলেন?’

‘না বাবা আমরা ছিলুম নরমপন্থী। টোটাল ফ্রীডম চাইনি বাবা। হোম-রুলেই সন্তুষ্ট ছিলাম। জেল খেটেছি অনেক বছর। ক্ষমতা দখল করতে পারিনি। নেপোলিয়ন মেরে দিয়েছে দই। এখন এই ডানপায়ে একটা ছোটো মত একজিমা সেইটাই গত তিরিশ বছর ধরে চুলকোচ্ছি। ডাক্তার দেখি-রোছি বাবা, বলছে সারালে হাঁপানি হবে। কি করি বলতো? একজিমা ভাল না হাঁপানি ভাল। তুই এতসব জানিস বিভূতি এইটা আমার বলে দে না?’

‘ভোট দেবেন আগে বলুন তাহলে বলবো।’

‘লিফটে নাম থাকলে নিশ্চয়ই দোবো রে; তুই যে আমার ছেলে।’

‘তাহলে একজিমাটাই থাক, উইপিং না ড্রাই?’

‘ড্রাই বাবা খুব চুলকোয় খোসা ওঠে শীতে বাড়ে।’

‘যাক তবু ভাল। খুব বেশী ছড়াবে না হাঁপানিতে বড় শ্বাসকষ্ট। মার আছে দেখেছি তো। হাঁপানিতে আবার পরমারু বেড়ে যাবে। আর ক’ বছরই বা চুলকোবেন? ঘণ্টা তো শুনতেই পাচ্ছেন। এবার তো যেতে হবে।’

‘তা হবে তা হবে!’ বৃদ্ধকে আবার পাশে বসিয়ে দিয়ে গেল। আমি ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আর একটু সরে বসলুম। বিপ্লবী মাথায় থাকুন। একজিমা চুলকোনো হাতে গায়ে খোঁচা মারলে স্পষ্ট প্রতিবাদ করবো। ইয়ারকি নাকি? বিপ্লব এক জিনিস একজিমা আর এক জিনিস। বিপ্লব তেমন ছোঁয়াচে নয়। বিপ্লব ধরলে পার পাওয়া যায়। প্রতিবিপ্লব দিয়ে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। মিলিটারী দিয়ে বিপ্লব চুরমার করা যায়। বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া যায়। কিন্তু একজিমা একবার ধরলে রক্ষে নেই। সারা জীবন চুলকে যাও খেঁসোর ঘেঁসোর করে।

বিভূতি আবার মাইকের সামনে চলে এসেছে। বাঁ হাত দিয়ে মাথার কাঁকড়া চুল ঠিক করতে করতে আবার সে শূরু করল, ‘আমি মশাই নেতা ফেতা নই আমি একটা চামচে।’ বৃদ্ধ আমার দিকে সরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘চামচে কি বাবা?’

আমি বললুম, ‘ইমপসিবল, আপনার পাশে বসে কারুর বাবার সাধ্য নেই থিলেটোর দেখে।’

‘আমি আর বিরক্ত করব না, শূরু চামচেটা বলে দাও বাধা।’

‘চামচে হল চাটুকার ফেউ।’ বৃদ্ধ আবার ঠিক হয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে বিভূতি অনেক কথা বলেছে শোনা হয়নি। বিভূতির দিকে যখন কান দিলুম তখন সে বলছে, ‘পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর দুটো জাত—খাদ্য আর খাদক, বাঘ আর ছাগল। নীতি একটাই, কিল অর বি কিল্ড, মারো আর না হলে মর। আমি যার চামচে, পলিটিক্সের তিন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী খুলেছেন। রাজনীতি এখন মন্দির দোকানে বিকোয়, কেউ নগদে কেনে কেউ ধারে। বেশীর ভাগই ধারের খন্দের। নগদে কেনার পরস্যা মধ্যবিত্তের নেই। আমরা গ্র্যান্ড পলিটিক্যাল গ্লোসারস শপের সেল্‌সম্যান। আমরা যা বিক্রি করি সবই এডালটারেটেড, ভেজালে ভর্তি। চিনতে বালি, ঘিষে পশুর চর্বি, এস্ট্রাকট বের করা মশলা। ভেজালটাই এ যুগের প্রকৃষ্ট

'খাদ্য। খাঁটি আমাদের পেটে সহ্য হবে না। আপনারা সব বাঁচিতে চান, মশাইয়ের সুবোধ বালক গোপাল যাহা পায় তাহাই খায়, কদাচ অক্টোপেন না। অবাধা হইলেই আমাদের হাতে দাওয়াই আছে তাহারই কয়েক। প্রয়োগ করিলেই বড়ো গোপালের দল বাধ্য; বশীভূত। এটা কি ল্যাটিন আমেরিকা, ভিয়েতনাম না আফ্রিকা, লিবারেশন লিবারেশন করে দেশ জুড়ে আদিখ্যেতা চালাবেন! ও সব ইয়ারকির কোনো মানে হয়। একে এই গরম, তায় লিভার, ওঁদিকে শালা হাটের ছেঁদা বৃজে আসছে, রক্ত ঘন হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে, স্নায়বিক দুর্বলতা, লো প্রেসার, দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে, নুন আনতে পাগু ফরোছে, (পলিউশান, সাফোশান ইনফ্রেশান, ডিকটেশান, এবরশান, হাইপারটেনশান, কনজেশান, লিকুইডেশান, ম্যানিপুলেশান, মেনসট্রেশান, কন্সলিডেশান, স্টেরিলাইজেশান, সিকল ইজেশান, ইনফেবশান, অ্যাফেকশান, অ্যাডিশান, সাবস্ট্রাকশান, ভিভিশান, মালটিপ্লিকেশান, একেবরে শানিয়ে ছেড়ে নিচ্ছে। কে চায় মশাই রুকু কামেলা? ও সব পলিটিকসের কামেলায় ভন্দর লোকে যায়! হয় বড়লোক না হয় লোফার ব্যবসাদার না হয় চোর এদের হাতেই ব্যাপারটা থাক না। আপনারা হঠাৎ মাথা গরম করে এমনিই গরম মাথাকে আরো কেন গরম করবেন? যুবকদের জন্যে হিন্দ ছাঁবি আছে, রাস্তায় পেট পিঠ বের করা-জুড়িয়েটরা আছে, চাকরির খান্দা আছে ডিগ্রি ডিপ্লোমার কসরত আছে, ব্যস্ত থাকার মত আরো কত কি আছে। কবিতা আছে, সাহিত্য আছে, যাত্রা আছে, সৌখীন থিয়েটার আছে, বারোয়ারী আছে, কলচুরাল ফ্যাংশান আছে, চুল আছে, দাড়ি আছে, অফসেটে ছাপা সিনেমার কাগজ আছে, প্রেম আছে, বিরহ আছে, রেজিস্ট্রী ম্যারেজ আছে, ড্রাগস আছে, খেনো আছে, পরের পয়সায় বিলাহীত আছে, মড়া পোড়ানো আছে, পরচর্চা আছে, বাঁশ আছে, আরো কত কি আছে। কতকি ভাল কাজ আছে। খেড়েদের জন্যে চাকরি আছে বাকরি আছে, মাগ আছে, বখে যাওয়া ছেলে আছে, প্রেম-লোটা মেয়ে আছে, মেয়ের পেছনের ফেউ তাড়ানো আছে, জামাই ধরার পনের টাকা রোজগার আছে, ঘুষ আছে, অফিসে পরস্পরে পেছনে কাঠি দেওয়া আছে, লেডি স্টেনো টাইপিস্ট, টেলিফোন অপারেটর আছে, রেসের মাঠ আছে, পরস্রী আছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিটকা আছে, বাসে-ট্রামে লেডিজ ছিটের কাছে দাঁড়াবার খান্দা আছে, দাঁকশ্বর, তারকেশ্বর বক্শ্বর, রামেশ্বর আছে, ধার আছে, পাওনাদার আছে, খান্দা আছে, ডাণ্ডা

‘তাহলে এক্ষণে বাড়বার কাণ্ডা আছে, ছেলের চাকরির জন্যে চাকরিদাতাদের ‘ড্রাই’ তেল দেওয়া আছে, গিনিকে পেটানো আছে, পাণের ফ্ল্যাটের কাপতেনের সঙ্গে সাপ্তাহিক বগড়া আছে, তাস আছে, জুয়া আছে, শালা আছে, শালী আছে। এতসব থাকতে আপনারা মাইরি খামোখা কেন জেনেইন পার্লিটিকস করবেন? রাজনীতি হল ত্যাগীদের জিনিস। আপনাদের কি ত্যাগের ব্যয়েস হয়েছে গুরু? আমাদের হাতে কি ত্যাগ নইবে মাইরি! আপনারা হলেন বরণ্য ভোটার, আপনারা হলেন ডোনার, পোচার সাফারার, চামার, ধামার স্নাফার। আপনারা শুধু ভোটটি বাকসে ফেলে দেবেন। আপনারা সব কাস্টার। বছরে বছরে একটি করে সম্মান বোয়ের পেটে কাস্ট করবেন। একটি করে ভোটার দেশকে উপহার দেবেন। ভোট হল আপনাদের মেয়ে। পাশ্চাত্য করে দিন তারপর বরাতে যা থাকে হবে। আর বরাতে হল রেসের ঘোড়া। আমীরও করতে পারে ফবিরও করতে পারে। তবে জেনে রাখুন, ভোট দিয়ে কোনো শালা কোনো কালে বড়লোক হতে পারেনি। চুঁরী ছাড়া বড়লোক হবার অন্য কোনো রাস্তা নেই। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি। ভাগ্য ফেরাতে হলে লাইন দিতে হবে। তর্দাবর লাগাতে হতে হবে। ভেদে দেখুন ষাট কোটি মানুষ যদি পেছনে পেছনে লাইন দেয় কি অবস্থা হবে। আন্দেক শালা ভারত মহাসাগরের জলে গিয়ে পড়বে। অতএব একজন দুজন ভাগ্য ফেরাবে অন্য তাকে ঈর্ষা করবে। ঈর্ষা করার মত লোকও তো চাই। তা না হলে ঈর্ষার দেওয়া ঈর্ষা বশতুটা যার কোথায়? ঈর্ষায় যদি জ্বলে পুড়ে শব্দ না হলেন তাহলে মরণকালে যে নরকবাস হবে মশাই।’

বুদ্ধ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, ‘আমি পেছাপ করবো বিভূতি।’

‘কি করবেন?’

‘পেছাপ বাবা।’

‘কোথায়? আমার মুখে?’

‘হি হি বাবা। তোমার মুখে কেন, পেছাপখানায়।’

‘করে আসুন। কে আটকে রেখেছে আপনাকে?’

‘তুমি রেখেছো মানিক আমার। তুমি একটু থামো। ফিরে এলে শব্দ কোরো।’

‘ঠিক আছে, ততক্ষণ দেশাত্মবোধক গান হোক।’

‘আমি যে দেশাত্মবোধক গান ভালবাসি, নিজে যে এক সময় এমনি করে হাজি-

মুঠো করে গাইতুম, স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে, কে বাঁচিতে চায়,  
কোন শৃঙ্খলের বাচ্ছা পরাধীনতা চায়রে চায়?’ বৃদ্ধ সুর করে গেয়ে উঠলেন।  
বিভূতি মস্তের সামনের দিকে সরে এসে বললে।

‘ধূঃ মাইরি ওটা গান নয় কবিতা। সব গুলিয়ে ফেলেছেন দাদু। দেশাত্ম  
বোধক গান হল এইটা।

বিভূতি পাছা দু’লিয়ে দু’লিয়ে টুসকি দিতে দিতে গেয়ে উঠলো,

হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হায়।

আর চাবি থো যায়, হাম তুম

কোথা থেকে ম্যারাকাস বেজে উঠল, ঝংক ঝংক ঝংক। বস্গতে বোল  
ফুটলো টাকা টাকা টাকাডুম, টাকা টাকা ট্রাকা ডুমট্রাকা, টাকা ডুম। বিভূতি  
ঘুরে ঘুরে নাচছে।

হাম তুম এক কামরেমে বন্ধ হায়

বৃদ্ধ বললেন, ‘পাগল ছেলে, উদোর পিণ্ডি বৃদ্ধোর ঘাড়ে, কি একটা গানকে  
শ্বদেশী গান বলে চালিরে দিলে। জ্ঞানগম্মির মাথা খেয়ে বসে আছে। তুমি  
আমাকে একটু পেছাপখানায় নিয়ে যাবে?’

সে কি রে বাবা, এতো আচ্ছা জ্বালা হল। না মগাই পারবো না, আমার  
পক্ষে সম্ভব হবে না।’

বৃদ্ধ গলা ছেড়ে চিৎকার করলেন, ‘বিভূতি বিভূতি।’ বিভূতি যেন  
আমাদের গার্জেন। বিভূতির গান থেমে গেল। চিৎকার করে বলল, ‘কি হল  
আবার?’

‘এই ইয়ংম্যানটি আমাকে পেছাপ করাতে নিয়ে যাচ্ছে না।’

‘সে কি! যুবকদের কাজই হল বৃদ্ধোদের পেছাপ করানো। যাও থোকা,  
জুটাচারের দায়ে পড় না।’

বৃদ্ধ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, ‘শুনোছো বিভূতির আদেশ।’

‘আপনি আমার মূখের কাছে মূখ এনে কথা বলবেন না প্লিজ। আপনার  
মূখে দূর্গন্ধ।

বৃদ্ধ আবার বিভূতিকে কম্পেন করলেন, ‘ও বিভূতি, এ বলে আমার  
মূখ দূর্গন্ধ।

‘দূর্গন্ধ? আমাদের সকলের মূখেই দূর্গন্ধ। সব শালাই লিভার পচে-  
মূখ গহবরে টাট্টানো বানিয়েছে। ও শালায় আছে। আমারও আছে। একে



বলে হেলিওটোবিস। দ্যটস এ ন্যাশনাল ডিজিজ। আমি তো ওই জন্যে ৩  
সময় মৃত্যু মাল ঢেলে বসে থাকি। মদের গন্ধে অ্যারিসট্রোক্যাসি, মৃত্যুর গ  
দুরে থাকি। দাদু আপনিও একটু মালটাল চালান, নইলে প্রেম হবে  
নাভনীরা বলবে তফাত যাও।’

‘তাহলে আমি চেপে রাখি।’

‘তাই রাখুন, কিংবা ওখানেই করুন না, ক ফোটাঁই বা হবে, আপনি তো চিনি  
গ্রস্ত, সুগার আছে না? থাকতেই হবে। সব ভেতো বাঙালীরই চর্চিলশের পর  
চিনি হয়।’

‘এখানেই করবো বাবা?’

‘কেন করবেন না? আমাদের ন্যাশনাল হ্যাঁবিটই তো, খাই যেখানে হ্যাঁগ  
সেখানে। লাগিয়ে দিন। প্রকৃতির আহবান উপেক্ষা করবেন না। ভয় নেই পাঁচ  
আইন কাগজে আছে, ভিতরেও নেই বাইরেও নেই।’

বৃদ্ধ আসনে বসে পড়লেন। বসে পড়ে আপন মনে একটু হাসলেন। স্বগ-  
তোক্তি কানে এল, ‘সহযোগিতা! পাশাপাশি বসে সহযোগিতা হচ্ছে না,  
সহযোগিতা হবে সারা দেশ জুড়ে। পাশাপাশি বসে ঘোঁষায় মরে যাচ্ছে মৃত্যু  
বলছে, সবার ওপরে মানুষ সত্য, সমালোচনা করছে সাদা চামড়ার দল কালোদের  
কেন ঘোঁষা করে। অ্যাপার থিডের বিরুদ্ধে লম্পকবক্ষ!’

বৃদ্ধকে এক ধমক লাগালুম, ‘চুপ করা সম্ভব না হলে বেবিয়ে যান দয়া  
করে।’

ধমক খেয়ে বৃদ্ধ সংযত হয়ে বসলেন। যেন কত শাস্তিশিষ্ট মানুষ।

বিভূতি আবার মাইকের সামনে ফিরে গেছে। ‘সমস্ত মানুষই অবস্থার  
দাস। দাসত্ব করার জন্যেই মনুষ্যত্ব! দাস কখনও প্রভু হতে পারে  
না। আপনারা মৃত্যুর স্বপ্ন দেখবেন কিন্তু মৃত্যু করে দিলেই  
হাহাকার করে উঠবেন। ছোট থেকে আরও ছোট হওয়াতেই মানুষের  
আনন্দ। সবচেয়ে সুখী মানুষ সবচেয়ে বিড়ম্বিত মানুষ। জীবন একটা  
চটচটে আঠা, সেই আঠার সঙ্গে জুড়ে আছে হাজার সমস্যার পাতা। ছাড়াবার  
জন্যে যতই গড়াগড়ি দেবেন ততই আরো পাতা জড়িয়ে গিয়ে সেই বাঘের মত  
অবস্থা হবে। বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় কৌশল হল ভুলে থাকা, জীবনের ভারে  
নড়িয়ে পড়ে ক্রীতদাসের মত মৃত্যুর দরজার দিকে হেঁটে যাওয়া। অথচ মৃত্যুকেই

মানুষের সবচেয়ে বড় ভয়। সেই মৃত্যুর ভয়ে আপনারা মৃত্যুকেই ভোট দেবেন। দিলেও মৃত্যু না দিলেও মৃত্যু। হাহা পরিস্থিতি এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা যেমন প্রগতি তেমনই অধোগতি, আমরা প্রাচুর্য, আমরা দুর্ভিক্ষ, আমরা ঝরা, আমরা ক্ষরা, আমরা উৎপাদন, অনুৎপাদন, আমরা মৃত্যু, আমরা শৃঙ্খল।’

‘তুমি একটি গাড়োল,’ উইংসের পাশ থেকে আর একটি লম্বা-চওড়া ছেলে বেরিয়ে এল, ‘এইভাবে মৃত্যুর মত কথা বললে কেউ তোকে ভোট দেবে শালা। ভোট হল ভদ্রলোকের জিনিস। তোর ওই পেটোপটকার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। গায়ের জোরে ভোট হয় না গুরু, প্রেম হয় না গুরু ওসব স্নেহ দিয়ে ভুলিয়ে আদায় করতে হয়। আশার ছলনা দিয়ে পরে নিরাশ করতে হয়। বাস করবে ডেমোক্রেসীতে কথা বলবে ডিক্টেটোরের ভঙ্গীতে, এটা কি তোমার মামার বাড়ি রাসকেল? ভোটের বক্তৃতা হবে এই রকম।’ দ্বিতীয় জেলোটি বিভূতিকে সরিয়ে দিয়ে মাইক নিল।

‘বরণ্যে ভোটদাতাবা, আপনারা দাতা আমরা গ্রহীতা। গ্রহীতার কিছু বিনয় থাকা প্রয়োজন। বিভূতির হঠাৎ কি হয়েছে জানি না। সে হা বলতে চেয়েছিল, বলতে পারেনি। মানুষ সাধারণত পড়ানো পাখি। ব্যবহারিক জীবনে যে কোন কাজ আদায়ের জন্যে মন কথা বলে না কথা বলে তার উদ্দেশ্য। বিভূতির মন হঠাৎ ফসকে বেরিয়ে এসেছে। সে বলতে এসেছিল অন্য কথা। বিভূতি আপনাদের ছোট করেছে, আপনাদের ভূমিকাকে খাটো করেছে। মানুষ যে অমৃতের সন্তান তা ভুলে গেছে। আত্মার শক্তিতে মানুষ যে তুচ্ছতার উর্ধ্বে উঠতে পারে সে কথা স্বীকার করেনি। ভারতের অধ্যাত্মবাদ, পশ্চিমের রাজনৈতিক বিশ্বাস, জীবন স্বাধীনতা কোনটাই সে মানতে চায়নি। অনেকটা জারের মত কিংবা কাইজারের মত কিংবা কসাইয়ের মত কথা বলেছে। ব্যাটা বাঙাল। বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। উদো বঙ্কা। বিভূতিকে ভোট দেওয়া মানে, বিভূতির পার্টিকে ভোট দেওয়া মানে একটা দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। যে দলে অনেক মাথাওলা উদার লোক আছে যাদের নীতিও উদার। সব দলেই তাই থাকে। বিভূতি হল দলের হাত, মাথা হলুম আমরা। আমরা যা বলব বিভূতি তাই করতে বাধ্য। বিভূতির নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। স্বাধীন হলেই বিভূতির মৃত্যু হবে। বিভূতিকে আমরাই ক্রিয়েট করেছি। সে একটি বৃদ্ধদ। বেচাল দেখলেই একটি আলপিনের খোঁচা, ব্যাস, বিভূতিবাবু ফুট।

আপনাদের চোখের সামনেই বিভূতির মত কত মাল এল কত মাল গেল। আপনারা বেশ ভালই জানেন, নেতা মে কাম নেতা মে গো লাইফ উইল বনটিনিউ ফর এভার। এন্ড হোয়াট ইজ লাইফ? জীবন কি? ও শালা বলেনি? বলার মুরোদ নেই তাই বলেনি। শেক্সপিয়ার বলেছেন, লাইফ ইজ এ ওয়েকিং ড্রিম। গীতা বলেছেন, নৈনংহিন্দতি শশ্ঠান, নৈনংদহীত পাবক। তার মানে কোন শালা কোন শালার কিছুর করতে পারবে না। শালায় শালায় শালাশালী হলেও সব শালা অমর। বিভূতির পেটো, বিভূতির ছুরি-ছোরা আপনাদের কি করতে পারে? নাথিং, ন হন্যতে হন্যামানে শরীরে। আপনাদের বত বড় গর্ব, মন্বন্তরে মরিনা আমরা মারি নিয়ে ঘর করি। তবে আপনারা ভিত্তির হতে যাবেন কেন? রাজার মত ভোট দেবেন, রাজার মত সংসার করবেন। তার বদলে হ্যাংলার মত চাইবেন কেন। কবি কি বলেছেন, যা চাষি তা বসে পাষি খোঁজ নিজ অস্ত্রপুত্রে। চাইবেন নিজের কাছে, খন দাও, মান দাও, চাকরি দাও বাকরি দাও, জমি দাও, জমা দাও, জিনিসের দাম কমিয়ে দাও। নিজেকে জাগিয়ে তুলুন, বলুন জাগো বাঙালী। সেই ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছেন—সেল্ফ হেল্প ইজ দি বেস্ট হেল্প। তবু প্রথামত দেশের জন্যে দেশের জন্যে আমাদের একটা কর্মসূচী আছে যেমন, সব ছেলে মেয়েকে আমরা ভাল ভাল চাকরি দেবো, না থাকলেও দেবো, সব গরীবকে বড়লোক করে দেবো, জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেবো, আই-বুড়ো মেয়েদের ব্যাংক তৈরি করে ভাল ভাল পাত্রের সঙ্গে বিনাপণে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবো, জন্মবধন কর্মসূচী চালু করবো, রাশি রাশি শিশুকে পোলিওর কায়দায় মানুুষ করে ক্ষেতে কিংবা নদী বুজিয়ে নতুন চাষের জমি বের করে খামারে ছেড়ে দেবো, জমি না থাকলে সাগর বোজাব। আমরা বিশ্বাস করি, মানুুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ না করলে প্রকৃতি নিজেই মহামারী দিয়ে, দূর্ভিক্ষ দিয়ে জন সংখ্যায় সাম্য এনে দেবে। প্রকৃতিই যা পারে আমরা শুদ্ধ শুদ্ধ তা করে অপ্রিয় হতে যাই কেন। আমরা চোরকে চুরি করতে দেবো, গৃহস্থকে সজাগ হতে দেবো, দুনীতি রোধের জন্যে কর্মটি করে দেবো, সাধুকে সং হতে দেবো, অসতীকে সতীসাধবী করার চেষ্টা করব না, ভেজাল জিনিসের দোকান, আসল জিনিসের দোকান দুটোই খোলা রাখবো, গুন্ডা দমন করবো না, সাধারণ মানুুষকে পাহারা দেবো, কারুর জীবিকা কেড়ে নেবো না। আমাদের সব নীতিই পজিটিভ, ইতি বাচক। সাদা বাজার, কালো বাজার, ম্বর্গ নরক পাশাপাশি থাকবে। বীতি থাকবে প্রাসাদ থাকবে। গরীব থাকবে বড়লোকও থাকবে। সোস্যালিজম,

ক্যাপিটালিজম, মার্কসিজম সমস্ত ইজম পুরোদমে চলবে। আমরা হব শুভ বাজা  
কল্পতরু। জীবন যে রকম আমরাও সেই রকম হব। তত্ত্বদর্শীরা বলেছেন,  
স্বর্গও এখানে, নরকও এখানে। অতএব আমাদের কর্মসূচীতে স্বর্গ আর নরক  
দুটোই গুলজার হবে। আমরা দেবদূত আবার খমদূত।' ৬৮১ ৫৮

বৃন্দ আবার উঠে দাঁড়ালেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার নামটা জানালে না, তোমাকে  
বিভূতির মাথা বলেই ডাকি, বুদ্ধোদয়ের জন্যে তোমাদের কোন কর্মসূচী আছে?'

'আছে বৈকি দাদু। যৌবনের একসটেনশনই হল বার্ষিক্য। আপনাদের কি  
ফেলা যার? আপনারা হলেন সনাতনের ক্রাউন্ড'ব্যাকগার্ড ফোর্স। আপনারা  
যুবশক্তি লাগাম। আপনারা ক্রীতদাসের জন্ম দিয়েছিলেন বলেই প্রভু আছে,  
চাষী আছে, শ্রমিক আছে, সেসেস্তার মাসমাহনের কর্মচারী আছে, বর আছে,  
বেল্লারা আছে, বেশ্যা আছে, বধু আছে, আমাদের দলের হাত আছে, পা আছে,  
দালাল আছে, ফোড়ে আছে, হাফ গেরস্ত আছে, ফুটপাথের মানুষ আছে,  
পাণ্ডিত আছে, মূর্খ আছে, আমরা আছি, তাহারা আছে, বিশেষ্য আছে,  
সর্বনাম আছে, কর্তা আছে, করণ আছে। আপনাদের জন্যে পাকে পাকে  
আরো বেশি বাড়াব, তাসের দাম আরো সস্তা করে দেবো মেয়েদের ব্রাউজের মাপ  
আরো খাটো করে দেবো, বিনা পয়সায় পর্ণগ্রাফ বিতরণ করবো।'

বাঃ বাবা বাঃ, বেঁচে থাকো মানিক' বৃন্দ ধপাস করে বসে পড়লেন।

বিভূতির মাথা আবার শরু করলেন, আমরা সব ব্যাপারেই নিষ্ক্রিয় থাকব,  
তালে তাল দিয়ে যাব! আমরা জানি আমাদের ভোটদাতারা চেয়ে না পেলে  
মানিয়ে নিতে জানেন। কেউ একশা টাকার সংসার চালায়, কেউ হাজার টাকার।  
চলছে সকলেরই, সকলেরই অভাব। আপনাদের যা কিছু ক্ষোভ সব শোবার ঘরে  
বোয়ের ওপর। বোঁশ ফুঁথ হলে, রাস্তার মাছলে চিংকার, চলবে না, চলবে না।  
আপনাদের চাল চলন আমাদের স্টাড করা আছে। আপনাদের মত মানুষ সত্য  
হয় না। আপনাদের প্রতিনিধিত্ব করার মত সোজা কাজ কিছুই নেই। চাঁড়মা-  
খানার ম্যানেজারকেও এর চেয়ে বেশী বেগ পেতে হয়। আমাদের সংঘর্ষ তো  
আপনাদের সঙ্গে নয়। আপনারা সব রবারের মানুষ চাপলেই ছোট হয় জান।  
দিকে খুঁশ দোমড়ানো যার! আমাদের যত ক্ল্যাশ নিজেদের মধ্যে। ল্যাং  
মারামার, কামড়া-কামড়। সেই জন্যে আমরা বিশেষ হনাসওরেন্স প্রথা চালু  
করবো। আমাদের স্বার্থ দেখার জন্যে বোর্ড অফ ট্রাস্ট থাকবে। আমরা  
এবার থেকে আটঘাট বেঁধে নামব।'

বেশ কিছুক্ষণ আমার একঘেয়ে লাগছিল। নাট্যকার কি যে বলতে চাইছেন, কি যে করতে চাইছেন, এর পর কি করবেন, আমার মাথায় আসছে না। অনেক আশা নিয়ে এসেছিলুম ভাল একটা নাটক দেখতে, তা আর হল না। আশা সব সময় পূর্ণ হয় না। নির্বাচন সব সময় মনের মত হয় না, কি প্রতিনিধি নির্বাচন, কি নাটক নির্বাচন, এই সত্যটুকুই বোধ হয় আজকের নিট লাভ। পাঁচ টাকার জ্ঞান পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়িলাম। এই একই জ্ঞান অনেকে হয়তো দশ টাকা কিংবা দুই টাকার সংগ্রহ করলেন। একই জ্ঞান বিভিন্ন মূল্যে সংগ্রহ করা যায়। জীবনের এইটাই বোধহয় পরম সত্য। মঞ্চে তখন দুই চরিত্রে কথা কাটাকাটি ছনছে, বিভূতি বলছে, কোদাল কে কোদাল বলাই ভাল, ভাঙতা দিয়ে ক্ষমতা দখলের অর্থ বণ্ডিত মানুষকে বণ্ডনা করা। দ্বিতীয় চরিত্র বলছে, মানুষ জেনে শুনেনি বণ্ডিত হতে চায়। জীবনের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অসীম অথচ পাবার জন্যে যে মূল্য দেওয়া উচিত মানুষ কোন কালেই তা দিতে প্রস্তুত নয়, ফাঁকিভালেই মানুষ সব কিছু পেতে চায়। মানুষের স্বভাবেই রয়েছে ফাটকাবাজী, ধাপাবাজী, শঠতা, প্রবঞ্চনা, ছলনা অতএব সেই চেনা রাস্তাতেই মানুষ ভাঁঙিয়ে মানুষকে কাজ আদায় করতে হবে। একসার মানুষ ঠেলে অন্ধকার প্যাসেজ বেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে যেন হাপ ছেড়ে বাঁচলুম। মৃত্ত আকাশ মাথার ওপর, শীতল বাতাস। মানুষ কত অলেশ খুঁশি! একটা পরিবেশে থেকে আর একটা পরিবেশে এলেই মন অন্যরকম হয়ে যায়। ভাবছি এবার কোন দিকে যাব। পেছন থেকে কাঁধের ওপর মৃদু হাতের স্পর্শ। চমকে উঠেছিলাম। তাকিয়ে দেখলুম সেই বৃদ্ধ। মুখে মৃদু হাস। একটু আগের দেখা নেই অসহায় ভাব, সেই বোমা নেকামি নেই। সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তিত্ব। ঝড়, সরল, উজ্জ্বল এক মানুষ। প্রশ্ন করলেন, 'উঠে এলে কেন? একজিমার ভয়ে? মৃতের গন্ধের ভয়ে? সত্যি কি শুধু আমার একজিমা নেই, মুখে হয়ত গন্ধ থাকতে পারে, আগে কেউ বলে নি, তুমি আজ ধরিয়ে দিলে, সেল্ফ কন্সাস করিয়ে দিলে, এবার থেকে পকেটে বড় এলাচ রাখবো।'

আমি হেসে ফেললুম। হলের বাইরে বৃদ্ধকে বেশ ভালই লাগছিল। বললুম, 'ভাল লাগছিল না বলে উঠে এলুম আপনার জন্যে উঠে আসি নি।'

'একটু সময় হবে, তোমার কিছু সময় আমাকে দেবে?'

একটু বিব্রতই হলুম। তবু বললুম, 'কেন দেবো না?'

‘তা হলে আমার সঙ্গে একটু এসো।’

বৃদ্ধকে অনুসরণ করে সোজা চলে এলুম গ্রীনরুমে। বড় বড় আহনার মাথায় চড়া পাওয়ারের আলো ঠিকরোচ্ছে। ঘর ভর্তি নারী আর পুরুষ চরিত্র। বিভিন্ন মেক আপে সেজে বসে আছেন। এক সুন্দরী মহিলা, তখনো নিজের হাতে মেক আপ নিয়ে চলেছেন। টানা টানা ভুরু আরো টানা করছেন। কাজলের রেখায় চোখের প্রেম আরো চটুল। সারা ঘরে যেন আর এক জগৎ। দেহের গন্ধ, প্রসাধনের গন্ধ, পুরুষালী গন্ধ; মেয়েলী গন্ধ। বৃদ্ধকে দেখে সকলেই সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন, ‘চলে এলেন আপনি? আপনার আর নেই।’ বৃদ্ধকে বসার আসন ছেড়ে দিলেন। বসতে বসতে বললেন, ‘পলাতককে ধরে এনেছি। আমার নাটকের শেষ না দেখে চলে যাচ্ছে। জানতে চাই কেন? আমি তো অডিটোরিয়ামে বসে মাঝে মাঝে একটু ভাঁড়ামি করি, না করলেও নাটক আটকাবে না। বস, তুমি বস।’ মেক আপ নিচ্ছিলেন যে মহিলা তাঁর পাশের খালি চেয়ারে পেছন ফিরে বসলুম। টাটকা যৌবনের ঝাঁজ ও গন্ধ দুটোই পেলুম। বৃদ্ধ বললেন, ‘চা দাও।’

‘তুমি কি জীবনবিমুখ দর্শক? তুমি কি শৃঙ্খলাই প্রেম, মৃত্যু, বিবাহ, বিচ্ছেদ, সংঘাত, পরিণতি চাও? তুমি কি চাও সত্যম, শিবম, সুন্দরম?’

কি চাই তাতো জানি না। নাটক দেখি কিন্তু নাট্যকারের প্রশ্নের জবাব শৃঙ্খলা পাই না। জীবন দেখি, জীবনদেবতার সন্ধান পাই না! কি চাই! আমি কি চাই! ‘বোধহয় ভালো লাগাটাই চাই।’

‘গুড, ভেরি গুড! কিন্তু জীবনের সব কিছুরই কি তোমার ভালো লাগে?’  
‘না।’

‘তবে জীবন থেকে সরে যাও না কেন?’

‘জীবন সরিয়ে দেয় না বলেই, ভালো হোক খারাপ হোক জীবনকেই আঁকড়ে থাকি।’

‘ভুল ভুল। আমরা ভালো লাগার মূহুর্তটুকুতেই বেঁচে থাকি, খারাপ লাগার মূহুর্তে জীবনের হাল ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াই, উদাসীন হয়ে যাই। পালিয়ে যাই। একেই বলে এলিয়েনেশান। আজকের জীবনের যা কিছু আয়োজন তাতে হৃদয় নেই, মন নেই, ভালবাসা নেই, ভালোলাগা নেই, আমাদের শূন্যতা জুড়ে উঠছে ‘না-কারণে’ ‘না-কারণে’। আমার এই নাটক হল সেই ‘না-জীবনের’ ‘না নাটক’। এ জীবনে নেশা আছে পেশা আছে, জন্ম আছে মৃত্যু আছে, আড়ম্বর

আছে আয়োজন আছে, নেই কেবল দিশা। এ শূন্যতা সাধকের সাধনলব্ধ নয়। এ শূন্যতা মহাশূন্যের সৃষ্টির আয়োজন নয় এ শূন্যতা হল জীবনহীন ভাকদ্যাম। নাটকের বাইরে সবচেয়ে বড় অভিনয়। আমাদের অন্তর থেকে অন্তরটা উড়ে গেছে, আমাদের বোধ হাওয়ার মিলিয়ে গেছে, আমাদের আমিটা বাইরে প্রাক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। অপরিচিতের মত শূন্য প্রান্তরে গাছের তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে, তাকিয়ে দেখি চিনতে পারি না। নিজ'নতায় যখন সে তুমি তুমি করে ফিরে আসতে চায়, আমরা বলি পরে পরে, এখনও বড় ক্লান্ত, একটু ঘুমেই। 'আমি শূন্য' জীবনে ক্রান্তির প্রভুত্ব। এখন নাটকটাং জীবন, জীবনটাই নাটক। জীবন খারাপ লাগে বলেই তুমি পালান্ধলে। তোমাকে কনসাস করে চেয়েছি বলেই তোমার খারাপ লেগেছে।'

ভাঁড়ের চা হাতে এল। নাট্যকার বললেন, 'নাও।' এক চুন্দ্র খেপে বললেন, 'তুমি তো কিছু বলছ না?'

আমার কোনো প্রস্তুতি নেই। হয়তো আপনি ঠিকই বলেছেন আমার কনসাসনেসের মৃত্যু হয়েছে। বেংচে আছে কিছু অভ্যাস। আর অভ্যাসকেই জীবন বলে তুল করছি।'

তুমি ব্রেন ইনজিওরড পেশেন্ট দেখেছো?'

'না।'

'আমি দেখছি। হসপিটালের বেডে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাসের পর মাস। শ্বাসপ্রশ্বাস আছে, জীবন আছে, জৈব প্রয়োজন আছে, খাদ্য চাইছে, ভাল চাইছে, সময় হলেই মলমূত্র ত্যাগ করছে, গরমে ঘামছে, শীতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে কিন্তু স্নায়ুবোধের উৎসটা গুঁড়িয়ে গেছে। যুবতী রমণীর লাল ঠোঁটের চুমু তার কাছে অর্থহীন, আলিঙ্গনের খোঁচা ব্যথাহীন, আমি কি বলতে চাইছি বুদ্ধেছো? চাওয়ার দুটো ধরন আছে, সচেতন চাওয়া অচেতন চাওয়া। তোমার মাথায় ডান্ডা মেরে তোমার সচেতন চাওয়াকে শেষ করে দিতে পারি, আর কিভাবে পারি। তোমাকে প্রতিমুহূর্তে বঞ্চনা করে, সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে ফেলে সমাধান থেকে দিনের পর দিন দূরে রেখে তোমাকে গুলিয়ে দিয়ে তোমার কনসাসনেসকে হত্যা করতে পারি। তুমি কেন চাও, কি চাও শিব চাও কি বান্দর চাও তুমি নিজেই জানো না। অন্ধকার ঘরে দীর্ঘদিন তোমাকে বন্দী করে রাখলে তোমার চোখে আলো আর সহ্য হবে না। অন্ধকারটাকেই তখন তুমি ভালো বলবে। তুমি তোমার ভালোলাগাটাই সকলের ভালোলাগা বলে তুল করবে।

একেই বলে আইসোলেসন।’

‘আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে।’

‘গুলিয়ে যাচ্ছে না তুমি নিজেই গুলিয়ে আছো। ওই দেখো আমাদের ব্যাণ্ট জীবনের চাহিদার এক একটি চরিত্র হয়ে বসে আছে। ওই দেখ, বারবানিতা রাতের মন ভোলানো সঙ্গে সাজছে। জিজ্ঞেস কর সে কি চায়? বলবে বেশ্যাবৃত্তি চলুক অপ্রতিহত কারণ এইটাই আমার বৃত্তি। ওই দেখ গৃহবধূ। সে কি চায়? বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ কর কারণ ওই তার স্বামী, সব উপার্জন বেশ্যার সেবায় ঢেলে দিয়ে ফতুর। স্ত্রী চায় স্বামীর নিরাপত্তা, অটুট সংসারের আশ্রয়। ওই দেখ মজদুদার কালোবাজারী, সে চায় দুর্ভিক্ষ, অনাহার, মূল্যবৃদ্ধি, ফাটকাবাজী। ওই দেখ শিল্পপতি, সে চায় একচেটে পুঁজি। ওই দেখ শ্রমিক, সে চায় তার শ্রমের ন্যায্য মজুরী। ওই দেখ মালিক, সে চায় আরো মূল্যফা, চায় অটোমেশন, ছাঁটাই। ওই দেখ ছাত্র, সে চায় আরো নৈরাজ্য। ওই দেখ শিক্ষক, সে চায় মানুষ গড়ার মত শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা রাজনৈতিক ডামাডোল। ওই দেখ ফুটপাথের মানুষ, সে চায় পরিষ্কার দিন, হাওয়ার রাত, ধনীর কৃপা। ওই দেখ ধনী, সে চায় কম ট্যাক্স, ব্যাংকে লকার, আন ডিক্লেয়ার্ড ইনকাম। ওই দেখ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, সে চায় আরো ট্যাক্স, আরো বেহিসেবী খরচ। ওই দেখ মধ্যবিত্ত, সে চায় আরো সুযোগ, শ্রমহীন আরো উপার্জন। ওই দেখ বিদেশী মতবাদ, তাবা চায় নাক গলাবার জায়গা। ওই দেখ পরতুল পরা পলিটবুরো, এক একজনের হাতে এক এক ফর্দ, সোসালিজম, ক্যাপিট্যালিজম, মার্কসিজম। আর তোমার মাথায় ওপর ছড়ানো শূন্যতা, তোমার আমিটা দিশাহারা, ডানা ভাঙা পাখির মত পাকসাট খাচ্ছে। ওই দেখ উজ্জ্বল আয়না, তোমার চেতনার দর্পণ, তোমার আমি তোমার দিকে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে। তোমার সারা মূখে তোমারই জীবনের মেকআপ। একদিকে সমষ্টির চাহিদা আর একদিকে ব্যাণ্টের চাহিদা মাঝখানে ক্ষমতার মণ্ড, সামনে বিভ্রান্ত দর্শক। এই তো আমার নাটক। তুমি বলেছিলে না, আমার মূখে গন্ধ, তুমি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সেলফ কনসাস করেছে। আমি এখন থেকে কথা বলার সময়, হয় মূখে হাত ঢাপা দিয়ে কথা বলব, না হয় বড় এলাচ খাবো। এই ‘বটা হল আমাদের সকলের মূখের দুর্গন্ধ। আত্মচেতনার একটু আঘাত, অভিনয়ের অভিনয়, ড্রামার ড্রামা। ব্যাকটা দেখবে নাকি!



মজা আছে।’

বাকিটা আর দেখা হল না। সাজঘর থেকে সোজা রাস্তায়। রাস্তার কলকাতা রাস্তায় জ্বলছে, জানলার পর্দায় জ্বলছে, বাতাসে উড়ছে, পথে পিচ্চি হচ্ছে। সারাদিনের উত্তাপ ঘোর হয়ে আছে পথের বাতির চোখে। দৃশ্য মান্দ্র হলে পথ চলছি। বাসের স্ট্রিয়ারিং হুইলে মাথা নিচু করে বসে আছে চালক। মান্দ্র ছুটেছে ঘরমুখো। ফুটপাথে পাশ ফিরে শব্দে ক্লান্ত মান্দ্র। দোকানের দরজা বন্ধ হচ্ছে, আলো নিভে আসছে একে একে। এদের মধ্যে কে জনতার প্রতিনিধি? আর একটু পরেই মান্দ্র যখন নিজস্ব হবে, তখন মধ্যযুগের কোনো খলিফা কি ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণে বেরোবেন? জনপদের জানলায় উদ্‌গ্রীব দয়ালু মুখ উঁকি দিয়ে দেখে যাবে প্রতিটি মান্দ্রের দৃশ্য স্নেহের পরিধি। কে হবে জনপ্রতিনিধি, কি হবে শাসনব্যবস্থা। একই সঙ্গে, কে হবে বারবানিতার বাবু, বানিতার কর্তব্যপরায়ণ স্বামী, কৃষকের কৃষি, শিল্পের শিল্পী, মালিকের বন্ধু, শ্রমিকের দাবি, দাসের দাস, ধনীর মূলধন। কে হবে ছাত্রের শিক্ষা, শিক্ষকের ফাঁকি, শাসনের জুলুম, অপব্যয়ী অপব্যয়, মিতব্যয়ীর মিতব্যয়। কে হবে বিদেশের স্বার্থ স্বদেশের স্বদেশ চেতনা।

কে যেন কাঁধে হাত রাখল। নাট্যকার নাকি। না আমি, তোমারই আমি। এতক্ষণ পাশাপাশি চলছি। যতক্ষণ পাশে থাকবো ততক্ষণ কষ্ট পাবে। আমি যাই। ‘আমি’ যেখানে ‘এক আমি’ সেখানে আমি তোমার অপেক্ষার থাকি। যেখানে প্রশ্ন নেই, সমাধানও নেই। তুমি বরং এক ঘুমে রাতটা পার করে দাও।

# টেকি



‘টেকি সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা?’

বাধা, বাধা অফিসাররা মোটা মোটা ফাইল আর রিপোর্ট নিয়ে বসেছিলেন। মন্ত্রীর প্রশ্নে সকলেই চমকে উঠলেন। প্রশ্নটা অনেকটা তলপেটে বৃষি চালানোর মত। কোঁক করে শব্দটাই কেবল হল না। এত জিনিস থাকতে টেকি! মন্ত্রী বললেন, ‘টেকি আপনারা দেখার সুযোগ পেয়েছেন কখনো?’

‘অফকোস’।’ প্রথম সারিতে বসেছিলেন শিল্পদফতরের অধিকর্তা, তিনি লক্ষিয়ে উঠলেন, ‘দেশের ছেলে টেকি দেখিনি তা কখনো হতে পারে স্যার।’ তাঁর বিভাগের অন্যান্য অফিসারদের প্রোটেকশান দেবার জন্যে আরো বললেন ‘দে হ্যাড অল সিন টেকি।’ তিনি থামলেন না, তাঁর সঙ্গেই হল অনেকেই হয়তো টেকি দেখে নি, পাছে উল্টো-পাল্টা কিছু বলে বসে, সেই ভয়ে টেকির একটু বর্ণনা দিলেন, ‘একটা ফালকামের ওপর বেশ ভারি মোটা একটা কঠি ফিট করা থাকে। হোরেন নট ইন আকসান বিশাল একটা গ্রাসহপারের মত দেখায়। প্রিজন্সার্স ইট ওরাজ ইউজড এক্সটেনসিভালি ফর পাউন্ডিং অফ

প্যাড ইনটু রাইস। অপারেশান ইজ ভেরি সিম্পল। কাঠটার লম্বা অংশে একটা খুঁরো ফিট করা থাকে। সেই দিকের মাটিতে একটা গাথবু থাকে। এদিকে কাঠের স্মল প্রোজেকসানের ওপর গ্রামের মেয়েরা একটা পা রেখে যেই প্রেসার অ্যাপ্লাই করে অমনি অপর মাথাটা উঠে পড়ে। বাই সিনক্রোনাইজেশান অফ দিস ভেরি সিম্পল মড্‌মেন্ট, ঢে'কুম ঢে'কুম করে তারা খান ভানে। রেরদার ভাঙতো। এখন দ্যাট মেথড হ্যাজ বিকাম অবসোলিট।'

মন্ত্রী একটু হাসলেন, 'মিঃ সেনগুপ্ত, আমি কিন্তু অ্যাকাডেমিক অ্যাপ্রোচ একেবারেই পছন্দ করি না। আমি চাই ইকনমিক অ্যাপ্রোচ। ঢে'কির অর্থ নীতি সম্বন্ধে হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া? আপনার লেখাপড়া কোন্‌ স্ট্রিমে?' মিঃ সেনগুপ্ত ইতিমধ্যে বসে পড়েছেন। অল্প একটু উঠে বললেন, 'ফিজিক্স।'

'ইকনমিকসের কেউ আছেন? এনি অফ ইউ?'

একেবারে পেছনের সারিতে বসেছিলেন ডক্টর ঘোষাল। ফিলাডেলফিয়া থেকে ডক্টরেট করে এসেছেন। বিবন, 'অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে গোবর গ্যাস।' ডক্টরেট বলে কথা কম বলেন, মূখে সব সমাধান পাইপ। সামনের কলেক্টা বকবকে কোনো ধাতুব তৈরি। ডক্টর ঘোষাল নিজে দেশী কিন্তু তাঁরা সব কিছু বিলিতি, চোখে রুপোলী ফ্রেমের চশমাটা জার্মানীর, পাইপটা আমেরিকার, পকেটের গ্যাস লাইটারটা ইংলণ্ডের, জুতো ইতালির, ফোল্ডিং ছাতাট ভাপানের, গোর্ফটা ফ্রান্সের মানে ফরাসী দেশের সেলুন দ্য আইফেল থেকে ব্রিম করানো, শরীরের সানট্যান সিসিলির, ইংবেজীর অ্যাকসেন্ট ইন্ডো-আমেরিকান, পেটে হ্যাম, হামবাগার পকট, সিনজানো। চলনে ফক্সটর্ট, আচরণে ডেজার্ট ফক্স। মেজাজে হিটলার। সকলের সঙ্গে পার্থক্য বজায় রেখে চলেন। ঘোষাল উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা জাহাজের ডেকের নেলসনের মত। একটু বিলিতি ধরনের কেশে বললেন, 'ইকনমিকস ইজ মাই সাবজেক্ট। আই অ্যাম এ ডক্টরেট।'

'ঢে'কি দেখেছেন?' মন্ত্রীর সোজাসুজি প্রশ্ন।

'ইয়েস স্যার। একবার সামারে আই ওরাজ ইন লাতিন আমেরিকা। সেখানে একটা ইনটারিয়র ভিলেজে আই স এ থিং এগজ্যাক্টলি সিমিলার টু ঢে'কি, এ ফালক্রাম, টু নিট প্রোজেকশান অন আইদার সাইড, সিমিলার সিলক্রোনাইজড মড্‌মেন্ট, টিপ, টিপ, টিপ, টিপ।'

নিজের দেশে ঢে'কি দেখেছেন? মন্ত্রীর প্রশ্নের ডক্টর ঘোষাল একটু শ্রাগ

করলেন। ‘নিজের দেশ সম্পর্কে’ তাঁর একেবারেই ভাল ধারণা নেই। তিনি নিজেকে ফরেনার মনে করেন। যেন ইংরেজ সিভিলিয়ান ইন্ডিয়ান সার্ভিসে কয়েক বছরের জন্যে এসেছেন। ঘোষাল বললেন, ‘খুব কাছ থেকে না দেখলেও দূর থেকে দেখেছি। অন দি ওয়ে টু নর্থ বেঙ্গল একবার আমার গাড়িটা একটা ভিলেজের কাছে ব্রেক ডাউন হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় আমি দূর থেকে, হাওয়েভার স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে আমি স্কetch দেখেছি।’

‘দূর থেকে দেখা বা স্কetch হবে না, আমি চাং থরো নলেজ, ২ন ডেফথ স্টাডি ইন এ নিউলাইট, নতুন আলোতে ঢেঁকিকে দেখতে হবে, আই মিন আমাদের দেখতে হবে।’

মন্ত্রী কথায় মিঃ সেনগুপ্ত উঠে দাঁড়াবেন, ‘আমি স্যার এখনি লাইব্রেরী থেকে বুক অফ নলেজ অ্যা এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিশ খণ্ড আনাচ্ছি। ডিটেলস সেইখান থেকেই পেয়ে যাবো।’ ডট্টর ঘোষাল একটু ব্যাণ্ডের হাসি হেসে বললেন, ‘নট দ্যাট ইজ স্যার। ব্রিটানিকায় কোন রেফারেন্স পাবেন না ইভন ওয়েবস্টারের বড় ডিকসনারিতেই কোন উল্লেখ নেই। সামান্য এবটু ওবলিক রেফারেন্স আছে পাউন্ডারের, এ গান থের্মিৎ এ প্রোজেকটাইল অফ এ স্পেসিফিক্যালি ওয়েট।’

মিঃ চৌধুরী হাত নেড়ে ঘোষালকে খামিয়ে দিলেন, ‘আমার মনে হয় একটা সামান্য জায়গায় আমরা আটকে গেছি। আসলে ইংলিশ টু ইংলিশে আমাদের প্রবলেম সল্ভ কবা, যাবে না, আমাদের যেতে হবে বেঙ্গলি টু ইংলিশ। ঢেঁকির ইংরেজীটা আমাদের জানতে হবে। কত বড় ফাঁকিবাজী দেখুন স্যার, স্বাধীনতার পর থেকেই ঢেঁকি পড়েছে ভিলেজ ইনডাসট্রিজ স্কিম। গান্ধীয়ান অর্থনীতির পিভট। এত বছর গেল তোমরা ঢেঁকির ইংরেজীটা দেশবাসীকে জানতে দিলে না। স্নেফ চালাকি করে খাণ্ড পাউন্ডিং অফ রাইস বলে চালিয়ে গেলে এতকাল। কেন বলতে পারতে না পাউন্ডিং অফ রাইস উইথ এ ঢেঁকির প্রপার ইংলিশ টার্ম। মহাত্মাতেও ভেজাল। এডালটারেটেড মহাত্মা লাইক এডালটারেটেড মিল্ক অর ঘি। তোমরা বসে না থেকে ইংরেজীটা যদি করে রাখতে আজ আমাদের এই অসুবিধটা হত না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে আমরা সবার আগে স্ট্রেস দি টার্মস, নমিনক্রেচার, কোডিং, ইনডেকসিং-এর উপর। আগে জিনিসটাকে প্রপারলি ইন্টারন্যাশনাল নমিনক্রেচারে প্রেস কর, তখন রেফারেন্স ইজ ভেরি ইজি।

ভাল ভাল বই আছে, খোলো আর দেখ ।’

চৌধুরীর সঙ্গে ঘোষাল একমত হলেন, ‘দ্যাটস ট্রু স্যার ! ভেরি ট্রু । এখন দেখা যাচ্ছে একটা রেফারেন্স কমিটি করে সবার আগে ঢেঁকির ইংরেজীটা বের করতে হবে । ও, এ-টি দেব সুবল মিত্রের কর্ম নয় । হ্যারো, হার্ভার্ড থেকে এক্সপার্ট আনাতে হবে ।’

‘মন্ত্রী বোঝেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মিঃ ভঞ্জ হৈ হৈ করে উঠলেন । গলার জোর, শরীরের জোর দুটোই তাঁর বেশি । সংস্কৃতের এম-এ, শিল্প-দপ্তরে কিভাবে এসে গেছেন । প্রাচীন ভারতের শিল্পের উপর গবেষণা করছেন ডক্টরেট হবার জন্যে । প্রচুর পান খান । এংনো মূখে একটি নিটোল খিলি । তিনি তাঁর স্বাভাবিক গলার প্রতিবাদ ববে উঠলেন, ‘ঢেঁকি হল থার্ড ওয়ার্ল্ডের জিনিস । সেটাকে এংরা ফাস্ট-ওয়ার্ল্ডে ঠেলে দিচ্ছেন । কোনো মানে হয় । এশিয়ার জিনিসের সম্মান চাইছেন আমেরিকায় । আমাদের এই ভারত সভ্যতা কত সু-প্রাচীন । এখানে এঁদা হেলিকপটার ছিল, অ্যাটম বোম ছিল, উড়ো জাহাজ ছিল, চড়ক ছিল, সুশুভ ছিল ।’

উত্তেজিত ভঞ্জের মুখে থেকে পানের টুকরো ছিটকোচ্ছে, মিঃ সেনগুপ্ত ফাইলের আড়ালে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন ! ‘কি ছিল না এই ভারতে ! আজ দানিকেন সাহেবের কথায় আমাদের বিশ্বাস আসছে অথচ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আমরা বিশ্বাস করলুম না । ষোড়শোত্তর অর্থশাস্ত্রে ঢেঁকির ক্রিমার রেফারেন্স আছে । যদিও ঢেঁকি একটি অনার্ব জিনিস, মুন্ডা ডির্খি থেকে ঢেঁকি এসেছে, পুরোপুরি ট্রাইবাল ব্যাপার । নীলনদের সভ্যতা আর বৈদিক সভ্যতার ঢেঁকি একটা ইমপোর্টেন্ট ইনোভেশান । অসভ্য মানুষ সভ্য হচ্ছে, প্রস্তরযুগ, লৌহযুগ, তাম্রযুগ, কাঁচা মাংস, পোড়া মাংস, রান্না মাংস চাষ সেচ গৃহা জনপদ শস্য ঢেঁকি । ঢেঁকি হল সভ্যতার চৌকাঠ । নারদের ঢেঁকি চড়া, ইজ ইট জাস্ট এ স্টোরি ? নো, নেভার, কান্ট বি ।’ ভঞ্জ তিন দিকে মাথা ঝাঁকালেন, তাঁর ফিলিংস এসে গেছে । ‘এর ইমপ্লিকেশান অনেক সুক্ষ্ম—আর্য আর অনার্ব সভ্যতার মিলন । ঢেঁকি হল বর্ণসংকর ।’

মন্ত্রী টেবিলের ওপর হাতকা আঙুলে গোটা তিনেক টোকা মেয়ে বললেন, ‘বসুন, বসুন, অল অফ ইউ ।’ সকলে বসলেন । তিনি হাসি হাসি মুখে সমবেত সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ইউ হ্যাভ কমিটিটাল মিসড মাই পয়েন্ট । হাওয়ার্ডার আশার বেশ ভালই লাগছিল । থেরোলি অ্যামিউজড ।’

কিভাবে নিজেদের এইভাবে ক্রিপল করলেন? মানসিক দিক থেকে একেবারে পঙ্গু। দি সিসটেম্, দিস রেচেড সিসটেম! যে ভাবে আমরা দেশ শাসন করছি। এ ভাবে চলবে না। উই নিড এ চেঞ্জ। আপনাদের কাছে আমি থিসিস চাই নি। আমি যা চেয়েছি ভাল করে শুনে নিন, নাম্বার অফ টোর্কিস ইন দি স্টেট, কত টোর্কি আছে, নাম্বার অফ পাসপোর্স এনগেজড, কত লোক টোর্কিতে নিযুক্ত, আরো কত লোক নিযুক্ত করা যেতে পারে, অ্যাতারেজ ডেল প্রোডাকসান। কয়দিন আপনাদের সময় দিছি। আজ সোমবার, আগামী বুধবার আমি রিপোর্ট চাই। রিপোর্ট শুড বি ইন বেংগলি। বংশুধ বাংলায় একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বাই উয়েডনেসডে হি আর এন্ড এট দিস টাইম। আপনাদের কোনো ধারণাই নেই গ্রামীণ অর্থনীতিতে টোর্কি কি ভূমিকা নিতে পারে। আমি টোর্কির রিভাইভাল চাই। ঘর ঘর টোর্কি, সকাল সন্ধ্য টোর্কির শব্দ আকাশ-বাতাস মধুর হয়ে উঠবে। কৃষকের খান, কৃষক বধূর টোর্কি, লাল খোসাসুন্দর টোর্কি-ছাঁটা সুইট চাল, মাঠের টাটকা সবজি, পণ্যকুটিরের চালায় চালায় দোদুল্যমান লাউ, ছাঁচি কুমড়া, সন্ধ্যার শাঁখ, নবান্ন, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো, আবার আমরা পুরোনো দিনে ফিরে যাবো, একেই বলবো আমরা গ্রামীণ রেনেসাঁ। দুঃখ নেই, দারিদ্র নেই, শাসন নেই, শোষণ নেই, ঝাঁক ঝাঁক সুখের পায়রা, অসীম নীল আকাশে দীপ্ত সূর্যের ছটা ডানায় মেখে লাট খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে লাট খাচ্ছে, এক্সকিউজ মাই সেন্টিমেন্ট, সামটাইমস আই সি ভিসানস।’

‘অ্যাড আই প্রোটেস্ট।’ মন্ত্রী চমকে উঠলেন। সোস্যাল ওয়েলফেয়ারের মিস নিয়োগী উঠে দাঁড়িয়েছেন। ফর্সা টকটকে রঙ। গোলগাল চেহারা। চোখে কককক করছে কালো ফ্রেমের চশমা। চণ্ডা কালোপাড় তাঁতের শাড়ি। মিস নিয়োগী এতক্ষণ একটিও কথা বলেন নি। কথা বলার সুযোগ পান নি। এখন ‘আই প্রোটেস্ট’ বলে উঠে দাঁড়িয়েছেন। হাতের দৃ আঙুলে একটা নীল পেনসিল নাড়তে নাড়তে বললেন :

‘আপনার আইডিয়া, দি রিভাইভাল অফ টোর্কি আমি সমর্থন করি না। ইনফ্যাকট সমস্ত নারী সমাজের তরফ থেকে আমি এর বিরোধিতা করব। তাতে আমার চাকরি থাকে থাক, যান যাক।’

মিস নিয়োগীর কথায় মন্ত্রী বেশ উৎসুক হলেন। রেগে গেছেন বলে মনে হল না। টোবলের ওপর হাতের কনুইয়ের ভর রেখে মৃদু হেসে জিগ্যোস করলেন, ‘হোয়াই?’

মিস নিয়োগী একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হাতা, খুঁটি, বোঁড়ির মত চোঁকিও হল নারী জাতির আর এক বন্ধন। আপনি একটা প্রিমিটিভ, প্রিমিটিভ শব্দটার বাংলা মনে আসছে না, হাওয়েভার আপনি একটা প্রিমিটিভ টর্চার চালু করতে চাইছেন যা এই বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে, নারী ইমানসিপেশান, নারী মুক্তির যুগে চিন্তা করা যায় না, ভাবা যায় না। আই শাডার, আই অ্যাম শেকেন টু দি পেলভিস, আই অ্যাম থেরোলি বিউইলডারড। আপনি আমাদের ওয়ানস লিবকে দুশো বছর পেঁচিয়ে দিতে চাইছেন। আই কান্ট থিংক অফ স্যার। এর পর আপনি কুলীন প্রথা, সতীদাহ, নীলের চাষ সবই চালু করতে চাইবেন। মেয়েরা আর নে মেয়ে নেই। ঘরে ঘরে আজ শিকল ভাঙার গান, মুক্তির ঢেউ লেগেছে। হোসেল ছেড়ে মেয়েরা বেরিয়ে আসছে। আপন'ব চোঁকিতে পাড় দেবে কে? দিতে হয় বেকার আড্ডাবাজ ছেনেরা দিক, অলস নেশাখোর পুরুষরা দিক, নট দি লেডিজ। তাছাড়া এর একটা মেডিকেল দিক আছে। অনবরত চোঁকিতে পাড় দিলে মহিলাবা ডিসেকশন হয়ে যান, বাঁশ হয়ে যায়। ডু ইউ ওয়ান্ট দ্যাট? ডু উই ওয়ান্ট দ্যাট?'

প্রায় এক নিশ্বাসে মিস নিয়োগী তাঁর প্রোটেষ্ট জানিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। মন্ত্রী তাঁর চুলে কিছুক্ষণ আঙুল চালালেন। ঘর নিস্তব্ধ। একটা পাখা কেবল চামচিকর মত কিচ কিচ করছে। মন্ত্রীর মুখ অল্প গম্ভীর। রাগে কিংবা নতুন কোনো চিন্তায় বলা শব্দ। সামনের দেওয়ালের দিকে কিছুক্ষণ তাকালেন, তারপর চেয়ার থেকে উঠে পড়ার মত একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'মিঃ সেনগুপ্ত, আপনার ওপর ভার দিলুম, প্রিপেয়ার দি রিপোর্ট, সমস্ত পয়েন্ট তাতে থাকবে, স্ট্যাটিসটিক্স, ইকনমিক্স, সোসিও ইকনমিক্স, অবসোলোমেনস, বারস অ্যান্ড বেরিয়ারস, রিলিজান, কাস্টম এমন কি মেডিকেল সাহুড অফ ইট। মিস নিয়োগী?'

মিস নিয়োগী তাকাতেই মন্ত্রী বললেন, 'আমি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমার কাজের বেশ ভিলেজ, নট ইওর ফ্যাশানেবল পশ সিটি এরিগাস। আমাদের সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে। হিন্দে নোজ নো ল। আই উইশ ইউ আর পোস্টেড ইন এ ভিলেজ।' মন্ত্রী গট গট করে বেরিয়ে গেলেন।

মিস্টার সেনগুপ্ত বা সেনগুপ্ত সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে নিজের শীতল ঘরে চলে এলেন। ফাইল, রিপোর্ট কত কি নিয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রীর মাথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে। অনারেবল মিনিস্টার এক ঢেঁকি দিয়ে সব ব্যাটাকে কাত করে দিলেন। দ্বিতীয় আশানন্দ ঢেঁকি! জোরে জোরে গোটা কতক বোতাম টিপলেন। তিন চারটে ঘরে তার প্রতিক্রিয়া হল। প্রথমে তাঁর পি-এব ঘবে একটা লাল আলো জ্বলল নিভল। বাইরের করিডরে তাঁর অর্ডারলির মাথার ওপর একটা চৌকো বাগ্ন ধরা গলায় ধমকে উঠল ভাগ ভাগ। তাঁর সেকসান ইনচার্জের টেবিলে অনুরূপ বিছুর কাণ্ড ঘটল। সকলকেই তাঁর এখন ভীষণ প্রয়োজন। গলায় ঢেঁকি আটকেছে। ঘরের দুরত্ব অনুসারে একজন এক এক সময়ে এলেন। পি এ আর পিওন একসঙ্গে ধড়মড় করে ঘরে ঢুকলেন। তিনি দুজনকে প্রায় একই সময়ে বলে উঠলেন :

‘কফি। টপ প্রায়রিটি, টপ প্রায়রিটি, টপ প্রায়রিটি, তিনবার। টেলেক্স মেসেজ। টু অল দি ডি-এমস। ইমিডিয়েটলি সেন্ড স্ট্যাটিসটিকস অন, অন’ ডিকটেশান থেমে গেল। বিরত মুখে বললেন, ‘সত্যি ঢেঁকির কি ইংরেজী বলুন তো! এমন একটা জিনিস যা কোনো সাহেবের নজরে পড়েনি। কি লিখলেন, ইয়েস, স্ট্যাটিসটিকস অন চেন্’কি, ডি এইচ ই এন কে আই। টোটাল নাম্বার ইন ইওর ডিস্ট্রিক্ট, পাস’নাস এনগেজড, ক্যাপাসিটি, কনডিসান। অলসো এসেস দি সোসিও ইকনমিক ভ্যারিবিলাটি অফ ইটস রিভাইভাল। আর্জেন্ট, ভেরি আর্জেন্ট, ভেরি ভেরি আর্জেন্ট। স্টপ। নোট নেওয়া শেষ হতেই বললেন. ‘একদুনি টেলেক্স। সব কাজ ফেলে টেলেক্স।’

ইতিমধ্যে সেকসান অফিসার এসে গেছেন। তাঁকে দম নেনবার অবসর না দিয়ে মিঃ সেনগুপ্ত বললেন, ‘একদুনি কনট্রোল করুন খাদির মুরখাজি, নিউ-ট্রিশানের চ্যাটার্জি, লাইব্রেরীর মিথ্র, গাইনাকোলজিস্ট সেন, ফুডের ব্যানার্জি, অ্যাগ্রিকালচারের দাস, চিফ মেডিক্যাল অফিসার আর ধুরন্ধর চ্যাটার্জি। যে যেখানে আছে, অ্যাজ ইজ হোয়ার ইজ এখানে চলে আসতে বলুন।’



সেকসান অফিসার নির্দেশ পালনের জন্যে প্রায় দৌড়োবার ভংগিতে চলে যাচ্ছিলেন। মিঃ সেনগুপ্ত বললেন, 'আর হ্যাঁ পঞ্চায়েতের বোসকেও বলবেন। লাগু, মিটিং সেমিনার, সিনেমা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এনগেজমেন্ট কোনো অজুহাত চলবে না। বলবেন মিনিস্টারস অর্ডার।'।

সকলে কফির কাপ ঠোঁটের ডগায় তুলে নিলেন। উঃ সকাল থেকে স্নায়ুর ওপর কম প্রেসার। অন্য দিন এতক্ষণ ছ' কাপ চা, ছ' প্যাকেট সিগারেট উড়ে যায়। কি এক শালা ঢেঁকি। এইরকম প্রেসারে চাকরি করলে হার্ট ডিজিজ ঠেকানো যাবে। কফিতে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে মিঃ সেনগুপ্ত তিরস্কারের কণ্ঠে বললেন, 'ইউ আর অল এথেলারেড দি আনরোড। আমি দেখেছি যখনই কোনো ক্রাইমিস আসে আপনারা অলওয়েজ আনপ্রিপেয়ারড। কিছুই জানেন না, কিছুই করেন না, সবই পরস্পেক্টিব। বড়ো হয়ে মরতে চললেন, ঢেঁকি দেখেন নি? কতবার বলেছি যে দেশে আছেন, সেই দেশটাকে একটু চিনুন, তা না বাড়ি অফিস, অফিস বাড়ি। ট্যুর মানেই দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ। ফিজিক্সটা পড়া ছিল বলে তবু এক্সপেন কর্তে পারলুম!'।

মিঃ চৌধুরী বললেন, 'সাহস করে একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট তুললুম বলে মন্ত্রী খানিকটা সফট হলেন। তা না হলে কি যে হত?'

ডক্টর ভঞ্জ বললেন, 'সংস্কৃত চর্চা করেছিলুম বলে অর্থশাস্ত্রে ঢেঁকিটা ঢোকাতে পারলুম।'।

মিঃ ঘোষাল বললেন, 'ল্যাটিন আমেরিকায় দেখেছিলুম বলে তবু মৃৎ রক্ষে হল।'।

মিঃ সেনগুপ্ত বললেন, 'মিস নিয়োগী আপনার পাকামোটা একদম ভালো লাগল না। মিনিস্টার ভীষণ অফেন্ডেড হয়েছেন বলে মনে হল। এইবার আপনার নির্ঘাত গ্রামে নির্বাসন। তখন বুঝবেন ঠালা। ওম্যানস লিব বোরিসে যাবে। রাস্তা নেই, ঘাট নেই, আলো নেই, পাখা নেই, এই বড় বড় মশা, সব অগ্নি ফুলিয়ে ছেড়ে দেবে। ঠিক হয়েছে। কত ধানে কত চাল এইবার বুঝবেন। গ্রাম তো দেখেন নি। কাব্যেই পড়েছেন আর ছবিতে দেখেছেন। কল্লেকার্দন থাকলেই লিব শুকিয়ে যাবে।'।

মিঃ ভঞ্জ বললেন, 'একে নারী তায় সুন্দরী, সাতখুন মাপ।'। মিঃ ভঞ্জ ব্যাচেলার। কালিদাস পড়েন! দীর্ঘকাল মিস নিয়োগীর কাছাকাছি

একটু আসতে চাইছেন। পান্তা পাচ্ছেন না। এই ঢেঁকি সূত্রে ঘনিষ্ঠ হবার শেষ চেষ্টা। মিস নিয়োগী ক্রিফতে শেষ চুম্বক দিয়ে বললেন, ‘আমার অ্যাপ-য়েন্টমেন্টে বাইরে পোস্টিংয়ের কথা কোথাও বলা নেই। ট্রানসফার করলেই হাইকোর্ট। আমার বাবা জাঁদরেল ব্যারিস্টার। কেসে এক পর্যাও খুঁচ নেই।’

মিং সেনগুপ্ত খালি ক্রিফর কাপটা বাঁ পাশে সরিয়ে রেখে বললেন, ‘যা ভালো বুঝবেন করবেন। কেউই আমরা কচি খোকা-খুঁকি নই। সো দি উইন্ড এন্ড রিপ দি হুইরল উইন্ড। হাওয়েভার লেট আস কাম টু দি পয়েন্ট। সময় খুব কম।’ সেনগুপ্ত সবুজ টেলিফোনটা হাতে নিলেন। ডিরেক্ট লাইন। টেবিলে বিভিন্ন রঙের পাঁচটা ফোন। ফোন প্রভুস হিজ ইমপার্টেনস। ফোনের সংখ্যা দিয়ে পদমর্যাদা বোঝা যায়। চিফের টেবিলে আঠারোটা ফোন। ছাব্বিশটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম। সেনগুপ্ত ডায়াল করে বিকাশ নামক কোনো ভদ্রলোককে ধরেছেন। ‘হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো বিকাশ! এ-প্রবলেম। এ জেনুইন প্রবলেম। তুমি সোসিওলজিস্ট। তুমি আমাকে বাঁচাতে পার। না না অ্যাপারেন্টলি ভেরি সিম্পল। হলে হবে কি অ্যাপ্রোচটা সামর্থ্য নিউ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছো ওল্ড ওয়াইন ইন এ নিউ বটল। বলবো। ঢেঁকির ওপর তোমার কোনো রিসেন্ট স্টাডি আছে? আরে না না কোনো নিউ পলিটিক্যাল পার্টি নয়। আরে না না কোনো ট্রাইব নয়। ধর কোনো ক্লাইম নয়। আরে ঢেঁকি ঢেঁকি ঢ-এ চন্দ্র বিন্দু এ-কার কএ ই-কার। ঢে’ ফর ঢে’ডুস কি ফর কিল। কিল, চড়, ঘুঁষ সেই কিল। হ্যাঁ হ্যাঁ স্বর্গে গেলেও দ্যাটস রাইট। সেই ঢেঁকির ওপর কোনো টেকনিক্যাল রিপোর্ট আছে? টেকনিক্যাল মিনস মিনস, স্পেসিফিকেশান। ধর ঢেঁকির লেংথ কত, কাঠটা গোল মিনস রাউন্ড না ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট হলে থিকনেস, পিভট হাইট। কি বললে নট ইওর সাবজেক্ট! কার সাবজেক্ট? অ্যানথ্রোপলজি। কেন? যাঃ নৃতত্ত্ব আর ঢেঁকি তত্ত্ব কি এক জিনিস! ইমপার্সবল! নিগানডার্থেল ম্যান এন্ড ঢেঁকি। ডক্টর কারফর্ম! কোথায় আছেন! কোথায়? পেনসিলভ্যানিয়া? সে তো ইউ এস এ। ও মাই গড! আচ্ছা আচ্ছা। যাক অ্যানাদার পয়েন্ট, ঢেঁকি ও মানসিকতার ওপর এনি স্টাডি! যেমন যেমন, ধরো যারা এখনো ঢেঁকি ইউস করে তাদের চরিত্র স্বভাব ব্যবহার। অ্যাজ ফর এগজামপল, যারা মোটর ইউস করেন তাঁদের একটু শ্রেষ্ঠত্বের বোধ, একটু স্বাতন্ত্র্যের ভাব এসে যায় না, একটু অহংকার।

যেমন ধরো যারা সি সাইডে থাকে, নুন, ঝাল, টক খায়, একটু ফেরোসাস হয়, অথচ যারা পাহাড়ে থাকে, রাইট রাইট প্রোফেসান এন্ড স্বভাব, যেমন কসাই জল্লাদ, রাইট, পুণ্ডরদের ছেলেপুলে বেশি হয়। এইরকম কোনো অ্যাপ্রোচ তোমার করা আছে? কি বললে? জুয়েলার, কবলার, ওয়্যচ রিপেরারার। ঢোঁকটা কর নি কেন? তা করবে কেন? করলে যে দেশের উপকার হবে! খুঁর আমার আজই চাই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।' সেনগুপ্ত হতাশ হয়ে ফোন রাখলেন!

মিস্টার চৌধুরী বললেন, 'স্নাত ডিটেলস কি মিনিস্টার চেয়েছেন? আমার মন্দুর মনে হল উনি খালি স্ট্যাটিসটিকস চেয়েছেন। সাতকাণ্ড রামায়ণ করতে গেলে কালকের মধ্যে আপনার রিপোর্ট শেষ হবে না।'

'আলবৎ হবে। রিপোর্টের আপনি কি বোঝেন। আজ পর্যন্ত আমার সাভিস কেরিয়ারে শ পাঁচেক রিপোর্ট লিখেছি, আই মিন লিখিয়েছি! অ্যাপ্রি-কালচার থেকে সেরিকালচার, ফ্রাইম থেকে লাইম, পল্যাশান থেকে ইভলিউশান এনি সাবজেক্ট আই ক্যান ডু জাস্টিস। রিপোর্ট আমাকে শেখাবেন না। আমি রিপোর্টের বাবা।' মিঃ সেনগুপ্ত উত্তেজিত হয়ে ঘণ্টা বাজালেন। মিঃ চৌধুরী একটু ম্লিয়মান হয়ে গেলেন। ডঃ ঘোষাল ইতিমধ্যে পাইপ ধরিয়েছেন। ভঞ্জ মিস নিম্নোগীর দিকে যথারীতি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। সারা ঘরে কিম্বিকম করছে গা কাঁপানো ঠান্ডা।

ঘণ্টা শব্দে স্টেনো দৌড়ে এসেছেন—স্যার। 'টেক ডাউন। ইংরেজী হলে কারুর তোয়াক্বা করতুম না। মিনিস্টার বাঙলায় চেয়ে বড় বিপদে ফেলে দিয়েছেন। না পারছি ভিকটেশান দিতে, না পারছি আইডিবাগলোকে গুঁছিয়ে আনতে। হাওয়েভার ফ্রেমটা তৈরী হয়ে থাক। নিন—ঢোঁক কমা এ সোসিও ইকনমিক রিভাইভ্যাল। ওরান. ইনট্রোডাকশান, ভূমিকায় থাকবে ইউস পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার। টু, টেকনিক্যাল ডিটেলস। অর্থাৎ ঢোঁকির লেংথ, সারকমফারেনস, কি কাঠ থেকে হয়। নৈচার অফ উড ইউসড। শাল, সেগুন, আম, জারুল। পাউণ্ডিং প্রেসার। আপ এন্ড ডাউন মডুমেণ্ট পার মিনিট। এন্ড রাইজিং অর্থাৎ পায়ের চাপে মাটি থেকে কতটা উঠছে।'

ডঃ ঘোষাল মূখ থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন, 'সিঁলি। এ-সব কে চেয়েছে? মিনিস্টার চেয়েছেন ইকনমিক্স মিক্সড উইথ এ বিট অফ সোসিওলজি। দিস ইজ লাইক ধান ভানতে শিবের গীত।' আবার পাইপটা ঠোঁটে গুঁজে

দিলেন।

মিঃ সেনগুপ্ত ভীষণ আহত হয়েছেন। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'ননসেন্স। ফিজিক্স ছাড়া ইকনমিক্স আসবে কি করে মশাই? ধীরে ধীরে জিনিসটা আনফোল্ড করবে। রাম না জন্মাতেই রামায়ণ? ঢেঁকি আগে জন্মাক তারপর তো সব আসবে। ঢেঁকির শৈশব, কৈশোর, যৌবন, এন্ড সো অন। তার স্বভাব। অর্থনীতির ওপর স্বভাবের প্রভাব নেই? ক্যান ইউ ইগনোর ইট? কেন কিছু মানুষ চিরকাল দরিদ্র। কেন আমরা অফিসার এন্ড হি ইজ এ স্টেনো? কেন আমরা অফিসার এন্ড মিনিস্টার ইজ মিনিস্টার? কেন বুলক কার্ট ইজ এ কার্ট এন্ড লরি ইজ এ লরি? আর্টসের স্টুডেন্টেরা চিরকালই ভেরি মাচ ইনকোহেরেন্ট। এভারিথিং শ্রুত বিগিন ফ্রম দি বিগিনিং। ডোন্ট ডিসটার্ব।'

ডক্টর ঘোষাল সোজা উঠে দাঁড়ালেন। মুখে সেই ফরমিডেবল পাইপ চারদিক থেকে তপ তপ করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মনে হচ্ছে স্টেশানে একটা স্টিম ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে, মিঃ সেনগুপ্তর দিকে কিছুরূপ তাকিয়ে থেকে গটগট করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেনগুপ্ত অবাক হয়ে দেখলেন। দরজার চকচকে হাতলে হাত রেখে মিঃ ঘোষাল আর এক হাতে ঠোঁট থেকে পাইপটা খুলে নিলেন, 'আই ওয়াক আউট ইন প্রোটেষ্ট।'

'কিসের প্রোটেষ্ট?' সেনগুপ্ত অবাক হয়েছেন।

'প্রোটেষ্ট আগেনস্ট ইওর ল্যাংগুয়েজ, ইওর ওভারবেরারিং অ্যাটিটিউড। আপনি ননসেন্স বলেন কোন্ সাহসে? কোন্ সাহসে?'

'আই সি! আপনি সিলি বলেন কোন্ সাহসে?'

'সিলি আর ননসেন্স এক হল? সিলি একটা কথার কথা। একটা মাত্র। জাস্ট অ্যান অ্যাডজাক্ট। হোয়াইর অ্যাজ ননসেন্স! একেবার স্ট্রেট ডিরেক্ট চপেটাঘাত।'

'ঠিক আছে ওয়েবস্টার দেখা হোক। লেট ওয়েবস্টার বি দি জাজ ইন দিস কেস।'

'হোয়াই ওয়েবস্টার? হোয়াই নট অক্সফোর্ড?'

'বেশ দূটোই দেখা হোক। ওহে দেখ তো হে।' সেনগুপ্ত ঘূর্ণী চেয়ারে সাঁ করে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে র‍্যাক থেকে দুহাতে দুটো ডিকসনারি

নাড়ু ধরার মত করে ধরে, পায়ের চাপে আবার বোঁ করে ঘুরে টোঁবিলে বই দূটো ফেললেন। হাওয়া আর ধূলোর যুগপৎ ধাক্কায় স্টেনো শুদ্রলোক মদুখটা পেছন দিকে সরিয়ে নিলেন।

মিঃ ভঞ্জ পণ্ডাফেতের মোড়লের মত গলা কবে বললেন, ‘যাকগে, যাকগে। সামান্য কণাৰ মাৰপ্যাঁচ নিয়ে নিজ্জের মধ্যে কলহ করার মানে হয় না। এখন এই দুৰ্যোগে ভূমিকম্পে জ্বললাবনে সাপে মানদুৰেও বন্ধুত্ব করে চলে। সিলিঙ য়া ননসেন্সও তাই। নো ডিফারেন্স।’

স্টেনো বাবদু ততক্ষণে সিলি থুঁলে ফেলেছেন, ‘সিলিঃ ফদ্বলিশ, ইমপ্রুভেন্ট. ষ্টলেস, উইক মাইন্ডেড।’ সেনগদুপ্ত বললেন, ‘জাস্ট সি, হাবা গাবা হাঁদা, গগারাম।’

ঘোষাল বললেন, ‘ওয়েট ওয়েট, ননসেন্সটা দেখা হোক।’

স্টেনো ননসেন্স থুঁললেন, ‘ননসেন্সঃ অ্যাবসার্ড’ অর মিনিংলেস ওয়ার্ড’স অর আইডিয়াস, ফদ্বলিশ, অব একস্ট্রাভ্যাগান্ট কনডাক্ট, অ্যারেঞ্জমেন্ট এটসেটরা।’

সেনগদুপ্ত সকলের দিকে চেয়ে বললেন, ‘শুনলেন, ননসেন্স কোয়ালিফাইজ ওয়ার্ড’স অ ইডিভাজ কনডাক্ট, হোয়াবঅ্যাজ সিলি কোয়ালিফাইজ দি ম্যান। সিলি ইজ রিয়েলি অ্যান অবজেকসানেবল ওয়ার্ড’। ওয়াক আউট করতে হলে আমাকেই করতে হয়। কিন্তু নিজ্জেই নিজের চেম্বার থেকে ওয়াক আউট করি কি করে? সো ইউ ওয়াক ইন অ্যান্ড হেলপ কনস্ট্রাকটিং দি রিপোর্ট।’

ঘোষাল হাতলে হাত রেখে একটু ইতস্তত করছিলেন। এমন সময় বাইরের চাপে দম্ব করে তাঁর নাকের ওপর দরজাটা থুঁলে গেল। পাইপের কঙ্কতে সরা সরি দরজার ধাক্কায় ডাঁটিটা মদুখে ঢুকে গিয়ে টাগরায় খোঁচা মেবেছে। ঘোষাল ঝট বরে পাইপটা বের করে নিয়ে কাশতে কাশতে বললেন, ‘শালা, হারামজাদা’, তারপর কোনো রকমে নিজ্জেকে সামলে নিয়ে যিনি সবচেয়ে ঢুকলেন তাঁকে বললেন, ‘বি এ বিট কেয়ারফুল।’

টকটকে লাল ফোলা ফোলা হাঁসি হাসি মদুখে ঘরে ঢুকলেন গাইনাকোলজিস্ট মিঃ সেন। নড করে ঘোষালকে বললেন, ‘অ্যাম সরি। সব সময় ডেলিভারি কেস অর্গিটেণ্ড করতে করতে উই অর লাইক ফায়ার ব্রিগেডস।’

লম্বা পা ফেলে সেনগদুপ্তের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘হোয়ায় ইজ দি পেশেন্ট?’

‘সেনগদুপ্ত বললেন, ‘সিটিং বিফোর।’

সেন বললেন, ‘শূন্য পড়ুন’ এবং সকলে হেসে উঠলেন ! ভজ হাসলেন খাত খাত করে, চৌধুরী হাসলেন থিক থিক করে । হাসলেন না কেবল ঘোষাল আর নিয়োগী । সেন নিয়োগীকে ‘সরি’ বলে বসে পড়লেন । ঘোষাল ফিরে এলেন । দেখতে দেখতে ঝব ভবে গেল । সেনগুপ্ত বাড়তি চেয়ার আনালেন । আবার কফির হুকুম হল ।

॥ ৩ ॥

‘মিষ্ট্র !’ সেনগুপ্ত লাইব্রেরীখান মিষ্ট্র দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন । কফি খেতে খেতে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছেন । মাঝে মাঝে একটু হাসি । রুম কুলাবে স্নল ইউ খুলে যাবাব বড়াস শব্দ । থেকে থেকে ভঞ্জের বসি টানার প্রবল সৌ । সেনগুপ্ত এতক্ষণ অন্য কি একটা জন্মুরি ফাইলে মন্থ ডুবিয়ে ছিলেন । মিষ্ট্র মিস নিয়োগীব সঙ্গে কথা বলছিলেন । ‘স্যাব’ বলে তটস্থ হলেন ।

‘তুমি উঠদিন ওখান প্রাণী ! আমাকে একটা রিফ নোট সার্বমিট করবে— টেবিল ইতিহাস । আমাদের জীবনে কোন সময় থেকে টেবিল চুবেছে, মেগা-স্থানিস কি মার্কেপোলে, পাল কি সেন রাজা, বেদের কাল কি তারও আগে, অশোবেব শিলালিপিতে কিংবা অজ তার গুহাচিত্রে, টেবিল অরিজিনটা তোমাকে ট্রেস করতে হবে । কোথাও কোনো ফসিল পাওয়া গেছে কিনা ?’

‘ফসিল ?’ আগ্রির দাস যেন একটু অবাক হলেন । ‘ফসিল তো শূন্যে প্রাণীর কিংবা গাছপালারই হয়, টেবিল আবার ফসিল হয় নাকি ? টেবিল ফসিল মানে কার্বোনাইজড উড বা কম্বলা !’

‘চুপ করুন, কিসে কি হয় আপনার জানার কথা নয় । আপনি জানবেন কাটুই পোকা কিংবা ধূসা বোগ । ফসিল ইজ নট ইওর মিট !’ সেনগুপ্ত দাসকে পাণ্ডার করে মিষ্ট্রকে নিয়ে পড়লেন, ‘যেমন করে পারো, টেবিল আদ্যপ্রাথম আজই আমার চাই !’

‘কোথায় পাবো স্যার ? ডিউই ডেসিগ্যাল ক্র্যাসিফিকেশানে টেবিল কোথায় পড়বে ? ফাইভ হান্ড্রেড ওয়ান কি এইট হান্ড্রেড টোল্লেন্ট থ্রি ?’

‘আমি কি করে বলব ? আমি বলতে পারলে তোমাকে ডাকবো কেন ? ফানি !’

‘টেবিলটা কি বলবেন তো ? ফিজিক্স না মেকানিক্স না কোমিশি নচ ফিলোজফি ?’

‘টেবিল আবার কি ? টেবিল, টেবিল !’

মিঃ চৌধুরী আর থাকতে না পেরে বলে ফেললেন, 'ঢেঁকি হল মেকানিক্স, আরকিমিডিসও হতে পারে।'

লাইব্রেরিয়ান দাস বিষয় মূখে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। বিড় বিড় করে বললেন, 'শালার চাকরি।'

সেনগুপ্ত তীক্ষ্ণ গলায় ডাকলেন, 'মিঃ মূখার্জি।' টুকটুকে চেহারার নিরীহ মত এক ভদ্রলোক মূখ তুলে চাইলেন। ফর্সা গালে একটা বড় আঁচিল। খন্দরের পাঞ্জাবি আর খুঁততে পুরোপূর্ণ বাঙালী। সাহেবদের দলে একটা অবস্থিতি মাথা মূখ। মূখার্জি বললেন, 'বলুন স্যার।'

'হ্যান্ড পাউন্ডিং ইম ইওর ইনডাস্ট্রি। আই ওয়ান্ট ডিটেলস, ইকনমিক স্ট্যাটিসটিক্স এন্ড ভল।'

'ঢেঁকি আর নেই স্যার। ঢেঁকি লাটে উঠেছে।'

'লাটে উঠলে তো চলবে না। লাটে থেকে টেনে নামাতে হবে।'

'কি করে নামাবো স্যার? ঢেঁকির শৃঙ্গ শেষ।'

'নতুন শৃঙ্গের সূচনা করতে হবে মিঃ মূখার্জি। মিনিষ্টার চাইছেন ঢেঁকি শিপের প্রসার ও কর্মসংস্থান। ঢেঁকি এ টুল ফর রুর্যাল ইকনমিক ডেভেলপ-মেন্ট।'

'ধান ছাড়াই ঢেঁকি?'

'মূখার্জি, আপনার বোধহয় জানা নেই এ দেশের প্রধান কৃষিপণ্য ধান।'

সেনগুপ্তর খোঁচাটা সকলেই বুঝলেন। মূখার্জি কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই অ্যাগ্রিকালচারের দাস বলে উঠলেন, 'ধান্য, প্রধান কৃষিপণ্য বালকেও জানে, কিন্তু সেই ধান্য তো মাঠ থেকেই সরকারী গুদামে। লোভের কথাটা বোধহয় ভুলেই গেছেন। তারপর গোলা থেকে ধান যায় বড় বড় ধান কলে। তারপর সেই চাল আসে সরকারী হেফাজতে। সেখান থেকে যার পরেশানের দোকানে ফেরার প্রাইস শপে। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে ঢেঁকির কোনো ভূমিকা নেই। নো পোটেনশিয়াল রোল।'

'দেন?' মিঃ সেনগুপ্ত বোকা বোকা মূখে সকলের দিকে তাকালেন।

খাদির মূখার্জি বললেন, 'আমাদের কিছু করার নেই স্যার। ঢেঁকি এখন স্বর্গে গিয়ে ধান ভানতে পারে, নট হিয়ার।'

'দ্যাটস ট্রু।' সেনগুপ্ত আপন মনে বললেন, তারপর কি ভেবে লাফিয়ে উঠলেন, 'বাট? কৃষকের ভাগের ধানটা যার কোথায়?'

পড়ায়েভের বোস বললেন, 'বৌশ্বর ভাগটাই যার হ্যান্ডিং মিলে। এদিক ওদিক কিছ্ হরতো ঢেঁকিতে ভেঙে নের।'

'সে ভাঙাকে তো আর ইনডাসট্রি বলা যায় না। নিজের ব্যবহারের জন্যে। তাহলে তো তোলা উনুনকেও ইনডাসট্রি বলতে হয়।' যদুখার্জি গ্রামীণ শিল্পের তালিকা থেকে ঢেঁকিকে ছেঁটে দিলেন।

'চলবে না, আই ও-ট অ্যালাও দ্যাট।' সেনগুপ্ত চিৎকার করে উঠলেন। 'কি চলবে না, কেন চলবে না, কিসের উত্তেজনা কেউই বুঝলেন না। সকলে বোকার মত তাকিয়ে রইলেন। সেনগুপ্ত উত্তেজনা বজার রেখে বললেন, 'কলে চাল আর তৈরি হবে না, বা হবে সব ঢেঁকিতে। ধ্বংস্বর!'

'ইয়েস স্যার।' একপাশে বসে থাকা ধ্বংস্বরের মনোযোগী হয়ে উঠল।

'তুমি লিখবে, মারের দেওয়া মোটা কাপড় মাথার তুলে নেয়ে ভাই।'

'কিন্তু স্যার, হচ্ছে চালের কথা, সেখানে মোটা কাপড় একটু ইরেলেভেন্ট হয়ে যাবে না?'

'ছি ছি তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে এই কথা বললে। মোটা কাপড় কি শুধু মোটা কাপড়ই মিন করছে, ওর মধ্যে অব্যক্ত রয়েছে মোটা ঢেঁকি ছাঁটা চাল, পুকুরের জ্যাক মাছ, মাঠের র‍্যাক বেঙ্গল।'

'র‍্যাক বেঙ্গলটা কি স্যার?'

'দেশী ছাগলরে বাবা, শোনোনি কচি পাঠায় গা-মাথা কোল? চ্যাটার্জি।'।

নিউইটশানের চ্যাটার্জি বললেন, 'বলুন স্যার।'

'তুমি এই রিপোর্টে গোটা দুই প্যারা সামলাই করবে অন নিউইটশানাল চ্যাল্ড অফ ঢেঁকি। কি ভাবে কল আমাদের সর্বনাশ করছে। পলিশড রাইস মানেই রাইস মাইনাস ভিটামিন বি। ভিটামিন বি মাইনাস মানেই বোরবোর, চাখ খারাপ, পা ফোলা। হার্টের ব্যারোটা। যেমন সাদা ময়দা। যেমন চিনি। ময়দাকল আর চিনির কলও বন্ধ করে দিতে হবে।'

ফুডের ব্যানার্জি বললেন, 'তাহলে তো দেশের মানুষ না খেয়ে মরবে। লক্ষ লক্ষ মণ খান ঢেঁকিতে ভাঙতে গেলে এই মিনিমিস্ট্রির দফারফা হয়ে যাবে। দেশে রেভোলিউশান হয়ে যাবে মশাই।'

'আমরা কোটি কোটি ঢেঁকি বসাবো। লক্ষ লক্ষ পানের চাপে সেই ঢেঁকি দবারাহ খান ভানবে। গ্রামের মানুষের নাইবার খাবার সমস্যা থাকবে না। খালি গজ আর কাজ। ওঃ মিনিমিস্ট্রির ঠিক জারগার হাত দিয়েছেন। গ্রামের একটা



মানুষও আর বেকার থাকবে না। টোটাল এম্পলয়মেন্ট।’

আগ্রিকালচারের দাস বললেন, ‘বন বিভাগ টুটি চেপে ধরবে। কোটি কোটি ঢেঁকির কাঠের জন্যে বন উন্মোচিত হয়ে যাবে। দেশের ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স নষ্ট হবে। ডুম্ফ্রিস, বন্যা কে ঠেকাবে মশাই?’

‘সে রকম হলে লোহার ঢেঁকি তৈরি করব।’

‘মরচে ধরবে।’

‘স্টেনলেস স্টিলের করব।’

ডক্টর ঘোষাল বললেন, ‘এক কিলো চালের দাম তখন দশ টাকা হবে। চাল তখন আর চাল থাকবে না, শুধুই ভিটামিন বি। দু’চামচে গালে ফেলে এক গোলায় জল।’

‘দশ টাকা হবে কেন?’

‘স্ট্রো প্রেসেস, প্রোডাকশন কমে যাবে, দাম বেড়ে যাবে। ভেরি ন্যাচারাল।’

‘ইন দ্যাট কেস ঢেঁকিকে মডারাইজ করবো। বল বেস্টারিং লাগিয়ে দেবো। প্রয়োজন হলে, এক হস’পাওয়ারের ছোট ছোট মোটর ফিট করে দেবো।’

‘বিদ্যুৎ?’

‘বিদ্যুৎ চাই না। স্টিম কিংবা ডিজলে চলবে।’

‘তাহলে এম্পলয়মেন্ট। ঢেঁকি যদি আপনা-আপনিই চলতে থাকে তাহলে বেকারদের কি হবে?’

‘তাও তো বটে! মহা মুশকিল দেখছি। জলে কুমির ডাঙায় বাধ ঘেঁরে বাবা। কোন্ দিকে যাই?’

ফ্রডের ব্যানার্জি হাত নেড়ে নেড়ে বললেন, ‘ওসব আইডিয়া হাড়ুন। আপনার মিনিষ্টারের কক্ষ নয়। সেন্ট্রাল পলিসি পলিটবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আধুনিক চালকল, ময়দাকল সবই রাখতে হবে। ঢেঁকি একটা কিউরিওর মত, ঘর সাজাবার ডেকরেটিভ আইটেমের মত রাখতে পারেন। এগজিবিগনানে দেখাতে পারেন। তার বেশি কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না।’

‘কি করি বলুন তো? মিনিষ্টার যে একটা রিপোর্ট চাইলেন।’ সেনগুপ্ত হাল ভাঙা নাবিকের মত হতাশ গলায় সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

‘লিখে ফেলুন, বেশ গুছিয়ে। আপনার অন্তঃসত্ত্বা ভাগ্যের দরকার কি? হি ওয়াণ্টেন এ রিপোর্ট, গিভ হিম এ রিপোর্ট।’ দাস বেশ কাটা কাটা গলায় বললেন।

‘শুধু শুধু খাটবো। জিনিসটা যখন দাঁড়াবেই না।’ সেনগুপ্ত প্রায় চুপসেই

গেছেন।

‘দাঁড়াবে না কেন? এভাবে না দাঁড়াক আর এক ভাবে দাঁড়াবে। শিল্পে না দাঁড়াক সংস্কৃতিতে দাঁড়াবে। ঢেঁকি ইনডাসট্রি না হয়ে ঢেঁকি কালচার হবে, ঢেঁকি স্পোর্টসও হতে পারে গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায়। প্রতিদিন আইন করে প্রত্যেকে ঘণ্টা পাঁচেক ঢেঁকিতে পাড় দেবে, কম্পালসারি। খান থাকে ভালই, না থাকে হাওয়া কুটবে। দপ্তরটা কেবল পাশেই যাবে। ঢেঁকি শিল্প থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরে চলে যাবে। ঢেঁকি যোগও হতে পারে হঠযোগ। একভাবে, এক জায়গায় এক পদে স্থির থেকে হৃদস্পন্দনের সঙ্গে ঢেঁকির স্পন্দন বেঁধে দিবে, শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে টুকুস টুকুস, টুকুস। ভাবতে পারেন এর চেয়ে বড় যোগ আর কি হতে পারে? চঞ্চল মন স্থির। অসীম একাগ্রতা। মাসখানেকই মোক্ষলাভ। প্রতিটি ঢেঁকিশাল এক একটি সাধনপীঠ। আচ্ছা ঢেঁকি যারা চালান তাঁদের কি বলা হবে?’ দাস হঠাৎ আবেগে ব্রেক করে কুচকটালে একটা প্রশ্ন তুলে ধরলেন।

‘কি বলা হবে মানে?’ ভজ উত্তর দেবার আগে প্রশ্ন করলেন।

‘যেমন কুম্ভ করে যে কুম্ভকাব, সেলাই কলে দাঁজ, মেশিনে মিস্টি,

তো ‘নি ঢেঁকিতে কি?’

যে পবীক্ষার হলৈর নিম্নত্বতা নেমে এল। সকলেই ভাবলেন। বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভাব। কে আর জবাব দিতে, কে পারে আগে। দাস কেবল রিল্যাক্সড, কারণ তিনি এগজামিনার।

ভজ বাজি মাত করলেন, ‘ঢেঁকিশালিকা।’

সকলে সম্মুখে উচ্চারণ করলেন, ‘ঢেঁকিশালিকা।’

তারপর একটু আগে-পরে সকলেরই এক প্রশ্ন, কেন, কেন?

ভজ সংস্কৃতে সুপরিচিত। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, ‘ঢেঁকি যেখানে থাকে তাকে বলে ঢেঁকিশালিকা।’

সকলে মাথা নাড়লেন, ‘ইয়েস অ্যাপ্রুভড।’ ভজ ঘাড় নাড় দোঁপে আর একটু এগোলেন, ‘সেই ঢেঁকিশালের ঢেঁকি মালিক, ইক প্রভান্স মালিক খটিক। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, ঢেঁকিশাল প্লাস ইক, ঢেঁকিশালিক। স্ট্রী লিপে আ ঢেঁকিশালিকা। সংস্কৃত জানা থাকলে নতুন শব্দ বের করতে কতকণ। ম্যাটার অফ সেকেন্ডস।’

নতুন শব্দটা পেয়ে দাস আবার কাটা বক্তৃতা জোড়া লাগালেন, ‘সেই

টেকিপীঠ থেকে বছরে বছরে সিন্ধ টেকিশালিক শালিকারা বেরোলেন । তাঁরা আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন । তাঁরা ধীর, স্থির, সংযমী জিতেন্দ্রিয় । তাঁদের চাওয়া নেই, পাওয়া নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই । মিনিমাম জৈব প্রয়োজন । সবরকম কনজামসান কমা মানেন, আমাদের সারস্লাস । সারস্লাস মানেই চাহিদার চেয়ে যোগান বেশি, তার মানে মূল্য পতন । যে নিজেকে জয় করেছে তার আবার কিসের চাকরি । সে তো রাজার ছেলেরে ভাই । রাজার ছেলের কি মাসোহারার অভাব হয় । দেশের ঐশ্বর্য্য অবস্থার চাষ বাড়ল কি কমল, শিল্প উৎপাদন হল কি হল না কাঁচ-কলা । বিকোশ নেই, রাজনীতি নেই, ক্রাইম নেই, পিকপকেট নেই, স্ত্রী নেই, পরিবার নেই । শূন্য চিদানন্দ শূন্য চিদানন্দ । ফিরে চল বেদের যুগে, বেদান্তের যুগে । আমি চাই না মাগো রাজা হতে, রাজা হবার সাধ নাই মা চিতে । টেকির গা বেয়ে ধুনোর মত, রবারের মত গাড়িয়ে পড়ছে স্বদেশী চেতনা । বল টেকি আমার মা । নিন আপনার রিপোর্টের ইন্সট্রাকশান—টেকি ইন এ নিউ লাইট । বাকিটা ভেরি ইজি ।’ দাস হাসি হাসি মুখে সিগারেট খরালেন ।

সেনগুপ্ত অবাক হয়ে কিহৃক্ষা তাকিয়ে থেকে বললেন : ‘ব্রিলি-  
দাস, সিম্পলি ব্রিলিয়েন্ট । ধূরন্ধর লিখে ফেল, তা না হলে খারিয়ে যাবে ।  
উইল বি লস্ট ইন দি ইথার ।’

॥ ৪ ॥

ধূরন্ধর তার স্বভাবসিদ্ধ ঢঙ এবং অক্লেশে প্রায় নিমেষে একটি রিপোর্ট তৈরি করে ফেলল । সে যখন রিপোর্ট লেখায় ব্যস্ত তখন বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তারা বড় বড় ক্লাবে স্যান্ডউইচ সহযোগে অনেক টাকা কেজির ভূরভূরে চা খেলেন । নিজেকে মাইনে কি করে আরো বাড়িয়ে দেবে তা নিয়ে চিন্তিত । ধূরন্ধর এক জায়গার আটকে গিয়েছিল টেকির পরিসংখ্যানে । সংখ্যাবিদ্যে চৌধুরী সমগ্র সমাধান করে দিলেন । ধূরন্ধরকে কত প্রশংসা করলেন । ‘কত কত ?’

ধূরন্ধর বললে, ‘কয়েক কোটি ।’ সঠিক সংখ্যাটা জানা ছিল না ।

‘কত পারসেন্ট গ্রামে থাকে ?’

‘সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট ।’

‘তাহলে গ্রামবাসীর সংখ্যা কত ?’

‘কয়েক ফোটা ।’

‘এভারেস্ট ফ্যামিলি সাইজ পাঁচ হলে ঢেঁকির সংখ্যা কত ? বরুণ প্রতি পাঁচজনে একটা ঢেঁকি ।’

‘কয়েক ফোটা ডিভাইডেড বাই পাঁচ ইজ ইকোয়াল টু কয়েক লক্ষ ।’

‘রাইট । কয়েক লক্ষ ঢেঁকি ।’

ধুবধর রিপোর্টটা শেষ করল এই ভাবে :

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে । ধান ভানার জন্যেই তার জন্ম । ঢেঁকির সেই পবিত্র কর্তব্য থেকে ঢেঁকিকে যাঁরা বিচ্যুত করতে চান তাঁরা শব্দ ঢেঁকির শব্দ নন, দেশেরও শব্দ । গ্রামবধুর ঘরে ঘরে ঢেঁকি কেন আলস্যের শয্যায় ! তার জঠরে কেন ঘৃণ পোকের ককঁশ আতঁনাদ ! নিশ্চয়ই মধ্যাহ্নে কোথায় সেই হৃদয়ের শব্দ ! চাষ আছে, ধান আছে, কৃষক আছে, কৃষকবধু আছে, তবু ঢেঁকি কেন কোমল চরণপাতে দামাল ছেলের মত ধূপধাপ করে না ! ঢেঁকিকে কারা আজ জরাগ্রস্ত বৃদ্ধার মত দাওয়ার একপাশে অবহেলার বসিয়ে রেখেছে । এমন একটা শক্তিশালী যন্ত্রের চূর্ণ-বিচূর্ণ করার ক্ষমতা হরণ করে কারা তাকে সামান্য একটি কাষ্টখণ্ডের উপহাসে পরিণত করেছে ! কারণ অনুমান করতে হবে । অপরাধীদের গাছের ডাল ডালে ঝোলাতে হবে । ডালে ঝোলাই এদের উপযুক্ত শাস্তি । এর জন্যে প্রয়োজন ~~কোনো~~ <sup>কোনো</sup> বিচারকে নিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি বসাতে হবে, যার বিচার্য বিষয় :

(১) ঢেঁকি, অতীত ও বর্তমান (২) ঢেঁকির উচ্ছেদে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র (৩) ধনতন্ত্রের চাপ (৪) বেকার সমস্যা সমাধানে ঢেঁকি (৫) ঢেঁকি ও ব্যালান্স (৬) আত্মরক্ষায় ঢেঁকি (৭) ঢেঁকি ও আগামীদিনের আশানন্দ (৮) ঢেঁকি ও মনুষ্যের পবিত্রতা (৯) কাব্য ও সাহিত্যে ঢেঁকি (১০) ঢেঁকির ধর্ম (১১) ধর্মের ঢেঁকি (১২) অধার্মিক ঢেঁকি (১৩) ঢেঁকি সংস্কৃতি (১৪) জাতীয় জাগরণের হাতিয়ার ঢেঁকি ।

বৃদ্ধার । সকাল দশটা তিরিশ মিনিট । চারদিকে ঝলমলে রোদ । আকাশে শব্দ-শব্দ ভাব । ট্রাম বাস মিনিবাস অফিসপাড়ার লোক উগরে দিয়ে চলে যাচ্ছে । পিল পিল করে পিপড়ের সারির মত মানুষ চলেছে ।

সবুজ হচ্ছে। মিস সেনগুপ্ত ও তাঁর দলবল করিডর ধরে এগিয়ে আসছেন।  
সবার আগে সেনগুপ্ত। তাঁর হাতে একটি সুদৃশ্য ফাইল ফ্ল্যাপ দিয়ে বাঁধা।  
সকলেরই বেশ তাজা চেহারা। সবে স্নান করেছেন। দিনটিও বেশ তাজা।  
শীতল বাতাস বইছে।

মন্ত্রীর ঘরের বাইরে বাঙলায় লেখা নামের ফলক। টিলটিলে কাটা  
দরজা। নীল রঙ। ওপরে সুদৃশ্য কাঁচ। মন্ত্রীর ঘরের বাইরে বসেন পি-  
এস, পি-এ, সি-এ। তুড়ুক তুড়ুক কবে টাইপ রাইটার শব্দ করছে। কাটা  
দরজার সামনে এসে সেনগুপ্ত ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইসারায় তাঁর বাহিনীকে  
বললেন, 'হল্ট!' সকলে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সকলের ভিতরে যাবার প্রয়োজন  
নেই। সেনগুপ্ত একলা যাবেন। ফাইলটাকে বগলে বাগিয়ে ধরে একটা  
চীতাবাঘের মত কাটা দরজা গলে সেনগুপ্ত ঢুকে পড়লেন। পি-এ টাইপ-  
রাইটার থেকে মুখ তুলে তাকালেন। সেনগুপ্ত হাসি হাসি মুখে চোখের  
ভাঙ্গা দৃষ্টিকে ওপর নিচে নামিয়ে বোঝাতে। চাইলেন মন্ত্রী আছেন কিনা।  
পি-এ তুড়ুক তুড়ুক করতে করতে ঘাড় নাড়লেন অর্থাৎ আছেন।

সেনগুপ্ত তখন ভীষণ অসুস্থ রুগীর ঘরের দরজা যেভাবে খোলে সেই  
ভাবে আলতো হাতের চাপে দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে চোখ দুটো রাখলেন।  
পরক্ষণেই সোজা হয়ে বগলের ফাইলটাকে ঘুরিয়ে বগল থেকে বেরলেন।  
জামাটা পরে ফাঁক করলেন। বারকতক ঢোক গিললেন।  
তারপর দরজাটা যতদূর সম্ভব কম ফাঁক করে ঘরে সেঁদিয়ে গেলেন।

ঘোবালের পাইপ ধোঁয়া ছাড়ছে। চৌধুরীর সিগারেট অল্প ধোঁয়া ছাড়ছে।  
ভজর পায়ের তলায় নস্যার গুড়ো জমছে। ওদিকে ধূরন্ধর ভিড়ের বাসে  
বাদুড়ের মত ঝুলছে। মিস নিয়োগী ঘাড় দেখছেন। প্রায় পনের মিনিট  
হল। টাইপরাইটার অনবরত তড়পাচ্ছে। হঠাৎ বাড়ির বেগে সেনগুপ্ত  
বেরিয়ে এলেন। কারুর সঙ্গে কোনো কথা নেই। বগলে সেই সুদৃশ্য  
ফাইল। যেদিক থেকে এসেছিলেন সেইদিকেই হেঁটে চললেন গটগট করে।  
মেজর জেনারেলের মত। দলবল পেছনে।

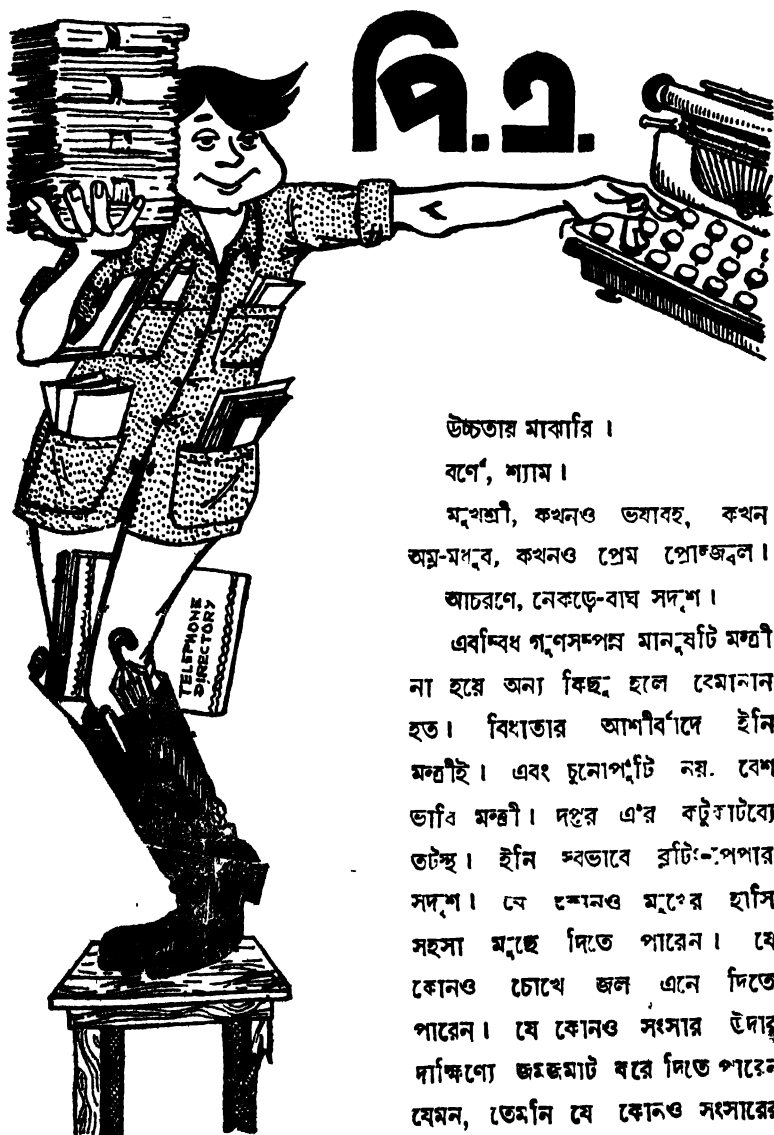
নিজের ঘরে ঢুকেই ফাইলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের ওপরে।  
চমকটা টেবিলের বিপরীত দিকে ঘুরে ছিল। সোজা করে নিজে খপ করে\*  
বসেই একসঙ্গে তিনটে বোতাম টিপলেন। পি-এ আর পিওন প্রায় একসঙ্গেই

‘কফি। টেক ডাউন। টু অল ডি-এক্স। ইমিডিয়েটলি সেন্ট রিপোর্টস অন পোস্টিভ এন্ড ডেয়ারী। অ্যাসেস দি ম্যাক্সিমাম অ্যাভেলিবিলাটি অফ গ্রীন গ্রাস। মার্ক আউট প্রোজিং গ্রাউন্ড উইথ আমিনস। কিম্বু ব্রোড অল দি বার্ড ক্যাচারস ফর ক্যাচিং ওয়াইল্ড ফাউলস। ফিল অল ফকসেস এন্ড জ্যাকলস। টপ প্রায়রিটি ইমিডিয়েট থ্রি টাইমস আরজেন্ট। টেলেকস।’

সেকসন অফিসার ঢুকলেন। সেনগুপ্ত কোন রকম ভূমিকা না করেই বললেন, ‘অ্যাগ্রির দাস অ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রর বোস ফুডের ব্যানার্জি ফরেস্টের কাঙসারি। যে যে অবস্থায় আছেন এখন আসতে বলুন। ইয়েস ধুরন্ধর, মিনিষ্টারস অর্ডার। সেকসান অফিসার প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। সেনগুপ্ত কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, ‘ইউ আর অল ট্রেটারস। বিভীষণ। আপনাদের পয়েন্ট আউট করা উচিত ছিল, ঢেকি ধান ছাড়াও কুড়ো কুটতে পারে, ঘাস খেঁতো করতে পারে, এনিথিং চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারে। আই সে এগেন এন্ড এগেন, ইউ আর অল সিলি টু দি পাওয়ার ইনিফিনিটি।’

পাইপ মুখে ঘোষাল উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

সেনগুপ্ত বললেন : ‘নো মোর ওয়াক আউট। ওসব চালাকি আর চলবে না। দোজ ডেজ আর গন। মন্ত্রী বলেছেন, গ্রামে গ্রামে পোলট্রি আর ডেয়ারী করতে হবে। এ পোলট্রি সে পোলট্রি নয় স্যার। লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড, নো সাহেব মুরগী। নিভেজাল বনমুরগী ধরে আনতে হবে। ঢেকিছাঁটা কুড়ো বোনমিল, ভিটামিন ট্যাবলেট হ্যানাত্যানা দিয়ে ঘরে ঘরে ফিড তৈরি হবে। মুরগী দিয়ে গরু দিয়ে, ডিম দিয়ে দুধ দিয়ে গ্রাম জাগাতে হবে। এ ভোলানাথ সে ভোলানাথ নয় রে বাবা। চুপ করে বসুন। লেট ধুরন্ধর কাম। সুন্দর করে রিপোর্টটা লিখে ফেল।’



# দি.এ.

উচ্চতার মাঝারি ।

বর্ণে, শ্যাম ।

মদুশ্রী, কখনও ভয়াবহ, কখন  
অল্প-মধুব, কখনও প্রেম প্রোজ্জ্বল ।

আচরণে, নেকড়ে-বাঘ সদৃশ ।

এবাম্বিধ গুণসম্পন্ন মানুষটি মস্ত্রী  
না হয়ে অন্য কিছু হলে যেমানান  
হত । বিখ্যাতর আশীর্বাদে ইনি  
মস্ত্রীই । এবং চুনোপুটি নয়, বেশ  
ভাবি মস্ত্রী । দপ্তর এ'র বটুকাটবো  
তটস্থ । ইনি স্বভাবে ব্রটিং-পপার  
সদৃশ । যে দেশেও মূ'রে হাসি  
সহসা মূছে দিতে পারেন । যে  
কোনও চোখে জল এনে দিতে  
পারেন । যে কোনও সংসার উদাক্ত  
দাক্ষিণ্যে জজ্জমাট করে দিতে পারেন  
যেমন, তেমন যে কোনও সংসারের

ভিটের জোড়া বন্ধুও চারিজে দিতে পারেন। ইনি কখনও করা কখনও থরা।

‘আমার ভয় পান’। এই ভেবেই তাঁর আনন্দ। ‘আমি টেরিবল’। এই প্রসাদগুণেই ইনি সন্ধ্যাত। এ হেন একজন দুরন্ত মন্ত্রীর দপ্তরে শ্যামাচরণ পি-এ হবার সৌভাগ্য নিয়ে আদি সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল উনিশশো ছত্রিশ সালের কোনও এক মাসে। তখন সে জানত না তার ভাগ্যে কি লেখা আছে। যখন জানল তখন আর পালাবার পথ নেই। বশিকমবাবু বি-এ পাশ করে ডেপুটি হয়েছিলেন। শ্যামাচরণ বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলে খেয়ে এ দপ্তর সে দপ্তরে হাত ফেরতা হতে হতে খোদ মন্ত্রীর দপ্তরে পি-এ হয়ে বসেছে। সিনিয়ররা হস্টলেন, বরাও তোমার ভাল শ্যামাচরণ। হলে খুব হবে না হলে হলে পু...। জিনিসটা বেশ ভালই। ট্যাকল করতে পারলেই টাকা। না... সেই ফাঁকা। সাকারানের সেই তম্বী মহিলাটিকে স্মরণ কর, যে ব... না সিংহের গলা জড়িয়ে ধরে গৌকে চুমু খায়। এও সেই একই পদ্ধতি...টোমং এ লিও।

সাকারানের সিন্ধু... মন্ত্রীর মৌততে থাকে। মন্ত্রী থাকেন ক্ষমতার টাটে। বিলিতি কক্ষ... মন্ত্রীর ঘণ্টাবমান কাচোর কাঁচোর চেঁচারে। গাঁদর ওপন গাঁদ... মন্ত্রীর বড়ই স্পর্শকাতর। সামনে অশ্বখুরাকৃতি ডবল ডেকার টেবিল। কক্ষকে চকচকে। ব্র্যাসো দিয়ে মাজা পেতলের পেপাবওয়েট মন্ডিডোলা সারি সারি। যেন ক্ষমতা বোতাম। মেজাজের মুরগী ঘড়ি। ঠকাস ঠকাস করে ঠুকে কাগজে চাপা দিলে অরডারলি পিওন বন্ধুতে পরে মালিক কাপড়ের মেজাজ চড়ে আছে। টুকুস টুকুস করে নাড়াচাড়া করলে বন্ধুতে পারে মন্ত্রী-মহোদয় এখন খেলোয়াড়ী মেজাজে আছেন। ঘরজোড়া নরম কাপেটি। পা ভুবে যায়। এরদর্শিনী টেলিফোনের সারি। কখনও একটা বাজে যখনও সবকটা... মন্ত্রীর শিগুর মত কবিরে ওঠে। ফোন বাজার দাপট দেখলে দেশের... মন্ত্রীর স্থিতি বোকা যায়। যখন মন্দ মন্দ একটু কি দুটি রি... রি... রি... করে, তখন বন্ধুতে হবে বিরোধীরা শান্ত, লাশটাণ তেমন পড়ছে না, ব্যাংডা তেমন উড়ছে না, মিছিল রাজপথে তেমন পাক মেরে মেরে ঘরমুখে অফিস খাত্রীদেয় পাক-দাড়ীতে বেঁধে ফেলছে না, বিধানসভার জুতো ব্যাটা লাথি চলছে না। শিবিরে শিবিরে বিরাজ করছে সমঝোতার শান্তি। ফোনে তখন প্যানপেনে প্রেমের বুলি। কিন্তু লাল, গোলাপী, নীল সবকটাই যখন জেঁড়ফুঁড়ে বাজতে থাকে, যখন এ কানে একটা ও কানে একটা, দু'কাঁধে দুটো সব সপ্তগ্রামে, তখন বন্ধুতে হবে গেল গেল অবস্থা। গাঁদ করে টলমল পসরাতে ওঠে জল।



আজ সেইরকম একটা দিন। মন্ত্রী কানে লাল টেলিফোন। তিনি খ্যাস-খ্যাসে গলায় ওপাশের মানুষটিকে বেজায় ধমকাচ্ছেন। কথায় সামান্য গ্রাম্য টান। সেই টানটাকে সযত্নে ধরে রেখেছেন কারণ তিনি মনে করেন—তিনি জনতার প্রতিনিধি। ঠাণ্ডা ঘরে কাঁচ মোড়া টেবিলে টাট সাজিয়ে বসে থাকলেও তিনি আছেন মৃত্তিকার কাছাকাছি, তাঁদের সেবক দাসানুদাস হয়ে।

মন্ত্রী বলছেন—দাঁত মেলছো মনে হচ্ছে। (ও প্রান্তে যিনি তিনি বোধহয় হে হে করে হাসির ভাব এনেছিলেন কথায়। ডাক্তারী ভাষায় এ ব্যাধিকে বলে 'গ্যান প্রকসিমিটি রিফ্লেক্স'। অনেকের যেমন বাইরে বাবার নাম শুনলেই নিম্নবেগ) বড় মানুষের সামনা সামনি হলেই অনেকে অজান্তেই হাত কচলাতে থাকেন আ... দিয়ে হে' হে' করে বিচিত্র শব্দ ফেপণ করতে থাকেন। মূখের চেহারা হয় কুমোরে... কাঁচা মূখ মাটিতে জোর করে খেবড়ে বাসিয়ে দিলে যেমন হবে, সেই বকম) ওই... আমি একটা করে খুলে স্যাপারেট পাসের করে তোমার বউয়ের কাছে পাঠিয়ে... বামজাদা। মালা করে পরবে। মানকে। মানকে বড় না আমি বড় শুমোর? শুমোর বলে ঝপাং করে ফোন ফেলে দিয়ে পায়ের কাছে বোতামে চান... সেই ভদ্রসন্তানকে

শ্যামাচরণের মাথার ওপর লাল আলো দূরদূর করে জ্বলে উঠল। শ্যামা-চরণ স্টেনোর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিল হাসি ফিউজ হয়ে গেল। পেটে মৌরলা মাছের কোল পাক খেয়ে উঠল ব্যাকোয়ারিয়ারের মাছের মত (শ্যামাচরণ হালে বিয়ে করেছে। নতুন বউ স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্যে ইদানীং বঙ্গসন্তান-টিকে মৌরলা মাছের কোল সেবন করছেন। মন্ত্রীর পি-এ। ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে স্মৃতি আর শ্রুতির ওপর। মন্ত্রীর নেকনজরে হয় ছোমোশান না হয় লিকুইডেশান। এখন স্বামী আমার রং চটা পতপতে তেরপল ঢাকা পিঁপে অফিস-ঘর। মই বেয়ে আর একটু উঠতে পারলেই মোটর গাড়ি। ফোন হবে। হব, ট্রা হব, টি-এ হব।)

শ্যামাচরণ হিলহিলে ঠাণ্ডাঘরে ঢুকল। মন্ত্রী তখন দূর দাঁতের মাঝে একটা টুথপিক ধরে তিরতির করে নাচাচ্ছেন। টেবিলের ওপর হাতের চেটো আঙুল নিয়ে খেলছে। শ্যামাচরণ ঢুকতেই মন্ত্রী টেনে টেনে বললেন—শুমোরের বাচ্চা।

শ্যামাচরণ বলল—ইয়েস স্যার (কোরিয়ার গাইড বলছে—ডোন্ট প্রোটেষ্ট এ মিনিষ্টার। অ্যাকসেস্ট এন্টারিং অ্যাজ অমৃতং কালমন্ত্রী ভাষিতঃ)।

মন্ত্রী বললেন—বাঁশ দেবো। আছোলা বাঁশ।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : দিল্লী থেকে বাঁশ আনব।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : ইউ আর এ ফুল।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : আজই আমি দিল্লী যাব।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার (কোরিয়ার গাইড বলছে, ট্যাকল এ মিনিস্টার উইথ লিমিটেড ভোকাবুলারি। প্লে ক্রেভারলি উইথ টু ওয়ারডস—ইয়েস অ্যান্ড স্যার। প্লেস ইট বিফোর প্লেস ইট আফটার, পাশ ইট হিয়ার পাশ ইট দেয়ার অ্যাজ অফন অ্যাজ ইউ গেট ইউর চানস। হোয়েন ইউ লিভ দেয়াব শূড বিয়েন নাথিং বাট ইয়েস অ্যান্ড স্যার।)

মন্ত্রী : কিসে খাব?

শ্যামাচরণ : প্লেনে নয় স্যার ট্রেনে।

মন্ত্রী : কেন ট্রেনে?

শ্যামাচরণ : অ্যান্ডলজার অ্যান্ডভাইস ববেছেন স্যার প্লেনে স্যার গেলে স্যার অ্যাকসিডেন্ট হবে স্যার।

মন্ত্রী : রাজধানীর টিকিট চাই। দাঁড়িয়ে আছি কেন? যাও এখনই যোগাড় কর। (সূর করে) হডিবেট।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

প্যান্টটাকে ভুড়িতে বেঁধে ধরে টাইট করে শ্যামাচরণ চুপ কিত কিত করে ছুটল রাজধানীর টিকিট যোগাড়ে। ভি আই পি কোটা বললেই তো হল না, ভি আই পি-এ সংখ্যা কম নাকি? একটা ট্রেন অনেক ভি আই পি। শ্যামাচরণের মন্ত্রী, অন্যের তো তিনি মন্ত্রী নন। হু বেয়ারস হু? তোমার মন্ত্রী তুমি মাথায় করে দিল্লী নিয়ে যাও। এ যেন তোমার বউ তুমি মাগে সামলাও। শ্যামাচরণ অতি কষ্টে কান ধরে ওঠে বোস করে পাঁচটা সিমেন্টের টোপ ফেলে একটা টিকিট ম্যানেজ করল। কোরিয়ার গাইড বলছে, স্ট্রীকে এবং মন্ত্রীকে জীবন দিয়েও সন্তুষ্ট রাখবে। আর প্রমিস? প্রমিস ইজ এ থিং হুইচ ইউ আর নেভার এক্সপেক্টেড টু ফুলফিল। মন্ত্রীকে কোরিয়ার তো অস্বীকারের মত শব্দ শুধু শুধু ওপরেই হাসছে, খেলছে

ভাঙছে, জুড়ছে।

মন্ত্রী বললেন, টিকিট পেয়েছ ?

শ্যামাচরণ : পেয়েছি স্যার।

মন্ত্রী : সিকিউরিটিকে জানিয়ে রাখ। আমার ব্যাগেজ রোড কর।

জনতার সেবক হলেও জনতা মন্ত্রীর সেবক নাও হতে পারে। হাতের কাছে হ্যান্ড কিছুর পেয়ে ছুড়ে মেরে দিতেও পারে। তখন ? ক্ষতি ভোগে দেশেরই হবে। মন্ত্রীর আর কি ? তিনি মরে ছুত হবেন। কে বলে মন্ত্রীর উপদ্রবের চেয়ে ভূতের উপদ্রব ভাল। তাদের কোনও ধারণা নেই। শ্যামাচরণের আছে। সে দেখেছে কোনও মন্ত্রী তার পি একে মনে মনে অথবা সশব্দে একশো আটবার মনুষ্যতর প্রাণীতে সম্বোধন করলেই একটি প্রমোশান। তার অর্থ কি তাহলে দুধ মেরে যেমন ক্ষীর পশু ঘন হলেই একটি উচ্চপদ। শ্যামাচরণ চা খেয়ে চেয়ারে চিত্তরে পড়ল। ভূঁড়িটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

এদিকে বেলা বাড়ছে। আকাশে ঘন মেঘ। এল বৃষ্টি বৃষ্টি। লাগের সময় শুরুর হল শহর ভাসান বৃষ্টি। মন্ত্রী আর পি-এ যখন রাস্তার নামলেন তখন রাজপথের বা অবস্থা, তাতে আর মোটর নয় স্পিডবোট চলতে পারে।

মন্ত্রী তাল ঠুকে বললেন, তোমাদের ষড়যন্ত্র।

শ্যামাচরণ ইয়েস স্যার বলতে গিয়েও সামলে নিল। নো স্যার।

মন্ত্রী : তোমরা জানতে আমি আজ দিল্লী যাব।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : তবে নো স্যার বললে কোন আবেলে অ্যা। খোদার খাসি।

শ্যামাচরণ : ইয়েস স্যার।

মন্ত্রী : তোমরা আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে যেভাবেই হোক। আই সিস্ট ক্যাচ দি ট্রেন।

মন্ত্রী উঠলেন গাড়িতে। পেছনের আসনে তিনি। সামনে সিকিউরিটি আর পি এ শ্যামাচরণ। গাড়ি চলেছে স্টেশনের দিকে। মন্ত্রী জ্বাইভারকে ধমকাচ্ছেন, টেনে বাদি ধরাতে না পারিস তোকে আমি বিরোধী বলি বরখাস্ত করবো। ষড়যন্ত্র। আই নো হু আর বিহাইন্ড দিস। এর পেছনে আমার দলের ফ্যাকসান আছে আর আছে অপোজিশান। জ্বাইভার মনে মনে বললে, অপোজিশান হল ঈশ্বর স্যার। মন্ত্রী শুরুরের বাচ্চা, শুরুরের বাচ্চা অপ

করতে করতে পুরমন্ডীর মন্ডপাত করতে লাগলেন। জপাং সিকি। কিছুকণের  
 মধ্যেই তাঁর মনে হল সারা শহরে এক হাটু নোঙরা জলে থই থই করছে  
 পালপাল শব্দে। একটা দাড়িওয়ালা শব্দে একটা লরি চালিয়ে তাঁর গাড়ির  
 সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

মন্ডী ড্রাইভারকে বললেন, সাইরেন লাগাও। হঠাৎ তাঁর মনে হল গাড়ির  
 সামনে পতাকা লাগান হলনি। হোয়াট? ষড়যন্ত্র! শ্যামাচরণ! গো।  
 গেট দি ফ্লাগ। রাসকেল।

ভগবান বাঁচালেন। ফ্লাগ গাড়িতেই ছিল। এক কোমর জলে নেমে  
 শ্যামাচরণ পতাকাদণ্ডে পতাকা পরাল। ঘন ঘন সাইরেন, দণ্ডে জলে  
 ভেজা পতাকা, মন্ডীর শুকরোক্তি, সিকিউরিটির চড়চাপড় কোনও কিছতেই  
 জ্যাম খুলল না। মন্ডী মনে মনে তিনজন ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে ফেললেন।  
 তার মধ্যে সাদা বর্ণাতি মোড়া ট্রাফিক পুলিশটিও পড়ল। পুরমন্ডী যে  
 ত্রুর অ্যান্টি গ্রুপে সে সত্যটিও জলমগ্ন রাস্তার গাড়িতে বসে তাঁর খেলা  
 হল। মনে মনে বললেন, আই উইল সি। সি শব্দটি মনে আসতেই হাত  
 ধুরিয়ে বাড়ি দেখলেন। আর মাত্র পঁচিশ মিনিট। শ্যামাচরণ।

ইয়েস স্যার।

নেমে পড়।

শ্যামাচরণ জলে নামল। নেমেই বুকল চাকরির জল কত ঘোলা।

মন্ডী—দৌড়ও। তুমি গিয়ে টেনে ধরে রাখো। গার্ডকে বল মিনিষ্টার  
 আসছেন। গোও।

শ্যামাচরণ সেই হাটু জলে হাঁচর পাঁচর করে দৌড়তে শুরু করল। উঃ  
 ভূঁড়িটাই এখন দেখছি কাল হল। জরির ফাঁক গলে, ট্রামের পাশ দিয়ে,  
 রিকশার কোল, গলি খানাখন্দ পেরিয়ে পি-এ ছুটছে।

হাওড়া স্টেশন। গার্ড স্নোব বার্শি মেরেছেন। পতাকা কটাপট করছে।  
 টেনে জড়ল বলে। কাকভেজা একটি লোক ইঞ্জিনের চেনেও বেশি হাঁপাতে  
 হাঁপাতে সটান তাঁর পায়ে এসে পড়ল।

শ্যামাচরণ : স্টপ, স্টপ, মিনিষ্টার ইজ কামিং।

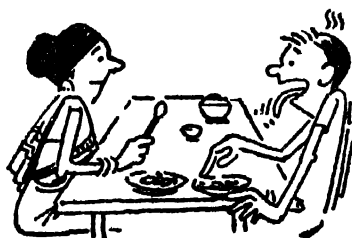
গার্ড স্নোব তলান পড়ে থাকা মানুষটিকে দেখলেন। প্ল্যাটফর্মেও পুলিশের  
 আয়োজন ছিল, যেহেতু মন্ডী যাবেন। শ্যামাচরণ জ্ঞান হারাবার আগে পীর-  
 কাকর ঝংলায় বলল, বাঁচান, মন্ডী আসছেন। আমি তাঁর পি-এ।

গাড়ি লেগে রইল। পুঁলিশ তৎপর হল। আসছেন, তিনি আসছেন। কামরায় কামরায় অসম্ভবট যাত্রী। চুক হরিদাস পাল। অবশ্য তাঁরা জানতেই পারলেন না, বেন টেনে ছাড়ছে না। গার্ডসাহেব বললেন, টেকনিক্যাল প্রবলেম।

হঠাৎ পুঁলিশবাহিনী সজাগ হয়ে অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়াল। একটা মাঝারি উচ্চতার পাজামা পাজাবী পরা মানুষ গটগট করে এগিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। পি-এ শ্যামাচরণ সবে তখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। শীতে কঁপতে কঁপতে ফাইলে নোট লেখার ভাষায় বললে—ডান স্যার, অ্যাজ ডাইরেক্টেড।

মন্ত্রী চলমান গাড়ির জানালা থেকে স্নেহের গলায় বললেন, আই উইল সি।

উপসংহারঃ সত্যিই তিনি দেখেছিলেন। শ্যামাচরণ মাছের মত জল কাটতে পারে। হি হ্যাজ প্রুভড ইট। শ্যামাচরণকে মৎস্য বিভাগের উচ্চপদে রেখে মন্ত্রী আই উইল সি করলেন। শ্যামাচরণ দম্পতি সেই প্রবাদবাক্যের বিপরীত উদাহরণের মত লেখাপড়া শিখেও মৎস্য ধরিতে লাগিলেন এবং সুখে খাইতে লাগিলেন দীর্ঘকাল। অরে মন্ত্রী মহোদয় নির্বাচনে গভীর জলে তলাইয়া গেলেন।



# প্যান্টের বাতাম



বাঁকম পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে সাড়ে নটার বাসটা ধরে ফেলল। সামনের দরজা দিয়ে সে পারতপক্ষে উঠতে চায় না, পড়লেই অবধারিত মৃত্যু। পেছনের দরজায় তবু হাড়গোড় ভেঙেও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। কড়কি নিয়ে সামনের দরজাতেই উঠল। ফুটবোর্ডে মিনিট খানেক লাট খেল তারপর বলম্ বলম্ বাহুবলম্ করে সামনের লোডিজ সিটের কাছে একটু দাঁড়াবার জায়গা করে নিল। দুহাত দিয়ে মাথার ওপরের রড শক্ত করে ধরেছে। পা দুটো যথাসম্ভব ফাঁক। তা না হলে ব্যালেন্স রাখতে পারবে না। বাস চলেছে উদ্‌বাসে! যখন থামছে পেছন থেকে সামনে পর্বত

একটা ঢেউ খেলে যাচ্ছে। যখন ছাড়ছে তখন সামনে থেকে পেছনে।  
 ঢেউয়ের দোলায় বস্কিম কখন বামে, কখন ডানে অঙ্গ একটু হেলে যাচ্ছে।  
 ভেতরে তিনটে লাইন হয়েছে। পেছন থেকে যখন চাপ আসছে বস্কিমের  
 ভুঁড়িটা সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

বস্কিম সাধারণত চোখ বন্ধিয়ে কোনো একটা ভাবনা বা একাধিক ভাবনা  
 লোফাল্‌লুফি করতে করতে, আধঘন্টার পথ পার করে দেয়। আজও চোখ  
 বন্ধিয়ে ছিল। ভাবছিল সকালেই মিটিং আছে। অফিসে পৌঁছে মিনিট  
 দশেক মাত্র সময় পাবে। তার মধ্যে ফাইল-টাইল ঠিকঠাক করে নিতে হবে।  
 অ্যাজেন্ডা পয়েন্টস, মাস্থল রিপোর্ট। আজকে ঠেলাঠেলিটা বড় বেশি।  
 ওঃ ধন্য করে ছেড়ে দিলে। কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বললে  
 —‘দাদা’। বস্কিম গ্রাহ্য করল না। আবার—‘দাদা’। বস্কিম চোখ খুলে  
 বাঁ পাশে তাকাল। একটি অমায়িক মৃদু। ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন  
 —‘পোস্ট অফিস থেকে আন্ডারওয়্যারের দড়ি ডেলিভারি হয়ে সামনে পৌঁছু-  
 লামের মত ঝুলছে! বারকতক ভদ্রমহিলার নাকে টুসকি মেরেছে। গলার  
 টাইটার সঙ্গে ব্যালেন্স করেই কি নিচের এই ব্যবস্থা!’ বস্কিম সঙ্গে সঙ্গে  
 নিচের দিকে তাকাল, সর্বনাশ, আধহাতের মত পুরুষটু একটি শাড়ির পাড়  
 উগায় আবার একটা গেরো, প্যান্টের ফাঁক দিয়ে সামনে ড্যাং ড্যাং করে  
 দুলছে। বস্কিমের বিলম্বিত সেই ফ্রন্ট লাঙুলের সামনেই একটি সুন্দর  
 মৃদু ভদ্রটুদ্রু কঁচকে বসে আছেন। দড়ি একবার করে তাঁর দিকে যাচ্ছে  
 আর ছুঁই ছুঁই করে কখন ছুঁয়ে অথবা ছোঁবার ভয় দেখিয়ে বস্কিমের দ্রু-  
 পায়ের ফাঁকে মৃদু লুকিয়ে ফেলছে।

ভদ্রলোক বললেন, ‘ওটাকে অ্যারেস্ট করে সেফ কাস্টাডিতে চালান  
 করুন, তা হলে অভূতপূর্ব অশান্তির সম্ভাবনা।’

যে জায়গায় ঝোঝুল্যমান দড়িটাকে অদৃশ্য করাতে হবে, সে জায়গাটা  
 শরীরের একটা ভাইটাল এরিয়া হলেও সর্বসমক্ষে সেটি রেডলাইট এলাকা।  
 হঠাৎ আঙুল ঠেকানো যায় না। বিশেষত ভদ্রমহিলাদের সামনে। একটু  
 ঘুরে বা আড়াল করে যে ঢোকাবে, তারও উপায় নেই। ঘুরবে কি করে।  
 কুলফি মালাইয়ের মত সবাই খাপে সেট। ঠিক হয়। বস্কিম নিজেই  
 চোখ বন্ধলো। যে দেখে দেখুক, সে নিজে দেখতে রাজি নয়। সামনের  
 দিকে থাকের একটা বোতাম মিসিং। দড়িটা অবোধ শিশুর মত সেই ঝাঁকু

দিলে বেরিয়ে এসে সামনেই সুন্দরী মহিলা দেখে প্রভূভক্ত কুকুরের মত গদগদ আনন্দে ল্যাজ নাড়তে শুরু করেছে।

বাড়িতে প্যান্টটা যখন পরেছিল তখনও বোতামটা ছিল। বাসে ওঠার কসরতেই বোধহয় কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে। বীণকমের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল শ্রী প্রতিমার উপর। মানুষের একটা সামান্য কমনসেন্স থাকা উচিত। মেয়েমানুষ কি মানুষ নয়। কেউ আঁড়ারওয়্যারে অতবড় একটা চিহ্ন-বিচিহ্ন পাড় লাগায়। কয়েকদিন আগেও একটা মাপেরসই গোঞ্জর দাড়ি লাগান ছিল। রোজই সকালে কাচা আঁড়ারওয়্যার পরতে গিয়ে দেখা যেত দাড়ির যে কোন একটা মাথা ফোন্ডের মধ্যে ঢুকে পলাতক প্রাণীর মত বসে আছে। তাড়াতাড়ির সময় মহাবিবস্তি। রাঁধতে রাঁধতে প্রতিমাকে আসতে হত মাথার কাটা কিংবা বোনার কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনার জন্যে। উভয় পক্ষেরই অসুবিধে। বেরোবার সময় কেউই প্রকৃতিস্থ থাকে না। আঁফসের দিনের সকাল সাত সতেরো কামেলায় ভরা। তখন এইসব ছ্যাঁচড়ামি একেবারেই ভাল লাগে না সত্যি। কিন্তু তা বলে কেউ অতবড় একটা দাড়ি লাগায়। এ যেন রথের রশি।

বাস এগোচ্ছে, প্রতিমার সঙ্গে বীণকমের মনে মনে ঝগড়াও তত জমে উঠেছে। একবাস লোকের সামনে তুমি আমার প্রায় বিবস্ত্র করে ছেড়েছো। বিবস্ত্র নয়তো কি! এমন সুন্দর একটা গরম প্যান্টের তলাতেও যে একটা অন্তর্বাস থাকে, সেই অপ্রিয় সত্য, হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙার মত প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। দীর্ঘ ব্যবহারে সেই পরিধেয় লাল এবং সেটি কোমরের সঙ্গে বাঁধা শাড়ির পাড় দিয়ে। এ যেন দীনবন্ধুর মাথা কামানো অবস্থা। দীনবন্ধু ছিল তাদের পাড়ার অ্যাপোলো। সেই দীনবন্ধু প্রেমপত্র লিখেছিল তার মার বয়সী এক কুমারী মেয়েকে। পঞ্চায়েতী সাজা হয়েছিল, মাথা মর্দিয়ে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে রাস্তায় প্যারেড। তুমি আমার দীনবন্ধু করে ছেড়েছো।

যে মহিলার নাকের ডগায় বীণকমের দাড়ি পেন্সার করতে গিয়েছিল তিনি হঠাৎ উঠে পড়লেন। স্টপেজ এসে গুছে তাঁর। বীণকমকে এমনভাবে 'সরুন' বললেন, বীণকম যেন ছোঁয়াচে কোনো অসুখে ভুগছে। বীণকম জানে জ্বর-মহিলার গিয়ে প্রথম কাজই হবে নাকের ডগা ধোয়া। মেকআপ চটকে যাবে। বীণকমের উদ্দেশ্যে তখন আর একপ্রস্থ গালাগাল ছুটবে। সামনে জায়গাটা খালি হল। অন্যদিন হলে বীণকম বপ করে বসে পড়তো, আজ আর বসার



সাহস পেল না। সামনের বোতাম নেই। বসলেই লালচে আঁড়ারওয়্যার উঁকি দেবে স্লেট রঙের প্যান্টের জানালা দিয়ে। কেউ হয়তো লক্ষ্য করবে না কিন্তু বাঁকম এখন সচেতনতায় ভুগছে। ‘আপনি বসবেন না!’ বলে আর একজন বসে পড়লেন। বাঁকমবাবু দুলতে দুলতে, মনে মনে কাগড় করতে করতে ক্রমশই অফিসপাড়ার দিকে এগোতে লাগলেন।

অফিসে পৌঁছেই তার প্রথম সমস্যা হল উদার প্যান্টকে কি করে একটু অনুদার করা যায়। মোটা কুশন লাগানো ঘূর্ণায়মান চেয়ারে বসলেই অস্ত্র-বর্ষের চোরাচাহীন শব্দ হবে। স্টেনো মিস মিত্র অনবরতই পাশে এসে দাঁড়ান নানা কাজে। চোখে পড়বে। একটু পরেই ডিরেকটোরের ঘরে মিটিং। গোল কবে নিচু হাইটের সোফা পাতা। মধ্যে সেন্টার টেবিল। বসামাত্রই প্যান্টের ঠোঁট ফাঁক হয়ে যাবে। মহিলা পি-এরা এই স্ফূর্তিত অধরের জঘনা ব্যাখ্যা করে নিতে পারেন। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য স্ত্রী নিয়ে ঘর করলে মানুষকে এইভাবেই ভুগতে হবে। চেয়ারের পেছন থেকে তোয়ালে টেনে নিয়ে বাঁকম কোলের উপর রাখল। কাজ করতে হলে বসতেই হবে। বসতে হলে চাপা দিতেই হবে। বাঁকমের খেন ছেলে হয়েছে। কোলে শুইয়ে রেখেছে সযত্নে।

মিস মিত্র এলেন, একঝলক গন্ধ আর খুঁশি নিয়ে। বাঁকম আসন্ন মিটিং এর জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল। মিত্র হঠাৎ চোখ পড়ল কোলের তোয়ালের ওপর।

‘দিন স্যার তুলে রাখি।’

বাঁকম একটু বিব্রত হল। এতটা সজ্ঞান দৃষ্টি শুধুমাত্র যদি না দিতেন, প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট আটকাতো কি? বাঁকম বললে, ‘না থাক, হাত দুটো বড় ঘামচে, আমার একটু লিভার হয়েছে।’

মিস মিত্র ধনুক ভুরু করে বললেন, ‘খুব ভাল ওষুধ আছে আমার মার কাছে, একেবারে অব্যর্থ, কাল এনে দেবো।’

বাঁকম বললে, ‘থ্যাংক ইউ।’ মিত্র সুইং দরজা দু’লিয়ে চলে গেলেন।

একটা আলপিন লাগালে কেমন হয়? বাঁকম তেমন উৎসাহ পেল না, জ্বরগাটা বিশেষ সুবিধের নয়। কোনো ঝুঁকি নিলেই হাসপিটাল। পরিবেশনের সময় যেমন করে কোমরে তোয়ালে জড়ায়, সেইভাবে জড়িয়ে ডিরেকটোরের ঘরে যাওয়া যায় না! তোয়ালেটা যথাস্থানে ঝুলিয়ে রেখে বাঁকম বাথরুমে গেল। দরজাটা লক করে প্যান্টের কোমরের বোতাম খুলে ফেলল। হ্যাঁ দাঁড়ি বটে! দেখবার মত। লাউডগার মত লটপট করে ঝুলছে। দাঁড়ি

প্রান্ত দূটো ভাল বরে গুঁজে নিল কোমরে। দেখি এবার তুমি কোন ফাঁকে  
বেরোও। বড় অপদস্থ করেছো আজ। সাহেবী অহংকারের বেলুন পাখচার  
করে দিয়েছো। টাই ঠিক করে, চুলে চিরুনি বুলিয়ে বণ্ডিকম নিষ্কান্ত হল।  
রেডি ফর দি মিটিং।

কোলের উপর একটা ফাইল রেখে মিটিংরুমে বণ্ডিকম কাউকেই বন্ধুত্বে  
দিল না যে তার ভাইটাল জায়গায় একটা বোতাম নেই। সারাটা দিন অশান্তি  
নিয়ে কাটল। বাড়ি ফিরে যতক্ষণ না বৌকে ধাতাতে পারছে ততক্ষণ মনের  
কোষ্ঠ-কাঠিন্য কাটবে না। একসময় মনে হল প্রতিমার কি দোষ? বোতাম  
তো বাসে খুলে পড়ে গেছে! তাহলেও প্রতিমার তো উচিত ছিল একটু  
চেক করা। প্লেন আকাশে ওড়ার আগে গ্রাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারদের কি ডিউটি  
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখা। প্রতিমার গাফিলতিতেই তার এই বেল ল্যান্ডিং।

বাড়ি ফিরে বণ্ডিকমকে আর কলিং বেল বাজাতে হল না। সামনেই হাসি  
হাসি মুখে প্রতিমা দাঁড়িয়ে। বণ্ডিকম বলতে যাচ্ছিল শাট আপ রাসকেল।  
তারপর মনে হল, রাসকেল শব্দটার যথার্থ অর্থটা কি! এতকাল বলে  
আসছে, মানেটা জানা নেই। অক্সফোর্ড কিংবা চেম্বার্স খুলে আগে  
মানেটা দেখা দরকার। খামোখা দেড়টা টাকা খরচ হয়েছে আসার  
সময়। একটা বৃহৎ সাইজের সচিব ইংরেজী সাপ্তাহিক কিনে, সারাটা রান্ধা  
কোলে রাখতে হয়েছে। তাপি মেরে ছাদের ফুটো বন্ধ করার কান্দায়।  
পাশের ভদ্রলোক একবার দেখতে চেয়েছিলেন, বণ্ডিকম বলেছিল, এটা দেখার  
নয়, কোলে পেতে রাখার, আই অ্যাম সরি। ভদ্রলোক বলেছিলেন, ঠিক  
আছে পয়সা থাকে কিনে পড়ব, আপনার মত শিক্ষিত ছোটলোকের কাছে  
কখনো চাইব না। বণ্ডিকম বলেছিল, হুঁ। ভদ্রলোক কিন্তু ধামলেন না—  
আমিও বইপস্তর কিনি মশাই, গত মাসে ষাট টাকা দিয়ে গাঁতার ব্যাখ্যা  
কিনেছি, বিশ্বাস না হয় আমার বাড়িতে গিয়ে দেখে আসুন। বাস চলেছে  
ভদ্রলোকের আক্রমণও চলেছে অপ্রতীত—এই সব চিপ ম্যাগাজিন আমি  
পাড়ি না মশাই, একমাত্র বাসে আর ট্রামে এর-তার কাছে চেয়ে একটু পাতা  
ওলটাই। বণ্ডিকম বলেছিল—হুঁ। ভদ্রলোক ফোঁ করে নস্য টেনে বলেছিলেন,  
অত অহংকার ভাল না। ঠিক আছে আপনিই তা হলে পড়ুন। ম্যাগাজিন  
কেউ মধুরের মত কোলের শিশু করে রাখে না। এত করেও বণ্ডিকম যখন  
পাতা ওলটালো না, ভদ্রলোক হাল ছেড়ে বললেন, অক্ষর জ্ঞান হয়েছে তো।

শহরে ড্রেস দেখে মানুষ চেনা দায়।

রাসকেল শব্দটা উদ্ভূত ঢেংকুরের মত চেপে রেখে বীকম স্ত্রীকে বলল—  
‘তুমি কী? তোমার কোন কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই! খাচ্ছোদাচ্ছো আর ভাঁড়ি  
ফুঁলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার কি কোন কৰ্তব্যবোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ কিছুই  
নেই। এটা বাড়ি না জিমখানা।’ হোসপাইপে জল দেবার মত করে বীকম  
বিশোম্ভার করে প্রতিমাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। আকস্মিক আক্রমণে  
প্রতিমা অবাক। সে পেছন পেছন ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করল, ‘হল কি  
তোমার?’ বীকম ঘুরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণের ঢেকে রাখা জিনিসটা উন্মুক্ত  
করল—‘এটা কি। এটা?’ সমস্ত শরীরটাকে পেছনদিকে আর্চ করে, সামনের  
দিকটা প্রতিমার দিকে ঠেলে দিয়ে, প্যান্টের ফ্ল্যাপটা দেখালো। ‘জানো  
এক বাস লোকের মাঝে এই গৰ্ত দিয়ে কি বেরিয়েছে?’ প্রতিমার হাসি  
রোগ, একটুতেই হেসে ফেলে, কুং কুং শব্দ করে বলল, ‘কি বেরিয়েছে?  
সাপ!’ বীকম দক্ষযজ্ঞের মহাদেবের মত ঘরের কার্পেটে ধিতিং ধিতিং করে  
নেচে প্যান্টটা কোমরছ্যত করে, আন্ডারওয়্যারের পাড়ের টুকু একটা মাথা টেনে  
বের করে বলল, ‘এইটা, এইটা, কোন একটা সেন্স অফ ডিসেন্সি নেই। নিজের  
যেমন বেহুঁশ, অন্যকেও নিজের অগোছালো ধারায় আনতে চাও। নিজের  
ব্রেসিয়ালের স্ট্র্যাপ তো জীবনে স্লাউজের আড়ালে গেল না। বেল্লিক কাঁহাকা।’  
বীকম যেন একটু হালকা হল। বেশ বলেছে। প্রথম কিস্তি ভালই নান্নি-  
য়েছে। প্রতিমা এতক্ষণ ব্যাপারটাকে লঘু করে নিয়ে ছিল, বেল্লিক-টোল্লিক  
বলায় তারও রক্তের চাপ এইবার বেড়ে গেল—‘মুখ সামলে। বাড়িতে ঢুকেই  
কগড়া কোরো না বলে দিচ্ছি। কার সঙ্গে কী করতে গিয়ে বোতাম ছিঁড়ে  
এসে এখন বেঁড়ে শালাকে ধর। আমি কি হাত গুনবো না খাঁড়ি করবো।  
না বললে জানবো কি করে যে বাবুর বোতাম ছিঁড়েছে।’

‘জানতে হবে না।’ বীকম আন্ডারওয়্যার খুলতে খুলতে তিরিঙ্ক  
মেজাজে বলল, ‘তুমি তোমার ফর্স্টিন্টি নিয়ে থাকো, আমার ব্যাপারে নাক  
গলাতে হবে না। চা খাবো না যাও!’ প্রতিমা বুদ্ধো আঙুল দেখিয়ে  
বলল—‘খেতে হবে না। আমার ভারী বয়ে গেল।’ এদিকে দড়িতে মোক্ষম  
গিট পড়ে গেছে, কিছুতেই খুলতে পারছে না। প্রকৃতির ডাকও আর চেপে  
রাখা যাচ্ছে না! আলমারির মাথার উপর থেকে একটা থোলা ছুরি নিয়ে  
বীকম বললে—‘কেটেই ফেলবো, যন্মিন দেশে যদাচার।’ প্রতিমা হৈ হৈ

করে উঠল, ‘চালাকি পেয়েছো। পাড় অত সস্তা না। কাল সকালবেলা যখন হুকুম হবে পাড় পরিয়ে দাও, তখন আমি পাব কোথায়! আর আমার স্টকে নেই।’ বণিকম ছুরিটা ভুড়িতে ঢুকিয়ে কাটতে যাচ্ছে, প্রতিমা এসে হাত চেপে ধরল। ভুড়ি ফেসে যাবার ভয়ে বণিকম ছুরিটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। ‘না কাটলে খুলবো কি করে? এটা কি আমি ততদিন পরে বসে থাকবো যতদিন না গলে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। চালাকি পেয়েছো?’ প্রতিমা নির্বিকার মুখে বলল—‘আমি কি জানি! গিট পড়ে কেন?’ বণিকম বললে, ঠিক আছে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে খুলবো।’ মহা বেকায়দায় পড়েছে বণিকম, নিম্নচাপ আর ধরে রাখা যায় না। দেশলাই দিয়ে পোড়াবে কি! আগুন লেগে যাবার ভয় আছে। বাধ্য হয়েই বণিকম সূর পাল্টালো—‘খুলে দাও তাহলে!’ প্রতিমার ব্যঙ্গের হাসি—‘পথে এস বাছাখন!’ অ্যামিবিব লোকের স্বদ্রী় সঙ্গে সন্ভাব রেখেই চলা উচিত। গেরোট খুলে দিতেই বণিকম চেন ছাড়া কুকুরের মত অন্তর্বাস মৃক্ত হয়ে, সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

রাত দশটা নাগাদ বণিকম আবিষ্কার করল, তার নিল’জ্জ স্বদ্রী় প্যাণ্টের বোতাম বসাবার কোনো চেষ্টাই করে নি। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে মৌজ করে উপন্যাস পড়ছে। বণিকম বললে, ‘উচিত ছিল।’ প্রতিমা বইয়ের মধ্যে থেকেই বললে—‘হুঁ।’ বণিকম আর এক পর্দা গলা চড়াল—‘উচিত ছিল।’ আবার প্রতিমার—‘হুঁ। এইবার বণিকমের ফেটে পড়ার সময়—‘উচিত ছিল ওই রাঁবশ বই না পড়ে, বোতামটা বসানো, কাল সকালেই তো পরে বেরোতে হবে।’ প্রতিমার সেই এক উত্তর—‘হুঁ। বণিকম ঝড়ের বেগে বইটা কেড়ে নিয়ে রকেট করে ঘরের সিলিংয়ের দিকে উড়িয়ে দিল। পাখাভাঙা জটায়ুর মত বইটা পাতাটাতা মৃড়ে ঘরের এককোণে পড়ল। বণিকমের চেপে রাখা রাসকেলটা এতক্ষণে বেরোলো—‘রাসকেল, রাসকেলিয়ান বাগার। যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙো দাঁতের গোড়া। তাই না?’ প্রতিমা মেঝে থেকে বইটা কুড়োতে কুড়োতে বললে—‘তুমি ডবল রাসকেল?’ বণিকমের খুব ইচ্ছে করছিল নিটোল নিতম্বে একটি পদাঘাত করে। মনের ইচ্ছে মনে চেপে বণিকম বোয়ের ঘাড় ধরে বলল—‘আগে বোতাম বসাবে পরে অন্য কাজ।’ প্রতিমা বললে, ‘তোমার মত ছোটলোকের প্যাণ্টে আমার হাত ঠেকাতে ঘেম্মা করে।’ বণিকম বোকে ছেড়ে দিল। এত বড় কথা যে বলতে পারে তার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক! বালির চরে

ঘর বেঁধেছে। সংসারে কে কার! এসেছি একলা, যাবোও একলা ম্যান। প্রতিমা বিছানায় মদ্য গুঁজে শুয়ে পড়ল। বীক্ষম বসল প্যাণ্টে বোতাম বসাতে।

চোখের কি আর সেই জ্যোতি আছে। ছুঁচের ফুটো তাক করে সূতো চালায়, একটুর জন্যে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথম ছুঁচের দিকে সূতো, পরে সূতোর দিকে ছুঁচ, কোনো ভাবেই কায়দা করতে পারলো না। একে রেগে আছে। রাতের খাওয়া ভকে উঠেছে। প্রতিমার অভিমান সে জানে। নিম্নচাপের বৃষ্টির মত মিনিমাম তিন দিন। তার উপর ছুঁচের এই ছলনা। একটা চাপা গর্জন শোনা গেল—‘শালা, তোর আঁড়দেঁন, পাঁড়দেঁন। ছুঁচ আর মেয়েমানুষ একজাত। ছলনাময়ী।’ বীক্ষম ছুঁচটাকে মেঝেতে রেখে, দৃ’ হাত জোড় করে বলল—‘পায়ে ধরিছি মাইরি, আর বেইজ্ঞত কর না।’

ছুঁচের বোধ হয় দয়া হল। হঠাৎ সূতোটা ঢুকে গেল ছুঁচের গর্তে। বোতামও একটা জোগাড় হয়েছে। রঙে প্রায় রঙ মেলে। আগের বোতামটা যাবার সময় একটু ফেঁসো সূতোর স্মৃতি রেখে গেছে। বীক্ষম বোতামটাকে দাগে দাগ মিলিয়ে বসালো। এইবার তলা থেকে ছুঁচ গলিয়ে প্যাণ্টের ওঁপিঠ থেকে এঁপিঠে আসতে হবে, বোতামের চারটে গর্তের যে কোনো একটা ভেদ করে। তলা থেকে ছুঁচের মাথা গলিয়ে গলিয়ে সূতোর পথ করে দেবার প্রয়াস। কেবলই ঠেকে যাচ্ছে। ছিদ্র ছলনাময়ী। প্যাট, প্যাট। কার্ডিগ্নোগ্রাফের ছুঁচের মত বোতামের উল্টো পিঠে ছুঁচের লাফালাফি। করতে করতে ফাঁস করে ছুঁচটা বোরিয়ে এল। শালা, কালঘাম ছুঁটে গেল। সূতোটা টেনে ওপরের দিকে তুলতে লাগল বীক্ষম। এরপর কোণাকুণি একটা ফুটোয় ঢুকতে হবে ওপর থেকে নীচে, তারপর আবার নীচে থেকে হাতড়ে হাতড়ে ওপরে। এইভাবে চারটে ফুটো। যাঃ শালা, সমস্ত সূতোটাই বোরিয়ে চলে এল, বোতামটা কোল বেয়ে, প্যাণ্ট বেয়ে গাড়িয়ে খাটের তলায় চলে গেল। ওঃ হরি। সূতোয় যে গিট দিতে হয়, তা না হলে আটকাবে কিসে! ধূর বাপু।

বোতাম খুঁজতে বীক্ষম হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকলো। লো হাইটের খাট। একে অন্ধকার অন্ধকার জায়গা, তার ওপর কালো বোতাম। অত সহজে পাওয়া যাবে! বীক্ষম দেখেছে, পরসা, বোতাম, আঁটির পাথর, কানের দুল পড়ে গেলেই ফোর্থ ডাইমেনসানে চলে যায়। অন্তত মিনিট পাঁচেক ইণ্ডি ইণ্ডি করে ৪২ বর্গফুট জায়গা অনুসন্ধানের পর বোতামটা তার হাতে এল। বোরিয়ে আসার সময় হিসাবের ভুলের ফলে খাটে মাথা ঠুকে গেল।

ছুট্টা আবার কোথায় গেল? বঁকিমের ল্যাজে-গোবরে অবস্থা। বোতাম পেল তো ছুঁচ হারালো। ছুঁচের ধর্মই হল হারিয়ে যাওয়া। বুকোঁছি, তুমি শালা পাছায় না ফুটে উঠবে না। থ্যাপ থ্যাপ করে বার কতক এখানে-ওখানে বসল। ছুঁচ শেষে বেরোলো প্যাণ্টের ফোন্ড থেকে। স্নাতোর ল্যাজে বেশ জুত-সই করে একটা গিঁট দিল। আবার শূরু হল, তলা থেকে ছুঁচের বোতামের ফুটো খোঁজার পালা। সমস্তটাই চাম্বের খেলা, আর বঁকিম ভাবতেও পারে নি যে এবার এক চাম্বেরই লক্ষ্যভেদ হবে। বঁকিম সাবধান হবার সময়ই পেল না। ফাঁস করে ছুঁচ বঁধে গেল আঙুলের মাথায়। প্যাণ্ট, ছুঁচ, স্নাতো, বোতাম, একটান মেরে তালগোল পাকিয়ে পাঠিয়ে দিল খাটের তলায়।

রঙের বিন্দু আঙুলের মাথায়। রঙটা মন্থ দিয়ে শূষে নিল। নোনতা। আবার এক বিন্দু। বুকোঁছি ভগবান, বোয়ের কারসাজিতে অভুক্ত তাই রঙের ডিনার। সব কাজ সকলকে দিয়ে হয় না। দু'পাতা নোট লিখতে পার, ডবল এন্ট্রি বুককপিং পার, তাবলে কি সেলাইফোঁড়াই পারবে! ওটা মেয়েদের ব্যাপার। পারবে! মনে নেই শৈশবে একবার ইন্টার গতে আঙুল ঢুকিয়ে বিছের কামড় খেয়েছিলে। যাও শূষে পড়, কাল সকালে দেখা যাবে।

বঁকিম শূষে শূষে আঙুল চুষতে চুষতে ঘুমিয়ে পড়ল। খাটের তলায় মন্থ গুঁজড়ে পড়ে রইল বঁকিমের সাধের গরম প্যাণ্ট, একটা আলগা বোতাম, স্নাতো পরানো একটা পার্টি ছুঁচ। মাঝরাতে হালকা পায়ের কোনো সহৃদয় পরী এসে বঁকিমের বোতামটা বঁসিয়ে দিয়ে যায় কিনা দেখা যাক! রাতউপোসী বঁকিমের মন্থে ছুঁচ ফোঁটা আঙুলের ললিপপ। অনেক রাতে প্রতিমার একবার ঘুম ভেঙেছিল। ঘরের চাপা আলোয় আঙুল চোষা ঘুমন্ত বঁকিমকে দেখে, মনে মনে বলল—আহা রে. কোলের শোকা আমার, প্যাণ্টের আর দরকার কি! এবার ঘুনিসি বেঁধে কপনি পরলেই হয়। হাড় বস্জাত! বিয়ের পর থেকে জ্বালাচ্ছে। সারাটা জীবন জ্বালাবে। 'হাড় জ্বালানে' বলে প্রতিমা পাশ ফিরে ঘুমের টানেল দিয়ে নাকের ইঞ্জিন চালিয়ে দিল ভোরের স্টেশনের দিকে।



জোর আলোটা কমিয়ে  
দাও। যে সুইচের মুখটা  
নিচু ছিল হীরেন ফট  
করে সেটাকে দাঁড় করে  
উঁচু করে দিতেই সারা  
ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।  
বেশ স্লিথ অন্ধকার! এই  
ঘরের ফ্লোরেসেন্ট আলোর  
স্টার্টারটা সব সময় চিন্  
করে কিংকি পোকাকার মত  
একটানা শব্দ করে। বহু  
ইলেকট্রিসিয়ান এসেছেন  
নানা চেষ্টা হয়েছে। অসুখ  
দুরারোগ্য সারে নি।  
হীরেনের বাবা বীরেনের  
শব্দটা সহ্য হয়ে গেছে।  
আসলে তাঁর বয়স যত  
বাড়ছে শ্রবণশক্তিও সেই

অনুপাতে কমছে। যে কোন কথা এখন দূবার না বললে শুনতে পান  
না। প্রথমবার স্বাভাবিক গলায়, দ্বিতীয়বার জোরে। ঘরটা শুধু অন্ধকার  
হল না, শান্ত স্তব্ধ হল। বাইরের কিছু শব্দটুকুও শোনা যেতে লাগল।  
অধীরবাবুর আইবুড়ো ছেলে বেহালা শিখছে। তিন মাস নাগাড়ে চেষ্টা করেও  
সেই একই চেরা সুর। চড়া পর্দায় উঠে সুর যেন বলছে—ছেড়ে দে মাইরি  
এটা তোমার সাবজেক্ট নয়। বিয়ে করে পাড়ার লোককে শাস্তি দে। ব্যাচেলার-  
এর অনেক জ্বালা।

বীরেনবাবু জানলার ধারে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আরাম-চোয়া বসে।

দুঃখ খাচ্ছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন—আলোটা নেভালে কেন ?

—আপনি তো নেভাতেই বললেন।

—নো স্যার আমি বলোঁছি কমাতে। তোমার চরিত্রের একটা মেন ডিফেক্ট : কি জ্ঞান, কে কি বলছে পুরোটা কেয়ারফুল শুনতে চাও না। ছাত্রজীবনেও এই এক দোষের জন্যে কখনই তুমি ডিজার্ডার্ড রেজাল্ট পাওনি।

—আমি শুনছি আপনি কমাতে বলেছেন, তবে এ আলো তো সেজ কিংবা হারিকেন নয় যে কমবে, তাই নিভিয়ে দিয়েছি।

অন্ধকারে দুঃখে চুমুক দেবার সামান্য শব্দ হল। বীরেনবাবু অঙ্গ একটু ফেসে বললেন, ওটাও তোমার চরিত্রের আর একটা মস্ত দোষ, আগে থেকেই সব কিছু ধরে নাও। চলতি ধারণার বাইরে যেতে যেও না। ইনোভেশান বলে ইংরেজীতে একটা কথা আছে, শুনছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে জেনে রাখ এ আলোও কমাতে জানলে কমে। আলোটা জ্বালো আবার। হীরেন অন্ধকারে বেশ কয়েকবার ঠুসঠাস শব্দ করার পর আলোটা তিড়িং বিড়িং করে জ্বলে উঠল। আলোটার নিচেই বসে আছেন বীরেন। একটা হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে বললেন—

এইবার পাথর রেগুলেটরটা দেখতে পাচ্ছ ? ওটাকে ঘূরিয়ে তিনে নিয়ে এস। দুই নয়, তিন। দুইতে নিয়ে এলে আর জ্বলবেই না।

হীরেন রেগুলেটরটাকে তিনে আনতেই চার ফুট টিউবলাইটটা অস্বচ্ছ একটা মার্বেলের ডাণ্ডার মত হয়ে গেল। কায়দাটা মন্দ নয় তো! বেশ একটা চাপা চাঁদের আলো গোছের ব্যাপার। বীরেনের ঘরে পাখাও ছিল, রেগুলেটরও ছিল। সাবেক আমলের ছাপান্ন ইঞ্চি পাখা। ঢাকিস ঢাকিস করে ঘুরত। জগৎবাবু এসে বললেন—করেছেন কি? যৌবনে কারুর কথা কানে নিলেন না, লাখখানেক হাঁসের ডিম খেয়ে বাত ডেকে আনলেন, এখন আবার পাথর হাওয়া দিয়ে সেই বাতের ডিমে তা মারছেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারদিকে এত বড় বড় ডবল জানলা, টোরেন্টফোর আওয়ার্স বড় বইছে, ন্যাচারাল হাওয়া, সানসাইন, ভিটামিন, প্রমগ, ফ্রুট বোর্ডিং, সাইড বোর্ডিং এইসব চালান। নেচারোপ্যাথি ইজ দি বেস্ট প্যাথি। সকালে উঠে দুঃখেরা রসুন কচরমচর, কচরমচর। দৈবদুঃখ জলে নুন ফেলে চান। আর মনটাকে করে রাখুন পাখির মত, সারাদিন চিরাপ, চিরাপ।



জগৎবাবুর পরামর্শে পাখা হয়ত বিদায় হত না। পাখাটা নিজে নিজেই চলে গেল। শব্দটাই রইল। তখন পাখা গেল অয়েলিং হতে। একেবারে অগন্ত্য যাত্রা। ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। ইতিমধ্যে বীরেনবাবু রেগু লোটোরটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলেছেন।

বীরেন ছেলেকে বললেন—এইবার চেয়ারটা টেনে এনে একটু কাছাকাছি বস। খুব সিরিয়াস কথা আছে। ভীরি সিরিয়াস। দেয়ালের দিকে হাতলহীন সাবেক কালের একটা চেয়ার ছিল, বীরেন স্থির দৃষ্টিতে ছেলে হীরেনকে একবার দেখলেন। হীরেন একটু ভয় পেয়ে গেল—কিছু হল?

—হল বৈকি। চেয়ার সরিয়ে আনারও একটা নিয়ম আছে হে। তুমি যেভাবে চেয়ারটা টেনে নিয়ে এলে ওটা হল অন্যরপক্ৰান্তি। হিড়িহিড়ি, হিড়িহিড়ি। সারা পাড়ার লোক জানতে পারল হীরেনবাবু চেয়ারে বসছেন। আমি হলে কি করতুম জান, চেয়ারটাকে সশরীরে তুলে কোন শব্দ না করে এখানে নিয়ে আসতুম। যাক, ম্যান লিভিস টু লান। যতদিন বাঁচব ততদিনই কিছু না কিছু শিখব।

বীরেন হাসলেন। বিদ্রূপের হাসি। হীরেন চেয়ারে ভয়ে ভয়ে বসল। হয় মেবেটা অসমান ছিল না হয় চেয়ারের পায়ায় কিছু গোলমাল ছিল, বসতেই চেয়ারটা খটখট করে দুলে উঠল। হীরেন সাবধান হতে গিয়ে আবার একবার শব্দ হল।—আমি করিনি, একটু নাড়াচড়া করলে আপনিই ওই রকম করছে। আমি বরং নিচে নেমে বসি।

—অন্য কোন উপায় ভাবতে পারলে না। নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। চেয়ারটা একটু সরিয়ে দ্যাখ তো কি হয়! হীরেন চেয়ারটা দু হাতে তুলে সাবধানে একটু সরাল, যেন কাঁচের চেয়ার, তেমনি ভারি। বসে একটু নড়েচড়ে দেখল।

—একটু বেড়ে গেল মনে হচ্ছে?

—আবার একটু সরাব।

হীরেন আগের কায়দায় চেয়ারটাকে আবার একটু সরিয়ে বসল। আবার সেই টকাটক। বলতেও সাহস হচ্ছে না। তা না হলে বলত, এটা বোধ হয় রকিং চেয়ার। তার বদলে করুণ মুখে বলল—আমার পিছনে বোধ হয় কোনও ডিফেক্ট আছে। অনেকের থাকে না। প্যাণ্টের মাপ দিতে গিয়ে দেখছি তো বাঁ দিকের চেয়ে ডান দিকের পাছাটা ভারি। আমি বরং বাঁ দিকে কিছু শ্বরের কাগজ গুঁজে বসি।

বীরেন অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। একটু শান দেওয়া হাসি-  
হেসে বললেন—‘রিসার্চ’ করে দেখার মত ব্রেন হে তোমার। নিচু হয়ে চেয়ারের  
পায়া চারটে একটু চেক করত ! দেয়ার মাস্ট বি সামথিং।

হীরেন উবু হয়ে বসে চেয়ারের পায়া পরীক্ষা করছে। কোন কারুকার্য  
নেই। চোঁকো, চোঁকো গোদা গোদা পায়া। বহুকাল পালিশ টালিশ পড়েনি।  
কালচে ছ্যাতলা রঙ। একটা পায়ায় ছোট মত একটা ফুটো হয়েছে।

—একটা ফুটো হয়েছে। হীরেন বীরেনকে খবরটা জানিয়ে দিল।

শেষ চুমুকে দুধের গেলাসটা খালি করে জানলার গবরেটে রাখতে  
রাখতে বীরেন লাফিয়ে উঠলেন—আই সি ! তাই বলি সারা রাত কি একটা  
কটর কটর বরে। ঘুণ পোকা। কই দেখি, দেখতে পাব কিনা জানি না।  
যাও আলোটা বাড়ো। ফুল করে দাও। বীরেন মেঝের ওপর হুঁমড়ি  
থেশে বসলেন। হীরেন আলোটা জোর করে দিল।

বাঃ, বাঃ। বীরেন তারিফ করলেন। হীরেন ভেবেছিল তিনি বোধ হয়  
তার আলো জোর করার ভূমিকাকে তারিফ করলেন। তা নয়, বেশ পছন্দসই  
ফুটো হয়েছে—দেখি একটা কাঠি নিয়ে এস ত।

—দেশনাই কাঠি ?

—এনি কাঠি। ওই তো বাইরের বারান্দায় চলে যাও ঝাটাকাঠি পাবে।  
ছাড়িয়ে ছত্রাকার। ও আমি পারলুম না।

—কি পারলেন না ?

—ওই একটা জায়গায় আমি ডিফিটেড। ডগেড টেনাসিটি ? একটা  
জাত বটে। যা ধরবে তা ছাড়বে না। কাদের কথা বলছেন বন্ধুতে না পেরে  
হীরেন দরজার কাছ থেকে প্রশ্ন করলেন—কাদের কথা বলছেন, ইংরেজদের ?  
জার্মানদের ? পূর্ববঙ্গীদের ? সেনগুপ্তদের ?

—আরে না না, কাক, কাক, কাকের কথা বলছি।

একটা খ্যাংরা নিয়ে বছরের এই সময়টায় কাকে আর বীরেনে খুব টানাহেঁচড়া  
চলে। সারা বারান্দায় কাঠি ছাড়িয়ে আছে। বীরেন বলছেন—এই সময়টা  
ওদের মেটিং সিজন। বাসা বাঁধার সময়। রোজ একবার করে ঝাটাটা বাঁধছি,  
রোজ খুলে ফেলে দিচ্ছে। কি ভীষণ শক্তি, কাঠের গোঁজ দিয়ে তার দিয়ে বাঁধা,  
ঠোট দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একে কি বলে জান, স্ট্যামিনা। মানুষের  
বুদ্ধি আর কাকের স্ট্যামিনা বাঙালীদের মধ্যে যদি এক...

—এনেছো ? দেখি দাও । আর একটু মোটা পেলো না ?

—আনব ? অন্ধকার ত, আন্দাজে এনেছি ।

—থাক, আমি কেবল দেখব গর্তটা কতটা অবধি নেমেছে ।

হাঁটুর ওপর দৃ হাত রেখে সামনে ঝুঁকে হীরেন দেখছে । বীরেন চেষ্টা করছেন লিকলিকে কাঠিটা গর্তের মৃৎ দিয়ে ভেতরে ঢোকাবার । হীরেন বললে—  
বেড়ে হয়েছে, আগ্নেয়গিরির মৃৎখের মত । দাঁতের বেশ জোর ।

ইণ্ডি ছয়েক লম্বা কাঠি সবটাই প্রায় ঢুকে গেল । বীরেন বললেন - দেখ মজা, সাতদিনে প্রগ্রেসটা একবার দেখ । তোমার মনে আছে, আমাদের সেই পাতকো খোঁড়া । খুঁড়ছে ত খুঁড়ছেই, ফুকফুক বিড়ি খাচ্ছে, গল্প চলছে, দৃ ঘণ্টার কাজ আট ঘণ্টায় তুলে, কানটি মলে দৃশ্য টাকা নিয়ে গেল । বিশটা ঘণ্টা পোকা ছেড়ে দাও, ম্যাটার অফ সেকেন্ডস । থাক এ আর কিছ্ করা যাবে না । ফিনিশড । কাঠের গুড়ো বেরোচ্ছে দেখছো । ট্যালকাম পাউডারকে হার মানায় । মানুষ করে বিজ্ঞানের বড়াই, হ্যাঃ । টু হাণ্ডেড মেশের ফাইন ডাস্ট বের করে ছেড়ে দিলে 'সামান্য একটা পোকা' ।

—বুঝেছি !

—কি বুঝেছো ?

—ওই পাল্লাটা একটু ছোট হয়ে গেছে বলেই চেয়ারটা ঢকঢক করছে । ধরুন প্রায় ছ ইঞ্চি মত খেয়ে ফেলেছে ত !

—এটা তুমি সিরিয়াসলি বললে, না বৃড়োর সঙ্গে ইয়ারকি করলে !

হীরেন ঘাবড়ে গেল—আজ্ঞে ইয়ারকি করব কেন ! আমার মনে হল তাই...

—জেনেটিকস বোঝো ?

—সামান্য ।

• —ওই প্রবাদটাও নিশ্চয় শুনেনি—বাপকো বেটা—

হীরেন পরম উৎসাহে বলল—সিপাহীকো ধোড়া কুছ নোঁহি হ্যায় তো ধোড়া ধোড়া । বীরেন হাত তুলে হীরেনের উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে বললেন—  
আমার ছেলে তুমি, আমার পুরোটা না হলেও ধোড়া ধোড়া তোমার পাওয়া উচিত ছিল, একমাত্র লিভারের ট্রাবল ছাড়া আর কিছ্ পেলো না । এইবার এস তোমার ছেলেতে, তোমার ধোড়া ধোড়া তার পাওয়া উচিত ছিল, তা ধোড়া কেন সেন্ট পায়সেন্ট তো পেয়েইছে আরও অ্যাডভান্সাল এই নাও ।

একটা পায়ার তলা থেকে পাতলা চোকো মত এফটা ইংরেজার বের করে

বীরেন হীরেনের হাতে দিলেন—ঢকঢকের কারণটা বদলে ? নাও এবার বস ।  
বীরেন নিজের জায়গায় বসে আগের কথার খেই ধরলেন—

—ঘড়ি পেয়েছে, লাটু পেয়েছে, বল পেয়েছে, ইয়ার পেয়েছে, ইয়ারকি পেয়েছে, অংকের বোদা মাথা পেয়েছে, হাতে কাঁচা পরসা পেয়েছে, আলস্য পেয়েছে, কথায় কথায় মিথ্যে কথা পেয়েছে, অমনোযোগিতা পেয়েছে, ফাঁকি-বাজী পেয়েছে । এখন বল তুমি একে কি করবে, কি করে সামলাবে ! বসে বসে চোখের সামনে এই গোল্লায় যাওয়া আমার পক্ষে দেখা সম্ভব নয় । তোমার পাঁঠা তুমি সামলাও । আমার ওপর আর ফেলে রেখ না । এরপর তোমরা বলবে বড়োটাই দাযী । এই নাও নিজেই দেখ ।

বীরেনে হীরেনের দিকে নীল মত একখণ্ড মোটা কাগজ এগিয়ে দিলেন । ষাণ্মাসিক পরীক্ষার ফল । শ্রীমৎগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ষষ্ঠ শ্রেণী । রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় । ইংরেজী ২৩, বাংলা ৩৩, অংক ১৭ । মন্তব্য ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রেখে এই শোচনীয় অবস্থা সামলাবার চেষ্টা করুন নচেৎ...প্রধান শিক্ষক । রেজাল্টটা দেবার আগে বীরেন হীরেনকে অ্যাসসা পাম্প করেছেন, হীরেনের মনে হচ্ছে সেই-ই ছাত্র । নিজের রেজাল্টটা হাতে ধরে মুখ চুন করে বসে আছে ।

—কি বদলে ?

—আজ্ঞে মিজারেবল ।

—শুধু মিজারেবল নয়, ভেরি, ভেরি, ভেরি মিজারেবল । ক্লাস সিঙ্ক যদি এই হয় আর একটু ওপর দিকে উঠলে কি হবে বদ্বতে পার !

—আর উঠবে কি করে । আমার ত মনে হচ্ছে ও একই জায়গায় থেকে যাবে ।

—রাইট ইউ আর ! জীবনে তোমার এই একটা অ্যাসেসমেন্ট কারেন্ট হবে । হেডমাস্টার মশাইয়ের কমেন্টসটা পড়েছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ পারসেনিয়াল ক্লেয়ার ।

—ক্লেয়ার অফ দাদু করে রাখলে চলবে না । নিজেকে দেখতে হবে । তুমি কি কর !

—আজ্ঞে চাকরী করি ।

—হ্যাঁ চাকরী কর, সে আমি জানি । এমন চাকরী সংসার চলে না ।

ছেলেটাকে একটা ভাল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দিতে পারলে না ! ওকে নিয়ে  
নিয়ে কখনও বস, না সে সবেৰ বালাই নেই ।

—কেন, সকালে ঘণ্টাখানেক বসি !

—সেটা কখন ?

—ওই তো সকালবেলা বাজার থেকে এসেই বসে যাই ।

—তুমি ত ঘুম থেকেই ওঠ সকাল সাতটায় । অফিসে বেরোও নটায়, এর  
মধ্যে তোমার ঘণ্টাখানেক আসছে কোথা থেকে । সকালে তোমার তেল-  
মাখাই ত ঘণ্টাখানেক, তারপর চান আর সাবান, সাবান আর চান । তারপর  
তোমার চুল, চুলের কৈয়ারী !

—আপনিই ত বলেছিলেন, বাঙালীর শরীর তেলে আর জলে । এখন  
তেলের নেশা ধরে গেছে । আর চুল ? আপনি বলেছিলেন ছেলে বড়  
হচ্ছে হীর, তোমার ওই রমণীমোহন কেশদাম একটু ছোট করে ফেল, তা এই  
দেখুন ।

হীরেন সামনের একটা চুল টেনে কপাল অবধি নিয়ে এল—আগে ছিল  
দাড়ি পৰ্যন্ত, এই দেখুন উঠে এসেছে কপাল পৰ্যন্ত, যে চুল কাটাছিল সে  
পৰ্যন্ত হাস হাস করে উঠেছিল । আপনি বলছেন—আপনি আচারি ধর্ম ।  
প্যাণ্টের পায়ের দিকের ঘেঁষ কাটিয়ে ছোট করে নিয়েছি ।

বীরেন বললেন—তা হলে এটা কি ? হোয়াট ইজ দিস ।

চেরারের পাশ থেকে এক প্যাকেট তাস নিয়ে ছেলের কোলে ছুঁড়ে দিলেন ।  
প্যাকেটের ওপর অর্ধউলঙ্গ মেম সাহেবের ছবি । হীরেন লজ্জায় চোখ বন্ধ করে  
ফেলোঁছিল । অবাক কাণ্ড । তাসের প্যাকেটটা কি করে বীরেনের হাতে এসে  
পড়ল ? এটা ত তার বোয়ের সম্পত্তি । এরকম কাছাকাঁচা খোলা মহিলার সঙ্গে  
ঘর সংসার করা যায় !

তাস নিয়ে এস, তাস নিয়ে এস, মাঝে মাঝে এক আখ চাল খেলা যাবে !

ভাল, পালিশ করা তাস চাই মহারাণীর । ন্যাতা ন্যাতা এনো না  
মাইরি । সোহাগের সময় অপর্ণার মূখে তুমি মাইরি শুনবে, শালা শুনবে ।  
গায়ের ওপর ঢলে পড়া দেখবে । দহাত তুলে খোঁপা ঠিক করা দেখবে ।  
হীরেন এখনও ভেবে পায় না তার ব্রীফকেস থেকে থ্রি নাইটস কনট্রোসেপটিভের  
খালি কোটো কি করে বীরেনের জোয়ানের কোটো হয়ে গিয়েছিল ! বীরেন একটু  
করে জোয়ান খেতেন আর হীরেন ভরে সিঁটিয়ে থাকত । যদি একবার পড়ে

ফেলতেন—সেলফ লুসিকোর্টিং...। নেহাত ঘোড়ার ছবিটা আড়াল করে রেখেছে কথাগুলো! সেই কৌটো ফের চুরি করে সারিয়ে নিতে হীরেনের ছান কয়লা হয়ে গেছে।

বীরেন বলছেন—ঠিক এইরকম জিনিস কোথায় থাকে ছান—বেশ্যালয়ে, জুয়ার আড্ডায়। ভদ্রবাড়িতে এসব থাকে না। তুমি আমাকে কখনো তাস খেলতে দেখেছ?

হীরেন ভয়ে ভয়ে বলল—না স্যার। স্যার শব্দটা বলেই বুকতে পারল নিশ্চয় ভুল এটা অফিস নয়, কলেজ নয়, বসে আছে নিশ্চয় বাবার সামনে। উত্তরটা শ্বিতীয়বার ঠিক করে বলল—আজ্ঞে না।

—তোমার মনে আছে নিশ্চয় তুমি যখন ফাস্ট ক্লাসে পড় তখন তোমাকে তাপে ধরেছিল। কিছু বখাছেলে জুড়টিয়ে খুব চলত সারাদিন। পালের গোদা ছিল সত্যি বোনের ছেলে। সত্যি ছিল মদের দোকানের ম্যানেজার। ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠা, চরিত্র, আদর্শ এসব গুলটারে ইনসলদ্যবল হলো ডিজলভস ইন এনকোহল। সেই সত্য মদ কোম্পানীর তাস দিয়ে নিজের ছেলের মাথাটি খেয়ে আমার নোবেল মাথাটি খাবার তালে ছিল। কিন্তু

কিন্তু তুমি যখন তাসে সত্যকে ছাড়িয়ে গেলে। সেই তাস শব্দ দিয়ে এল না, যে পকেট তাকাও উলঙ্গিনী—বীরেন হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন—কে মা তুমি উলঙ্গিনী, হাসিখিঁচি খেলিছ আপন মনে সুন্দর গৃহ সন্ধান করে।

বীরেন দেখলে একটা কিছু উত্তর দিতেই...। তিনি অন্য অপরায়িত নীরবে মেনে নেওয়া হ্যাঁ—আজ্ঞে তুমিটা বিস্মিত হান। আমার এক বন্ধু প্রজেক্ট বসেছিল। তাস চ আমি খেলি না। ওই মাঝেদাঝে। একটু পোসেনস...। আপনি বলেছিলেন না পোসেনসে, পোসেনসে বাড়ে, এতগুণত আসে।

- তাহলে এটা কি?

হীরেনের কোলে রঙীন একটা ফিফথ ম্যাগাজিন এসে পড়ল। এলাটে জাজিয়া পরা এক মহিলা বুকটুক বের করে, ঠাণ্ডা টুকু করে কি যে সব বরছে, যোগাসন-টোগাসন হতে পারে। হীরেন বইটা তাড়াতাড়ি উপড়ে বের ফেলল। মেয়েটা বীরেনের দিকে হীরেনের কোলে পড়ে পড়ে পা-টা ছুঁড়াছিল। এটা কি করে বীরেনের হাতে এল! বইটা তো নিচের ঘরে তার বিছানার তলায়

ছিল। ভেতরে আরও সব সাংঘাতিক সাংঘাতিক ছবি আছে। শোবার আগে একটু দেখলে টেবলে মন্দ লাগে না, ঘুমটা বেশ জমে ভাল। বইটা কি ভাবে ওপরে এল। ইচ্ছে করছে নিচে নেমে গিয়ে সেই ইভিরেট মহিলাটির গালে ঠাস ঠাস করে...

বীরেন বললেন—এটাও নিশ্চয় এরাবমলে বিলেতে থেকে এসেছে! চাপা দিলে কেনা? মলাটটা ওলটাও। গোঁফটা কি তোনার আঁকা?

—গোঁফ।

—ইয়েস গোঁফ। লজ্জা ফিসের? সোজা কর। সোজা কর না।

হীরেন ম্যাগার্টিনটা বাধ্য হয়ে সোজা কবল। অন্য সময় হলে এই এক মলাটেই সে কাঁচ হয়ে যেত। অপর্ণাও সঙ্গে সেনস অনেক রকম হৃদয়বিদারক ব্যাপার-সাপার করার জন্যে আত্মপ্ৰদুব ঝাঁকুণী ফেঁট। এখন সে শূন্য ভোঁদার মত তাকিয়ে রইল। মহিলাব ঠাট নব কাঁচকের মত ফাইন গোঁফ গাঁজিয়েছে, নীল রঙের গোঁফ।

—মেয়েছেলেটি কে?

—আজ্ঞে ফরিয়াল।

—হরিয়াল? তা এনার পেশা কি?

—ফিল্ম স্টার, বম্বের ফিল্ম স্টার।

—বেশ বেশ তোমার নিজস্ব সংসার বেশ জমে উঠেছে কি বল? এ ভাবে চলবে না বাপু। আজ সারা দুপুর তোমার ছেলে এই দুটো জিনিস নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় গোঁফ দাড়ি বসিয়েছে। দু একটাকে একটু জামা কাপড় পরাবারও চেষ্টা করেছে। ন্যুড়িটি খারাপ জিনিস নয় তবে কি জ্ঞান, আমরা ত সাবেক কালের মানুষ, মা কালী অবাধ সহ্য হয়, মা বোম্বাইওয়ালীদের প্রার্থিত করার মত রুচি বিকৃতি সহ্য করতে পারি না। বয়স থাকলে ও দুটোকেই এই মনুহুতে অগ্নি-সংস্কার করে ফেলতুম। এখন বীরেন প্রোপোজেন হীরেন ডিনপোজেন উইথ ডিভাইন লাফটার।

—আমি তাহলে যাই? হীরেন ভয়ে ভয়ে বলল। তার মনে হচ্ছিল, উপায় থাকলে এখনি পাতালে প্রবেশ করে।

—না না যাবে কোথায়। এখনও আর একটু বাকি আছে যে বাবা হীরেন।

বীরেন চোরার সন্নিহিত উঠে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন ঘরের কোণে একটা টেবিলের দিকে। টেবিলটা কলকাতা শহরের মতই কনজেস্টেড হয়ে উঠেছে। ছোট জলের কুঁজো, গেলাস, ওষুধের শিশি, বাস্ক, বইয়ের পর বই, কাত বই, চিৎপাত বই। টেবিলটার অবস্থা মহাভারতের মত। কি নেই! সেই মহাভারত থেকে বীরেন প্রয়োজনীয় বস্তুটি তুলে নিলেন। পেট চ্যাপ্টা একটা বোতল। বোতলটা হাতে নিয়ে হীরেনের সামনে। এসে দাঁড়ালেন।

—দেখ ত এটাতে মানিপ্র্যান্ট কি রকম হবে।

হীরেনের চোখের সামনে সেই বোতল। কাল লেবেলের গায়ে তিনটে এক্স চোখের সামনে একশোটা এক্স হয়ে নাচছে—এক্স, এক্স, এক্স, এক্স রাম। হীরেন শূন্যকণ্ঠে গলায় বলল—ভালই হবে।

—বেশ, বোতল যখন এনেছো, প্র্যান্টের দায়িত্বটাও তোমার নেওয়া উচিত। খালি এনোঁছলে না ভীত? তোমার স্টকে এই সুন্দর বস্তু আর কটা আছে?

কি উত্তর দেবে হীরেন। তার প্রাইভেট ওয়াল্ড বেরিয়ে পড়েছে বিপ্রীভাবে। মলাটের মেয়েটার চেয়েও সে এখন উল্লস! হীরেন তবু জিজ্ঞেস না করে পারলো না—এ সব আপনার কাছে কি করে এল?

—ও তুমি বুঝি সেই নীতিবাক্যটা ভুলে গেছ—পাপ কখনও চাপা থাকে না। হীরেন্দ্র, পাপ একপ্রকার একজন্মা!

অঘ্যারীন্দ্রিয়ামো মোঘং পার্থ স জীবিতঃ। যে ব্যক্তি শূন্য নিষ্কর ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ ও স্বার্থ লইয়া আছে পাপরস-জীবন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে। ভুঞ্জতে তে ত্বং পাপা যে পচন্ত্যাশ্বকারনাং। যাহারা কেবল আপনার জন্যই পাক করে সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও হীরেন, তাহলে জেনে রাখ বাপু ফাঁকি দিয়ে হবে না! কিঞ্চৎ সংযম, কিঞ্চৎ ত্যাগ, অল্প একটু আদর্শ নিষ্ঠার প্রয়োজন হবে। আর যদি মনে করে থাক জন্ম দিয়েই তোমাদের কর্তব্য শেষ তাহলে.. বীরেন সদর করে গাইলেন—শেষের সোদিন অতি ভয়ংকর। তোমাকে বলা বৃথা তবু বলি, অজ্ঞশাস্ত্রান্ধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নাস্তং লোকহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ। অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক ও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই।



হীরেন আর বসে থাকতে পারছিল না। একই সঙ্গে তার গোটা তিনেক ব্যাপার অবলম্বে করার প্রচণ্ড ইচ্ছে হাঁছিল। বৌয়ের সঙ্গে বেশ খোঁলসা করে একটা ঝগড়া, ঘুমন্ত ছেলেকে কান ধরে টেনে তুলে ঠাস ঠাস করে গোটকতক চড়, তাস আর কিছ্‌নু বই পড়াড়িয়ে ফেলা। কিন্তু অনুমতি না পেলে ওঠে কি করে।

—শেষ গোটকতক কথা তোমার ভালর জন্যেই বলছি—বীরেন চেয়ারে বসলেন—তোমার মূখ দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতবে খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছে, হবেই—ক্ৰোধান্ধবর্তী সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাদ বুদ্ধিনানো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। ক্ৰোধ থেকে তোমার মোহ হবে, তোমার স্মৃতির ওপর চেপে বসে বুদ্ধির টুংটি চেপে ধরবে, আর বুদ্ধি গেল ত বইল কি। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। বাড়িতে তিনটে বেডিও ঢুকিয়েছ, একটা ওপরে দুটো নিচে। পার তো দুটোকে বিদায় কর। ছেলে যদি মানুষ কবতে চাও—ইট ইজ এ মাস্ট। হ্যাঁ বাধা আসবে, তোমার বউ আঁচড়ে কামড়েও দিতে পারে। শুনলুম তিনি নাকি টি-ভি র জন্যে সত্যাগ্রহ করেছেন গোদের ওপর বিবক্ষোঁড়া।

—আমি ক্যাটিগোবিক্যালি—না বলে দিযোঁছি, বলোঁছি ওসব হবে না, পাঁচজনে করে যাহা তুমিও করবে তা, ওসব চলবে না। এ বাড়িতে আপনার নীতি, আমি কারব যাহা অন্য শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া অনুসরণ করবে তাহা।

—যাক জীবনে এটা না বলতে পেরেছ ভেনে বড় খুশী হলুম হে! তবে তোমার না, হ্যাঁ হলে যেতে যোগ্য সন্যাস নেয় না। তোমার দেশ কি জ্ঞান, তুমি বোধধ্বংস আদর্শ ধরে থাকতে পাব না। খাঁটা খুলে ফেঁদে করে উড়ে যার। আচ্ছা, তা, দেখা যাক, যাতে পারে সেটো কণ্ঠে কণ্ঠে একদিন হরতো হরে যাবে। ইয়েস ম্যান থেকে নো-ম্যান। তোমার মতো এম-এল-এ কি এম-পি হবার সম্ভব গুণ ছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বীরেন হীরেনের খোঁজ হল ওটা তো তার প্রশংসানন্দ, নিন্দা, সঙ্গে সঙ্গে শুধুই নিজের মতো, আসে না।

বীরেন ধারাল হেসে বললেন—দেখেছ, তোমার না আর হ্যাঁব মধ্যে কোন চৌকাঠ নেই। দু নৌকোর দুটো পা, এই না, এই হ্যাঁ। রেডিওর সঙ্গে বিদায় কর ওই সর্বশেষে জিনিসটা—‘অ্যাকোয়ারিয়াম!’ পড়াশোনা কীজকর্ম সব কিছ্‌নু ভন্ডুল করার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। সারা দিন বসে বসে মাছের

খেলা দেখ, এদিকে পেছন দিয়ে সময় জীবনের খেলা খেলতে খেলতে সরে পড়ুক। সারাদিন একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে মাছের বাচ্চা তুলে একটা জারে রাখ। এরকম মাছও দৌঁখনি, ফাইটার না ব্যাক মলি, ঘণ্টায় পঁচাশটা করে বাচ্চা পাড়ছে। মানুষকেও হার মানিয়েছে। ছেলে যদি মানুষ করতে চাও হীরেন অবিলম্বে ওই বস্তুর্দ্দাঁটও দূর কর। তাস, পাশা, দাবা, মাছ সব কটাই কর্মনাশা। যাও তাহলে, হাই উঠছে, তোমার। দৌঁখি কটা বাজল। ও মোটে এগারটা তেমন কিছু রাত হয়নি।

হীরেন সিঁড়ি দিয়ে ধাপে ধাপে নামছে। একটা হাতে তাস, ম্যাগাজিন, অন্য হাতে বোতল। এক কানকাটা গ্রামের বাইরে দিয়ে যায়, দু' কানকাটা যায় গ্রামের ভেতর দিয়ে। এখন তার আর সেই লজ্জা নেই। মনে মনে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আর তার লজ্জা কিসের। তার গদুপ্তজীবন আজ চিঁচিৎফাঁক হয়ে গেছে।

বীরেন সিঁড়ির ওপর থেকে অবশিষ্ট উপদেশটুকু বদুলিয়ে দিলেন— সংসার করতে হলে একটা জিনিস জেনে রাখো, বাইরেটাকে করতে হবে বজ্রের মত কঠোর, ভেতরটা কুসুমের মত কোমল হোক, ক্ষতি নেই। ম্যাদামারা হলেই ভুগতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বলে হীরেন শেষের দুটো ধাপ হিসেবের গোলমালে এক স্লেগেটপকে ফেলল। আর একটু হলেই পাটা মচকে যেত। খুব জোর সামলে নিয়েছে। বোতলটাও হাত থেকে পড়ে যেত। খুব জোর সামলে নিয়েছে। মোটা হবার জন্যে রাম কিনেছিলে রাসকেল। হীরেন নিজেকেই নিজেকে গালাগাল দিল—মোটা হবে মোটা! এইবার রামের ঠেলা বোঝো!

বাঁদিকে ঘাড় ফিঁরিয়ে বসার ঘরটা দেখল। নিচেটা একেবারেই নির্জন। অন্তত একটা ছোট টেবিলের ওপর আলোকিত অ্যাকোয়ারিয়াম। অশ্বকার ঘরে শুধুমাত্র অ্যাকোয়ারিয়ামের আলো ভারি সুন্দর একটা মায়া তৈরি করেছে। সাদা সাদা কোরাল আর সবুজ শ্যাওলা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপর দিকে উঠেছে। বালির বিছানার ওপর খেবড়ে বসে আছে চীনেমাটির হাঁ করা ব্যস্ত, মাঝে মাঝে ভুরুভুরু করে মূখ দিয়ে বদবদ ছুঁড়েছে। ছোট একটা স্বপ্নের দেশ যেন! মদুজোর মত রঙের একটা মাছ। রাজকীয় চালে কোরালের ডালপালার পাশ দিয়ে ওপর দিকে উঠছে। একটি কিশোরের সযত্ন পরিচর্যা গড়ে তোলা রঙীন মাছের জগৎ।

হীরেন আলো না জ্বলেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল। হাতের জ্বিন্গলো সাজিয়ে রাখল পাশের সেন্টার টেবিলে। জল থেকে স্নিগ্ধ চাপা আলো অ্যাকোয়ারিয়ামের তিন পাশের কাঁচ ভেদ করে চারপাশে ক্ষুদ্র একটা জ্যোৎস্নার বলয় তৈরি করেছে। সেই আলোতে তাসের সুন্দরী, ম্যাগাজিনের মলাটের পা ছোঁড়া নর্তকী, রামের বোতলের কালো লেবেল সব কিছুর যেন অন্য অর্থ! অদ্ভুত একটা সুখের গন্ধ উঠছে। হীরেন তার শোবার ঘরটাও দেখতে পাচ্ছে। নীল নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। পাথার হাওয়ায় দরজার পর্দা কাঁপছে। নাইলনের মশারির মধ্যে আর এক নীলাভ অ্যাকোয়ারিয়াম। সেখানে নির্দ্রিত মাছ আর মাছের মা। বসার ঘরে বসে বসেই হীরেন শোবার ঘরের দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে। হলদে শাড়ি পরে এক যুবতী, না-চিং না-উবুড়, হায়ে, নিজের কানকোর ওপর একপেগে হয়ে এংকেবেংকে শূয়ে আছে, মাছের, মত, মারমেডের মত। তার পাশেই কাতলার মত মোটা মাথা আর একটি মাছ। যার বাসাম্বিক পরীক্ষার ফলাফল সংবলিত মেটো কাগজটি এখন বোম্বাই চিত্রতারকার পশ্চান্দে চাপা পড়ে আছে।

গালে হাত রেখে হীরেন অ্যাকোয়ারিয়ামটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। বসে বসে মাছেদের খেলা দেখল। ব্র্যাক মাল, ফাইটার, এঞ্জেল, গোল্ড ফিশ। কখনও ওপর দিকে উঠছে, কখনও নিচে নামছে। একটা মাছের পেছন দিকে সরু স্রুতোর মত কি একটা বেরিয়েছে। মাঝে-মাঝে এক একটা মাছ আর একটাকে তাড়া করছে। গুলটানো একটা কাপ থেকে সরু সরু কেঁচো বেরোচ্ছে। বড় মাছটা হাঁ করে খেতে আসছে। হাঁ-মুখ মাছটাকে সৈথে হীরেনের মনে হচ্ছে সে যেন নিজেকেই দেখছে—হীরেন হাঁ করে তেড়ে যাচ্ছে অপর্ণাকে চুমু খেতে।

\*

তছনছ করে দেবো। সব কিছুর তছনছ করে দেবো। হীরেন মনে মনে বললে। অ্যাকোয়ারিয়ামের সংসার আমি তছনছ করে দেবো! আমি বল্লের মত কঠোর। হীরেন মনে মনে যখন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে অ্যাকোয়ারিয়ামের ব্যাঙটা তখন মূখ দিয়ে খুব বদবদ ছাড়ছে। হীরেন বললে, জীবন ভাল তবে মানুষের জীবন আদৌ ভাল নয়। না, তাই বা কেন, মানুষ হয়ে জন্মানো খুব খারাপ নয়, খারাপ হল বিবাহিত মানুষ হওয়া। বিবাহে কিছুর মূখ যে নেই তা নয় তবে সন্তানে বড়ই অসুখ।

গোল্ড ফিশটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। তারি সুন্দর একটা শব্দ হল। সমস্ত জলে গুঁড়ো গুঁড়ো শ্যাওলা। বালির কণা চিকচিক করছে। না বেশিক্ষণ বসলে দুর্বল হয়ে পড়বে। হীরেন আগে কখনও এত মনোযোগ দিয়ে মাছের খেলা দেখেনি। বৌ, ছেলে, রজনী মাছ সবই এক ধরনের দুর্বলতা। বন্ধুর বেশে পরম শত্রু। পরস্পর পরস্পরকে বাঁশ দিয়ে চলেছে। তুই আমার ছেলে। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব, তস্যাপুত্র ঘোর একটি লৌহমুখল। হীরেন আপন মনেই হাসল। বীরেন হলেন কৃষ্ণ, হীরেন হল শাম্ব, 'ইয়েস ম্যান' ব্যক্তিহীন। ওই, মুখল এই তাসের প্যাকেট। ম্যাগাজিন, সব টেনেটুনে ওপরে তুলেছে আর আমার স্ত্রী, যাকে আমি দুখ-কলা দিয়ে পুষিছি তিনি হ্যা, হ্যা করে এই দ্বিবিধ অশ্রীল বস্তুর পদযাত্রা হাঁ করে দেখেছেন। সারা দিন, অত বকবক করলে গুঁছিয়ে সংসার হয়! যার শাড়ি অনবরতই সায়ার তলায় নেমে যায়, যার ব্লাউজের কাঁধের ফাঁক দিয়ে অনবরতই ফিফিটিকির ন্যাজ বেরিয়ে পড়ে যার পিঠের দিকে, কোমরের ওপর প্রায়ই ছত্রিশ নম্বর টিঁকট কোলে, তাকে বিশ্বাস করে হরিদাসের গুপ্ত কথা বাড়িতে ঢোকানই অন্যায় হয়েছে। আমি একটি মূর্খ! পুংশ্চলী পঞ্চচুড়া দেবর্ষি নারদকে সেই কবে বলে গিয়েছিলেন—যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধারা বিষ সর্প ও অগ্নি—এই সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান। শাস্ত্রবাক্য না শুনলে দুঃখ তো পেতেই হবে মানিক। গুঁফো ফরিয়াল ম্যাগাজিনের মলাট থেকে হীরেনের দিকে মিটিমিটি তাকিয়ে আছে।

শেষ থেকেই তবে শূরু হোক। প্রথম অ্যাকোয়ারিয়াম। দ্বিতীয় রোডিও। সচল রোডিও অচল করা কয়েক মিনিটের ব্যাপার। কামেলা এই আলোকিত মায়া। এরই মধ্যে দুর্বল করে ফেলেছে। তার চেয়েও শক্ত কাজ নিজের চরিত্র সংশোধন। সাধন করনা চাহিরে মনুয়া ভজন করনা চাহি। আচ্ছা সে হবেখন চরিত্র ছেলেখেলার জিনিস নয়।

হীরেন উঠে পড়ল। দুটো স্বাক্ষাতে প্রাণী ওখরে পরমানন্দে ঘুমোচ্ছে। এই তো সময়। অপারেশন অ্যাকোয়ারিয়াম। সকালে উঠে দেখবে, ফককা ফাঁক। সাজান বাগান শূন্য করে গেছে। হীরেন জানে তার ছেলের বন্ধপাতি কোথায় থাকে। বিশাল একটা কার্ডবোর্ডের বাসে। বাইরে থেকে প্রথমে বারকতক টোকা মারতে হবে। আরশোলা, ইন্দুর, বিছে, মাঝুসা বাবতীস রোমহর্ষক বজ্রুরা হীরেনের আঙুলের মাধ্যম কামড় বসবার জন্যে উদ্ভূত

হয়ে আছে। সে সুযোগ তোদের দেবো না শরতান। নিজের চরিত্রের ব্যাপারে অসাবধানী হলেও নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন। অত ক্যাবলাকাস্ত নই স্যার। না তেমন কিছ্ নেই। বাচ্চা একটা টিকিটীক ডিড়িক করে লাফিয়ে মেঝেতে পড়ল। সেটাও একটা চমকে দেবার মত ঘটনা। সরাসরি মাঠেই ভীতিপ্রদ।

কত কি যে আছে বাস্কেটর ভেতর। একটি শিশুর কপননার রাজত্ব। কাড়-লপ্টনের কাঁচ, খানিকটা ফ্লেক্সিবল তার। একটা অচল টেবল ক্রক। খানিকটা মোম, দুটো ছাতার সিক, একটা কাঁচি, প্ল্যাস্টিক ব্যাগ, গোটাকতক চোপসান বেলুন, শুষ্ক খাবার প্ল্যাস্টিকের চামচে, এক পুরনো প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস, গোটাকতক রঙীন পেনসিলের টুকরো, একটা চশমার কাঁচ, ভাঙা পুতুল, রঙের বাস্কেট, মরচেধরা ছুরি। হীরেন যে বস্তুরিট খুঁজছিল সেটি পেয়ে গেল একেবারে তলায়। গোল করে সাপের মত গোটান। ফুটকতক সরু অ্যালকাথিন-পাইপ প্ল্যাস্টিকের ছোট বালতিটাও পাওয়া গেল। সব কিছ্ এত সহজে পেয়ে যাবে সে ভাবেনি।

হীরেন যখন বসার ঘরে ফিরে এল রাত তখন আরও একটু বেড়েছে। মনুষ্য রঙের মাছটা স্থির হয়ে ভাসছে। বাকি মাছগুলো তলার দিকে চিতিয়ে আছে। বড় ক্রান্ত সব। জলের জগতেও রাত বাড়ে। টিউবটা হাতে নিয়ে মৎস্যধারের সামনে হীরেন আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। বড় ধ্বংস চলেছে মনে। হৃদকমলে বড় ধূম লেগেছে, মজা দেখছে আমার মনপাগলে। করব কী করব না? হীরেনের মনে হল সে একটা ড্রাকুলা। রক্ত শুষে নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। মাছের জীবন জল। বড় সহজ উপায় মাঝায় এসেছে। না একটু শক্ত হতে হবে! একটি ছেলের ভবিষ্যৎ বড় না মাছ বড়!

হীরেন অ্যালকাথিন পাইপটা জলের মধ্যে নামিয়ে দিল, অন্যমন্থতা ঝুলিয়ে দিল নিচের বালতিতে। জলের উচ্চতা ক্রমশই কমছে। মাছদের মধ্যে হুড়োহুড়ি, পড়ে গেছে। মধ্যরাত্রে এ কী দুর্যোগ। বড় মাছটা কাঁচের জানালায় চোখ রেখে যেন বলছে—এ কি কর্নাহিস তুই ঘাতক! তিনের চার ভাগ জল পড়ে গেছে। সিকিভাগ মাত্র জলে সমস্ত মাছের সে কি আশংক! গান্ধে গা লাগিয়ে ঝাড়ে ঝাড়ে চেপে সেই সামান্য জলে বেঁচে থাকার কি প্রাণপণ চেষ্টা! হীরেন নলটা হঠাৎ তুলে নিল। না অসম্ভব? এ তো একপ্রকার হত্যা। বালতির জলটা সে আবার ফিরিয়ে দিল।

আবার শূন্য হয়ে গেল মাছেদের উল্লাস। জলটা একটু ঘুলিয়ে উঠেছে। চীনে মাটির ব্যাঙ মৃদু দিয়ে বৃন্দবৃন্দ ছুঁড়েছে। হীরেন আবার বসে পড়েছে। খুব রাগতে না পারলে কঠিন কাজ করা যায় না। অসম্ভব কিছুর একটা করার জন্যে ভয় পেতে হবে কিংবা রাগতে হবে। রাসকেল ছেলে তুমি সারা দিন বসে বসে মাছের চাষ করছ আর ফিরিয়ালের গোঁফ তৈরি করছ। ভেবেছ এই ভাবেই তোমার দিন কাটবে তাই না! মাছের রেন নেই। মাছের আবার জীবন মৃত্যুর বোধ! কত মানব মরে ভুত হয়ে গেল সামান্য কয়েকটা মাছ! সকালে জেলেদের জালে মাছ দেখনি, ঘোল টাকা কিলো! মাংসের দোকানে ছাল ছাড়ান পাঠা দেখনি, বিশ টাকা কিলো! লাগাও নল, চালাও নল!

হীরেন আবার পাইপটা চালিয়ে দিল। হাসপাতালের মত দৃশ্য—সেখানে বাঁচাবার জন্যে স্যালাইন দেওয়া হয়, এখানের আয়োজন বিপরীত। ধীরে ধীরে জল টেনে নিয়ে উঁচু ডাঙা তৈরি করে দাও। সমস্ত স্ফূর্তি শূন্য করে দাও। বাল্যতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। মাছেদের মৃত্যুর পদধ্বনি। আর তো আমি তাকিয়ে দেখব না। হীরেন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মাছেদের ছটফটানি দেখলেই সে দুর্বল হয়ে যাবে। আবার তাকে জলটা ফিরিয়ে দিতে হবে। সারা রাত এই খেলাই চলবে না কি? কি এমন অপরাধ? আমার বৌ জিয়ানো সিসি কি মাগুরমাছ সকালে নুন দিয়ে বর্গটির পেছন দিয়ে ধোঁতো করে মারে না? সারা রাত যে মাছ একটা কাপড় ঢাকা বাথটাবে একটু মৃদু জ্বল জ্বল, জলের সংসারে ফিরে যাবার জন্যে অনবরতই খলবল করে। বাজারে সে দেখনি? রূপোর মত ঝকঝকে ফলুই মাছ মাঝে মাঝেই জলের গামলা ছেড়ে আকাশ সমান লাফিয়ে উঠে আবার জলেই ফিরে আসছে, ওজন দরে তারই মত মৃত্যুভীত খন্দেরের ব্যাগে? তবে? তবে? সংস্কৃতে সেই নীতিবাক্যটা ত এই মৃদুহৃতেই স্মরণ করা যেতে পারে—একটি গ্রামের মঙ্গলের জন্যে একটি জনপদ, একটি শহরের জন্যে একটি গ্রাম, একটি দেহের জন্যে একটি অঙ্গ সহজেই ত্যাগ করা চলে। সে হোলাট?

॥ ২ ॥

সকাল ছটা নাগাদ বাথরুমে জল আসে। কাল রাতে কলটা কেউ খুলেই রেখেছিল। তোড়ে জল পড়ছে। সেই শব্দে হীরেনের ঘুম ভেঙে গেল।

রোজকার মতই অজস্র পাখি ডাকছে। কানে আসছে পিতা বীরেনের স্তোত্র-পাঠের শব্দ। সেই একই রকম প্রভাত। কোনও ব্যতিক্রম নেই। সাঁইগ্রিশ বছর ধরে এই একই ভাবে সকাল আসে। দিন যায়, রাত আসে। হাঁইরেনের হঠাৎ মনে হল—না, আজকের প্রভাতের একটা নতুনত্ব আছে। সাঁইগ্রিশ বছরের পুরোনো গদ্যটি কেটে হাঁইরেন আজ নতুন প্রজাপতির মত মশারিবে ভেতর থেকে উড়ে আসবে। একটু সাহস কবে বেবোতে হবে এই যা। বাইরে অপেক্ষা করে আছে আহত সন্তান, যার দলে সব সময়েই আছে এক নারী। সন্তানের ডাকে মা সব সময়েই সাড়া দিয়ে থাকেন। জীবন্ত মা আর জগন্মাতার তফাৎ এই—হাঁইরেন শূন্যে শূন্যে মিনিট পনের ডাকা-ডাকি করেও অন্তরে তাঁর সাড়া শব্দ পেল না। এখন একমাত্র ভরসা সেই গানটা, ছাত্রজীবনে যে গানটা সে খালি-জলের ড্রামের ওপর ঘুঁষি মারতে মারতে গাইত—হও করমেতে বাঁব, হও ধরমেতে ধীর, হও উন্নত শির নাহি ভয়।

মশারির ভেতর থেকে মাথাটা বের করে বাইরের জগৎটা হাঁইরেন একবার দেখে নিল। অন্য বিছানাটা খালি। যদিও মশারিটা এলোমেলো ঝুলছে এখনও। তার মানে, দি ক্যাট ইজ আউট অফ দি ব্যাগ। ঝুলির বাইরেই বেড়াল। মিঞাও করল বলে। এতক্ষণে জল শূন্যকনো মৎস্য-শ্মশান নিশ্চয় চোখে পড়েছে। চোখে পড়েছে দেয়ালের গায়ে লটকান তার লেখা নোটিস—ফেব্রুয়ারির বড় বড় অক্ষরে—পাপের বেতন মৃত্যু। 'লেখাপাপড়ায় অবহেলা করার প্রথম শাস্তি' সাবধান। সাবধান।

এখন মনে হচ্ছে আজকের ভোরটা না হলেই বোধ হয় ভাল হত। কী কান্ডই যে হবে রে বাবা। বিছানা থেকে নেমে চাঁট পায়ে দরজার দিকে এগোতে এগোতে মনে হল যেন ফ্রুস্ট্রারের দিকে এগোচ্ছে। মাথা নীচু করে বসে থাকলে ত চলবে না। পরিস্থিতির মৃদুখোমৃদু হতেই হবে। হাঁইরেন পর্দা সরিয়ে দরজার বাইরে আসতেই কানে এল ছেলের গলা—ওই যে নড়ছে দাদি, নড়ছে দাদি।

—নড়বেই তো দাদু, নড়বেই, একে কি বলে জানো উইল ফোর্স। উইল ফোর্স মানে কি দাদু?

—ইচ্ছাশক্তি।

—ভোরি গুড। সবই তোমার আছে, একটু ছাই চাপা। দেখি বোম্বট ব্যাকি জলটা আস্তে আস্তে ঢাল ত।

এক সঙ্গে অনেক ছাড়ির রিনিঠিনি শব্দ হল। হীরেন বসার ঘরের দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছিল ঘরের ভেতর কি ঘটছে। লক্ষ্য করেনি দরজার পাশে ঠেসান ছিল বীরেনের বেড়াতে শাবার ছড়িটা। মেঝেতে পড়ে ঠাস করে একটা শব্দ হল। হীরেন তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে ছড়িটা তুলছিল। বীরেন বললেন—এস স্কাউন্ডেল! তোমার দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত। নৃশংস তুমি দেখি গ্রেট ডিক্টেটরদেরও হারিয়ে দিলে। তুমি আমার দাদুর চোখের জল ফেলিয়েছো এমন সুন্দর ভোরে।

ছড়িটাকে খাড়া করে হীরেন পাশে পাশে ঘরে এসে ঢুকল। অ্যাকোয়ারিয়ামের চার-পাশে হীরেনের ছেলে, বৌ বাবার ভীষণ কেরামতি চলেছে। অপর্ণার মাথায় সামান্য ঘোমটাটাও নেই। ঘাড়ের কাছে থলথলে খোঁপা। প্লাস্টিকের বালতিটা নিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাকোয়ারিয়াম জলে টইটব্দর। অধিকাংশ মাছই যথারীতি সাঁতার কাটছে। দু' একটা বড় মাছ কেবল কাবু হয়ে ওপরদিকে ভাসছে।

—দাদি, আমার পাল্‌ গোরামিটাকে আগে বাঁচান। ওটা একদম নড়ছে না। নাতির কথায় বীরেনের দৃষ্টি হীরেনের দিক থেকে মাছের দিকে ঘুরে গেল।

—সেটা আবার কোনটা? এই তো একটাকে বাঁচিয়ে দিলুম।

—ওই যে যেটার মনুষ্যের মত রঙ।

—বৌমা, তোল'ত মাছটাকে।

—তুললে আরও মরে যাবে বাবা।

—আরে তুমিও যেমন, মরেছে আর মরতে কি? তোল!

অপর্ণা মাছটা তুলে বীরেনের হাতে দিল। হাতের তালুতে মাছটাকে কিছুক্ষণ রেখে, বীরেন চুক্‌চুক করে উঠলেন—ইট ইজ ডেড বৌমা, ইট হ্যাজ বিন কিল্ড। কী সুন্দর! ভগবানের কী ক্রিয়শান দেখেছো? ওয়াশাংটন ফুল। যে ভগবান হীরেনকে সৃষ্টি করেছেন, সেই ভগবানই এই মাছ সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বাসই হয় না, কি বল বৌমা?

—আজ্ঞে ঠিক বলেছেন।

—বোতল ধরেছে?

—বোতল।

—নাঃ তোমার আই কিউ কমে গেছে। হীরেন ড্রিংক করে?



—ড্রিংক ? ড্রিংক করলে পে\*...সরি ! অপর্ণা আধ হাত জিভ বের করে মাথা নিচু করল ।

—ঠিক বলেছো ! লজ্জা কিসের । বুদ্ধেছি, বুদ্ধেছি, ওই শব্দটা তুমি আমার কাছ থেকেই শিখেছো । আমি খুব পছন্দ করি ওয়ার্ডটা । অমন ফোর্সফুল শব্দ আর দ্বিতীয় নেই । অ্যান্ড হি ডিজার্ভ'স ইট । রাসকেল ! তোমাকে ধরে আনতে বললে বেঞ্চে আন । শিশু মনস্তত্ত্ব বোঝো কিছদু ? তুমি আমাকে কপি করতে গেছ মদুখ !

হীরেন বললে—আপনিই তো কাল রাতে বললেন রেডিও, অ্যাকোয়ারিয়াম প্রভৃতি বিদায় করতে ।

—তুমি একটি মার্জার । নরম মাটিতেই তোমার প্রথম আঁচড় । রেডিও দিয়ে শব্দ করলে না কেন ? সেখানে তোমার পার্সোনিয়াল ইন্টারেস্ট আছে ?

—দাদি আমার স্প্যাট ?

বীরেন নাতির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—সেটা আবার কি ?

—ওই যে বাঘের মত ডোরাকাটা মাছটা ।

—কাদবে না । বোমা যে কটা ভেসে উঠেছে সব কটা তুলে ফেল । দাদু তোমার বাবাকে একটা লিস্ট করে দাও ! আজই সব কটা কিনে আনবে । আর শোন, চিকেন হাটে'ড হলে শখ-শোখিনতা চলে না । অ্যাকোয়ারিয়ামটাকে তুমি বড়'কর । স্পেসটা বাড়ায় । আমি আগে এত ভাল করে দেখিনি । তুময় করে দেয় হে । ইট ইজ এ নাইস হবি !

হীরেন ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করার জন্যে জিজ্ঞেস করল—তাহলে এটা থাকবে ?

—অফ কোর্স ! শব্দ থাকবে না, বহাল তবিরতে থাকবে, বড়সড় হয়ে থাকবে । কিন্তু দাদু তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলবে না ত ?

—না দাদি, অথেক আশি, ইংরেজীতে সত্তর ।

—মিনিমাম সত্তর, বাংলায় সত্তর মিনিমাম, অন্যান্য সাবজেকটে মিনিমাম আশি ।

বাইরে থেকে তারকবাবুর ডাক এল—কই হে বীরেন, আজ এখনও বোরোও-নি, আর কখন বেরোবে, সুখ যে টাকে উঠল ।

বীরেন ব্যস্ত হলেন—দাও, দাও ছিড়িটা দাও । যাচ্ছি হে ।

—কী করছ কী ?

বীরেন বেরোতে বেরোতে বললেন—সংসারের চাঁদোয়ার তালি মারছি।

দুই বৃদ্ধ পাশাপাশি হাঁটছেন। তারকবাবু বলছেন—বেশ আছ।

—কেন থাকবো না। তুমি যে আছ সেটা সংসারকে মাঝে মাঝে জানান দিতে হয় বুদ্ধেছ, তা না হলে থাকা আর না-থাকা দুটোই সমান। সংসারের স্থির জলে মাছের মত মাঝে মাঝে ঘাই মেরে উঠতে হয়---হাম হায়, হাম হায়।

দুই বৃদ্ধের বগলে ছাড়ি। প্রয়োজন নেই তবু প্রথা। ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে জোরে জোরে হাঁটছেন। কখনও হাত নড়ছে, কখনও ঘাড় নড়ছে। মাঝে মাঝে বগলের ছাড়ি হাত ধরে রাস্তায় নামছে।

সেই দিন সন্ধ্যায় নিউ মার্কেটের সামনে উদভ্রান্ত একটি মানুষকে দেখা গেল। নিচু হয়ে ফুটপাথে বসে থাকা একটি লোককে জিজ্ঞেস করছে---  
পার্ল গোরামি হায়?—হায়।

লোকটি এসটা শিশি উঁচু করে দেখাল।—স্পাট?

--হায়। টাইগার বার—হায়।

হীরেন গোটা তিরিশ টাকার মাছ কিনে বাড়ি ফিরছে। কোলের ওপর থলথলে জলভর্তি প্লাস্টিকের ব্যাগ।

হীরেনের পাশে বসেছেন এক ভদ্র-মহিলা। কোলে একটি মাকারি মাপের দুর্দান্ত শিশু। হীরেন আগ শিশুটিতে থাবার লড়াই চলেছে। হীরেন একটু অন্যমনস্ক হলেই শিশুটি যে কোনও একটা ব্যাগে থাবা মেরে দিচ্ছে। হীরেনও সঙ্গে সঙ্গে পাতটা থাবা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে। মহিলাটি উদাসী ধবনের। কোনও গ্রাহ্যই নেই। হাঁ করে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছেন।

নিঃশব্দে থাবার লড়াই চলেছে। মিনিবাস চলেছে, লাফাতে লাফাতে। ছেলোটো হঠাৎ হীরেনের কান মলে দিল। হাতে খিঁচি কেটে দিল। হীরেনের সঙ্গে কিছুতেই সন্ধি করতে না পেরে, উদাসী মারের মূখটা কচি কচি হাত দিয়ে প্রাণপণে নিজের দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করতে করতে চিল চেঁচান চেঁচাতে লাগল---মা, মাছ, মাছ, মা, মা, মাছ, মাছ, মা।

সাত মাইল পথ হীরেন এইভাবে এল। সমস্ত যাত্রীর চোখে কঠোর দৃষ্টি।

হীরেনের কানে তালা লেগে গেছে। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। বাড়ি চুকছে তালে তালে পা ফেলে---মা, মাছ, মাছ, মা, মা, মাছ, মাছ, মাছ, মা।

বড় অ্যাকোয়ারিয়ামের দরজা খুলে গেল। অপর্ণাই খুলেছে। পেছনে একটি শিশুর মূখে উৎসুক বড় বড় চোখ। হীরেন মস্তের মত বলছে—মা, মাছ, মাছ, মা, তালে তালে গাঁত তার বসার ঘরের দিকে।

অপর্ণা হঠাৎ চিৎকার করে বলল—দেখি, কি খেয়েচো, হাঁ করত।

হীরেন অপর্ণার নাকের সামনে হাঁ করতেই তার কানের তাল খুলে গেল আর শুনতে পেল তার ছেলের সোল্লাস চিৎকার, মা-মাছ। মাছ-মা।





এ ব্রেড হ্যাজ ফোর সাইডস্‌। তিন দিন মোটে কামিয়েছে। তার মানে একটা দিক এখনো অব্যবহৃত। কিন্তু কোন দিকটা? রোজই মনে রাখার চেষ্টা করে। রোজই ভুলে যায়। সামান্য একটা হিসেব। এক, দুই, তিন, চার। তাও খেয়াল থাকে না! কি যে তোর মাথা বংকু। সকাল নটার সাইরেন অনেকক্ষণ বেজে গেছে। সাত মাইল দূরে অফিস। অনেক বাধা ঠেলে সাড়ে দশটার মধ্যে যেমন করেই হোক পৌঁছাতে হবে। এদিকে চারটে আসল কাজ বাকি। ক্ষৌরী খাজানা, নাহানা, খানা, পরনা। প্রথম কাজটাই আটকে গেছে। ব্রেডের হিসেব গোলমাল করে ফেলেছে।

সকাল থেকেই আজ সব ট্রেন লেটে চলেছে। গতকাল বণিকমের এক সম্বন্ধীর বিয়ে ছিল। বিয়ে হয়েই ছিল। গতকাল গেছে বৌ-ভাত। এক পেট আবজর্জনা নিয়ে শূতে শূতেই একটা বেজেছে। সারা রাত প্রায় শূম নেই। জঠরে বিভিন্ন সূত্বাদ্যের লাঠালাঠি। পরিপাক যন্ত্রের নির্দেশ কেউই মানতে চাইছে না। আটখন্ড মাছ জোড়া লেগে বিশাল কালবোস হয়ে এ পাশ থেকে ওপাশ খেলে খেলে বেড়াতে চাইছে। কয়েক টুকরো মাংস বিগত জীবনের শোক ভুলতে পারছে না। মাঝে মাঝে ব্যা ব্যা করে উঠছে।

ক্রায়েড রাইস সমস্ত মেহবন্দ ত্যাগ করে হুইউ পলিউশানের দায়ে এক কোণে আলো চাল মেয়ে বসে আছে। এই হটগোলে দধি বেচারা পশু চর্বি'র ভার মূক্ত করে সমস্যা আরো সাংঘাতিক করে তুলেছে। গোটা কতক কমলাভোগ ক্রিকেট বলের মত কেবলই বোল্ড আউট করার চেষ্টা করছে। পাকযন্ত্র হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আমি হলুম গিয়ে কোলভাতের যন্ত্র, তুমি ঠুসেছো মোগলাই খানা! আই হ্যান্ড নো রেসপনসিবিলিটি, তোমার মাল তুমি বুরুষে নাও। মাঝ রাতে বিনন্দ বস্কিম জোয়ানের আরক খেতে খেতে সার বুরুষেছে, অনুরোধে হয়তো ঢেঁকি গেলা যায় কিন্তু হজম করা যায় না। আর একটা জিনিস বুরুষেছে, আড়াইশো টাকা এখনো এই বাজারেও খেয়ে উসূল করা যায় না।

কড়কড়ে টু হাশ্বেড এন্ড ফিফটি রুপীজ। সামান্য একটি সোনার বালা। নতুন বোয়ের গোল গোল শ্যামলা হাতে মানিয়েছে জ্বর। ওমা! দেখি দেখি বড় জামাই কি দিয়েছে? বাঃ বেশ দিয়েছে। এই বাজারে বেশ দিয়েছে। মেয়ে মহলের প্রশংসায় বস্কিমের বুরুষ দশ হাত না হলেও বস্কিমের স্ত্রী প্রতিমার চলার ঠমক খুলেছে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে সে কি দেমাক! জ্যালজেলে শাড়ি নয়, অপাঠ্য বই নয়, ডিফেন্টিভ টেবল ল্যাম্প নয়, প্রাস্টার অফ প্যারিসের বিদঘুটে কোন মূর্তি নয়, আশ্চর্য একটা সোনার বালা বেড়ে সব শালাকে কুপোকাত করে দিয়েছে। অবশ্য এই বালা নিয়ে তার আগে বস্কিমের সঙ্গে অনেক চুলোচুলি হয়ে গেছে। তিন রাত দুজনে এক ধরে ঘুমোয় নি। দু'দিন নিজে উপবাস। সাতদিন কথা বন্ধ। বস্কিম বলার মধ্যে বলেছিল, একটা দুটো শালা শালী হলে লোকে দামী কিছু দেবার কথা ভাবতে পারে। না এষ্ঠীর কুপান সংখ্যার গো নেহাত কম নয়। আগের তিন শ্যালক আর এক শ্যালিকাকে সাড়ে তিন পরসো সোনার কানের ঠিকরে দু'ল দিয়ে জামাইকৃত্য করেছে, তখন সোনার দাম কম ছিল, নিজের সংসার ছোট ছিল। এখন দুটোই বেড়েছে। অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া আরো দু'জন লাইন দিয়ে আছে। বছর না ঘুরতেই টোপর পরার জন্যে মুখিয়ে আছে। এদিকে শালাজরা একটি ববে আন্ডা পাড়ছেন আর অনপ্রাশনের স্টেনলেস স্টিলের থ্যালবাটি কিনতে কিনতে বস্কিম ক্রমশই বোম মেয়ে খুচ্ছে। কাকে সামলাবে! বড়র মেয়ে হল, তো মেয়ে। একটি ছেলে দিলেন। অমনি বড় কোমর বেঁধে লাগলেন

ছেলের জন্য। মেজো টেক্স দিয়ে বাবে সহ্য হবে কেন? রেজাল্ট আবার মেয়ে। এদিকে সেজো সকলকে টেক্স দিয়ে একসঙ্গে দুটি ছাড়লেন। প্রবল প্রতিযোগিতা। ঘরদোর বাড়ি উঠান নবজাতকে ছয়লাপ। অনবরতই চ্যাঁচা।

বিশ্বম বলতে চেয়েছিল, সোনার এখন প্রচণ্ড দাম, একটা ভাল শাড়ি দিয়ে ছেড়ে দাও। তা কি করে হয়? এই ভাই আমার সবচেয়ে আদরের ভাই। টাকাকৈ করে মানদূষ করেছি। একটা ভারি কিছুর না দিলে প্রেসটিজ থাকে না। আরে ম্যান তুমি এত রোজগার করছ? বিয়ে ত একবারই করো লোকে! এর পবের কাজ তো অনেক পরে। বিশ্বম খুঁত খুঁত করে বলেছিল, তাহলে সেই পেটেন্ট দুল। তিন পয়সার সোনা।

‘না না দুল নয়।’ প্রতিমার ঘোরতর আপত্তি। ‘দুল একঘেয়ে হয়ে গেছে। প্রতি কাজেই দুল গেছে। এবার অন্য কিছুর।’

‘অন্য কিছুরটা কি? হীরের আংটি!’ বিশ্বম ঞ্চিচিয়ে উঠেছিল।

‘হীরের আংটি দেবার মুরোদ আছে তোমার?’ প্রতিমা একটু মোচড় মেরেছিল।

‘কেন নেই। তুমি চাইলেই আছে। বাড়িটা বেচে দিয়ে তোমার পেন্সনের ভাইয়ের বোয়ের আঙ্গুলে হীরের আংটি তুলে দি।’ বিশ্বম ইস্যুটাকে আর একটু ঘোরালো করে তুলল, - ‘আমার বিয়েতে তোমার বাপের বাড়ি থেকে ষট দিলেছিল সবই তো প্রায় উসুলা করে নিয়েছো আর গোটা বটিন টাকা হয়তো পাওনা আছে।’

এরপর প্রতিমা আর কথা বাড়ায় নি। মদুখ তোলা হাঁড়ি করে সংসারের কাজে লেগেছিল। বিশ্বমও, বিশেষ আমল দিতে চাননি। তোমরা সব বিয়ে করে, খাট, বালিশ, বিছানা, ফার্নিচারে বাড়ি ঠেসে ফেললে। মোটা মোটা বৌ মোটা মোটা নগদ। ভাল ভাল তত্ত্ব। টেরিলিন, টেরিকটন, ককরাকে জুতো, চকচকে চেহারা। এদিকে বিশ্বম বেচারার হাঁড়ির হাল। তার বেলার এক কাঁদনি, কে করবে। বশুরমশাই গত হয়েছেন। তিন থাকলে সবই হতো। ছেলেরা যে বার সে তার। না করলে জোর তো করা যায় না। প্রতিমার বুদ্ধি, তুমি জিজ্ঞাসি না কি? তুমি আমার রাজা। পরের খনে পোশাকি করবে কেন? বিশ্বম রোজগারে লড়ে বাও ম্যান।

বিশ্বম হিরের আংটি দিয়েছে। রেডের যে ফোঁটা এক দিক করে চাপাও। পরের

পড়লেই ধার বোকা যাবে। বণিক আর হিসেবের কামেলায় যেতে চাইল না। কোন হিসেবটা সে শেষ পর্যন্ত রাখতে পেরেছে। মধ্য মাসেই মাইনের টাকা ফৌত। বাকি ক'টা দিন, এটা ধরে টান, ওটা ধরে টান। তখন সে খেচর, ভুচর, জলচর। দাড়িতে একটা টান মেয়েই বণিকের মালুম হল ব্রেডের হিসেব মেলেনি। হেঁ হেঁ বাবা, অতই সোজা! এক চান্সে মিলে যাবে। জীবনে মেলেনি। আজ মিলবে। ছাত্রজীবনে এক দিনের জন্যেও হাজার চেষ্টা করে 'সরল কর'র উত্তর শূন্য কিম্বা এক হয়নি। সব সময় একটা বিদগ্ধটে ভণ্ডাংশ পূর্ণ-ফূর্ণ নিয়ে তলার এসে থিতোতো। দেখলেই চক্ষুস্থির। বণিকের শিক্ষকরা বলতেন, 'ছোকরার এলেম আছে। কোথা দিয়ে যে কি করে বসল। উত্তর দেখছো এক পূর্ণ দশো ব্রিগেশের ন' হাজার তিন; বলিহারি বাবা।' শেষে বণিকের এক বন্ধু পথ বাতলে দিলে। ট্রাই ইয়োর লাক। হয় শূন্য, না হয় এক। এক কাজ করবি, ধর, দশো ব্রিগেশের পাঁচশো তের হয়েছে। ঘাষড়াও মাং। পাঁচশো তেরের দশো ব্রিগিশ দিয়ে গুণ করে দে। ইঞ্জিকোরালটু ওয়ান! উত্তর যদি শূন্য না হয় ফুলমার্ক। আর যদি শূন্য করতে চাও যা হয়েছে সেই সংখ্যাটাই মাইনাস করে দাও। শূন্য কি এক? এক কি শূন্য? এইটা ঠিক করার মধ্যেই একটু ফটকাবাজী রয়ে গেল। ওটুকু রিসক্ তোমাকে নিতেই হবে। নো রিসক্ নো গেন।

ব্রেডটাকে আবার উল্টে লাগালে বণিকম। ভাবলে রিসক্ টাই নিলুম সারা জীবন গেনটা ছাই হল কি। শূন্য আর একের ঘোরপ্যাচে পড়ে ফুলমার্ক আর ভাগ্যে জুটলো না। গালের সাবান শূন্যকিরে খুঁসকির মত উড়তে শুরু করেছে। অন্যদিন আটটার মাধ্যই দ্বিতীয় পক্ষের চা এসে যায়। আজ প্রায় সাড়ে ন'টা বাজতে চলেছে। সম্বন্ধীর বিয়েতে বণিকের বাড়ির অবস্থা দেখলে মনে হবে মড়ক লেগেছে। সব কিছই এলোমেলো। দেয়ালে সব ঘুম থেকে উঠেছে। ঘরে ঘরে দোমড়ানো চটকানো বিছানা। প্রতিমার নীলাম্বরী আলনার জড়ভটি। ব্লাউজ মাটিতে লুটোচ্ছে। উঁচু গোড়ালির জুতো ধধাছানো নেই। সকালের শূন্যখানার মতো লুডলুড অবস্থা। শরীর যখন নিচ্ছে না বিয়ে বাড়িতে নাচতে কদমতে বাওয়া কেন? সকালে একবারই প্রতিমাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বাসী নারিকার মত চেহারা। চোখে অশ্রু কাকল। মুখের এখানে-ওখানে প্রাচীন দেয়ালের মত চট্ট ওঠা স্নেকআপ। পরিপাটি খোঁপা যেন খাঁতলানো পোলাপের কুড়ি। উৎসব ভোজের বোকা

এত জ্বলন্ত দেখায়, বস্কমের ধারণা ছিল না। ঠোঁটে আবার ফাটা ফাটা পানের রসের ছোপ। লাখ টাকা দিলেও ঐ ঠোঁট চুব্বনের অযোগ্য।

জ্বলন্তের কাছে ব্রেডের কোপ বসিয়ে বস্কম নিজেকে নিজেই বললে, চায়ের সেকেন্ড এডিশানের আশা ছাড়ো মানিক। সকাল থেকেই তো দফার দফায় ইন্টারভিউ। প্রতিবেশীদের, ভায়ের বৌভাতের ফিরিস্ত দেবে না, চা তৈরির মত একটা তুচ্ছ কাজে সময় নষ্ট করবে। ওঃ, খুব করেছে ভাই এই বাজারে। 'মাছ' ? এই ঢাকা ঢাকা দাগা। যত পারো খাও। এক হাজার কমলাভোগ এখনো ভাড়ারে গড়াগড়ি যাচ্ছে। সাত হাঁড়ি দৈ, হাত পড়ে নি। হিনেব নেই তো! সব ভাইয়ের দিলই তো হাওদাখানা!

তোমার মূখেই শুনলাম হাওদাখানা। বস্কুবাবুর বেলাতেই যত কপণতা। জামাই ষষ্ঠীতে একবারই তোমার কোনো এক দিলদার ভাই একটা দিশী কাপড়। কিনেছিল। কেনার সময় মনেই ছিল না বড়-জামাই প্রমাণ সাইজের একটা লোক। কিনে নিয়ে এল একটা খোকা-কাপড়। বহর বোধ হয় আর্টগির্স ইন্ডি, লম্বা আট-হাত, বড় জোর ন-হাত। বেহিসেবী ঠিকই। তবে জামাইয়ের ব্যাপারে অলওয়েজ অন দি মাইনাস সাইড। তবু প্রতিমা ভায়ের ডিফেন্ড করে গেল। খাটো জ্বলই তো ভাল গো। কত কনসিডারেট। পাছে বোন বিধবা হয় সেই ভয়ে ছোটো কাপড় দিয়েছে। বাসে ট্রোমে ওঠার সময় অসাবধানে পায়ে জড়িয়ে যাবার নো চান্স! একেই বলে সেফটি ধূতি।

বস্কম বলছিল, 'রোড' সেফটি উইকে পরে বি-বা-দী বাগে সাদা দাগের ওপর দিয়ে হেলেন্দুলে রাস্তা পার হবে, কি বল?' ~

দাড়িতে ব্রেডেতে যখন কিছুতেই বনিবনা হচ্ছে না, প্রতিমা তখন দুধের সর ভাসা এক কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করল। মেঝেতে খেবড়ে বসে বস্কম দাড়ি-মুত্তো হবার চেষ্টা করছিল।

‘ধরো ধরো!’

‘রাখো না!’

নিচু হবার কষ্টটাও মহিলা স্বীকার করতে চায় না। পারলে বস্কমের চাঁদিতেই কাপটা বসিয়ে দিলে যার। এমন কিছু ভুড়ি নেই। বরসৎ তত নয় যে কোমরে আর্থিটিস হয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। হাপরের মত একটা



শব্দ করে প্রতিমা জলভর্তি প্লাস্টিকের মগের পাশে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু চা ছলকে ডিঙে পড়ল। বাক্স একবার আড়চোখে তাকাল। চায়ের কাপ, জলের মগ, দাড়ি কামাবার বুরুশ, সেভিং ক্রিমের টিউব, চাকা, ঝোঁটো, সেফটি রেজারের খাপ, ছোটো তোয়ালে, ব্রেডের কাগজ, ফুটখানেক দূরে প্রতিমার ফুলো ফুলো পা। সায়ার ফ্রিল। পায়ের পাতায় জলের ছিটে। প্রতিমা অবাক হয়ে জিগ্যাস করলে, 'তুমি বেরোকে নাকি?'

'হুম।'

'নাই বা বেরোলে আজ!'

'অফিসটা আমার মামার বাড়ি নয়।' গলার নিচে থেকে ওপর দিকে ব্রেড চালাতে চালাতে সংক্ষিপ্ত উত্তরে বাক্স তার মনের ভাব জানিয়ে দিলে।

'মামার বাড়ি নয় সে আমিও জানি। এমনি হাজার দিন কামাই করছি। আজকে যেতে হবে না। এই বলছিলে হজম হয় নি, রাতে খুম হয় নি। চানটোন করে একটু শূরে পড়।'

'হজম হয় নি বলে চাকরিটা ভো আর হজম করতে পারি না। চাকরি ইজ চাকরি। এরপর একবারেই শূইয়ে দেবে। তখন সংসার সামলাবে কে? তুমি না তোমার ভায়েরা?'

'ভায়েরা কোন্ দৃষ্টিতে সামলাবে! তাদের সংসার নেই! তোমার সংসার তুমি সামলাবে।'

'তবে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এস না দয়া করে।'

'সকাল থেকেই বাবুর মেজাজ একেবারে সপ্তমে। বাপ বললে শালা বলছে আসছে।'

'হা আসছে। যার ছগ্রিগটা শালা তার গলা দিলে অষ্টপ্রহর হরিনামের মত শালা শালাই েরোবে।' বাক্স উত্তেজনায় সাবানমাখা বুরুশটা জলের মগের বদলে চায়ের কাপেই ডুবিয়ে দিলে। 'যাঃ শালা। চা-টাই গেল। সেই কুল পড়ার মত তাকিয়ে থেকে থেকে যদিও এক কাপ ছ্যাকরা চা জুটলো, কানের কাছে তোমার বকবকানির চোটে তাও গেল।'

'আমি আর করে দিতে পারবো না। খেতে হয় ওই চা-ই খাবে না হয় ফেলে দেবে।'

'সে আমি জানি। কাজের সময় কাজ, কাজ ফুরোলেই পাজি। যতদিন,

শালাটা আদারের প্রয়োজন ছিল, ততদিন না চাইতেই চা, না চাইতেই জল।  
কাল সম্ব্যে থেকেই তোমার অন্য মূর্তি। সব শালাকেই আমার চেনা আছে  
শালা। চায়ের ভর দেখিও না। দোকান আছে, পরসা ফেলবো কাপ কাপ চা  
খাবো, মিনিটে মিনিটে খাবো। তোমার পরোয়া করি।’

‘কে কার পরোয়া করে। আজকাল কেউ কারুর পরোয়া করে না বুদ্ধলে  
বোম্ব। দোকানে শুধু চা-ই জুটবে, অন্য কিছু জুটবে না!’

‘সব জুটবে, সব জুটবে। পরসা ফেললে সব জুটবে। মাসে একটা করে  
সোনার বালা ছাড়লে আরও অনেক কিছু জুটবে, বুদ্ধেছো? মোনোপলির  
যুগ শেষ হয়ে গেছে।’

‘তাই জোটাও। জুটিয়ে যে রাখনি তাই বা কে জানছে। তোমার  
প্রাইভেট লাইফের খবর কতটুকু জানি? অফিস অফিস করে কেন এত পাগল?  
বুঝি না ভাবো? কাজ তো যা কর জানাই আছে! তুমি একদিন না গেলে  
অফিস উঠে যাবে না। ওই কাঁধ-কাটা, পেট-কাটা, পিঠ-কাটা মেয়েছেলের  
খান্দা! সারা দিন বিনা পরসার ফাঁট-নিষ্ঠি।’

‘হ্যাঁ অফিসটাতো কুজবন, সেখানে সব রাধিকারা সেজেগুজে এই বুদ্ধো  
কেণ্টর জন্যে কদমতলায় বসে আছে। মোস্ট লাইবেলাস রিমার্ক। কোর্টে মান-  
হানির মামলা ঠুকে দেওয়া যায়।’

‘বুদ্ধো কেণ্টরদের তো সবচেয়ে বেশী ভয়। খাচ্ছ মাল। ভুবে ভুবে জল  
খায় শিবের বাবাও টের পায় না।’

বিক্রম সেফটি রেজার থেকে গম্ভীর মুখে ব্লড খুলতে খুলতে বললে,  
‘প্লিজ, প্লিজ, মেছুনীদের মত তর্ক কোরো না। বালা হয়ে গেছে, এখন আর  
আমার সঙ্গে নো রিলেশান। আবার অন্নপ্রাশন আসছে। ভয় নেই, তখন  
সংসারের ডালে বসে আবার তোমার কোকিলকণ্ঠ শোনা যাবে। তোমাকে আমার  
স্টাডি করা হয়ে গেছে। স্বার্থপরতা ইনকারনেট।’

‘বালা বালা করে দেখছি পাগল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আজই আমি  
সতুন বোয়ের হাত থেকে বালা খুলে এনে তোমার নাকের ডগায় ছুঁড়ে ফেলে  
দেব। কঙ্গুস কাঁহাকা।’

‘মুখ সাফলে। ডোন্ট ফরগেট, আই অ্যাম ইওর হাজব্যান্ড। গুরুজন।  
তুমি হিন্দু নারী। পতি পরমগুরু।’

‘সে রকম পতি হলে গুরু বলে মান্য করা যায়। তোমার মত পতির পরী

হয়েছি এই তোমার সাত পুরুষের ভাগ্য।’

‘তাই নাকি ? বেশ বুলি ফুটেছে তো। আর যে বাড়ির মেয়ে, কথাবার্তাও এর থেকে ভাল ছাঁঁর অবশ্য একপেট্টে করা যায় না। মোস্ট আর্নিসিভলাইজড্ ব্লুট।’

‘আমাকে বলছো বল, খবরদার বাড়ি তুলবে না। বাড়ি তোলা মানেই বাপ তোলা। জেনেশুনেই তো বিয়ে করেছিলে। কে বলেছিল বিয়ে করতে, না, করলেই পারতে।’

‘তাই নাকি ? মনে নেই, তোমার মা যখন হাতে ধরে, কান্নাকাটি করেছিলেন, বাবা আমার মেয়েটাকে নাও বড় ভাল মেয়ে, তোমাকে একটু ইয়েও করে।’

‘মার বয়ে গেছে তোমার হাতে ধরতে, আমারও বয়ে গেছে তোমাকে ইয়ে করতে। কত ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার ছিল। আচ্ছা আচ্ছা সব ছেলে ছিল।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ জানা আছে। হাজার টাকার ব্যারিস্টার জুটতো ?’

‘হাজার কেন, দরকার হলে বাবা পণ্ডাশ হাজার খরচ করতেন। টাকার অভাব ছিল না কি ?’

‘ও ! টাকার অভাব ছিল না ? তাহলে আমার বেলায় দায়সারা করলেন কেন চাঁদু ?’

‘তোমার মত বস্তুর জন্যে যে দাম দেওয়া উচিত তাই দিয়েছেন।’ প্রতিমা শেষ তপট্টা দেগে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফরফর করে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সাবান গোলা এককাপ চা নিয়ে ক্রেস্টফলন বাক্সে ছড়ানো দাড়ি কামাবার সামগ্রীর মধ্যে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। পেটে বস্তুর বাড়ির বদহজ্জমের মাল। মনে প্রতিমার খোঁচা। চিবুকে অস্পষ্ট দাড়ি খিচখিচ করছে অন্যদিনের মত ভেলভেট সফট্ হয়নি।

আয়নার নিজের মূখের প্রাতিফলন-এর দিকে বাক্স ফাল ফাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। আয়নার মূখ যেন বলছে : হায় বাক্স, কা তব কান্তা, কস্তে পদ্র, সংসারোহমতীব বিচিত্র কস্য ঙ্গ বা কৃত আয়ত। চোখের কোণে কালি পড়েছে বাপি, দৃষ্টি ক্রমশ সরে আসছে। আর কেন ? জয় শিবো শম্ভু, উথার দে মকান লাগা দে তাম্বু। চলো কেটো, গঙ্গা সমুদ্রনা তীর। আশার ছলনে ভুলি কি ফল লাভিলে মানিক। ছিলে এক, হয়েছো তিন। আর ঐছকাল পরে হবে চার, তার পর হয়তো পাঁচ। নিউমারিয়্যাল তুমি

বাড়তেই থাকবে। উত্তাপে বীজ তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়। এখনো সময় আছে-  
বি ক্যোরফুল ম্যান।

‘কি ভাবে গুরু?’ আসল বিক্ষম প্রশ্ন করল প্রতিফলিত বিক্ষমকে।

ক’তবে শোন একটা কাহিনী। বরাহ অবতাররূপী নারায়ণ হিরণ্যাক্ষকে  
বধ করে নিজের স্বরূপে ভুলে গেলেন। কর্মস্পলিট ওবলিভিয়ান। ছানাপোনা  
নিয়মে সংসার পেতে বসলেন। এটাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন। ওটার গা চেটে  
দিচ্ছেন। কেলেকারি কাণ্ড! দেবতাদের মাথা ঘুরে গেল। হাস্য নারায়ণ।  
হিরণ্যকে মারতে গিয়ে একি ফ্যাসাদ বাধালে প্রভু। ল্যাক্সারাস গোবেরাস অবস্থা।  
তুমি তো রিয়েল বরাহ নয়। বরাহ হয়েছিলে ফর এ গ্রেট কজ। এ দেখছি  
শ্লে বিকেম এ টাস্ক। উঠে এস প্রভু। স্বর্গে তোমার সোনার পালংক, নারায়ণ  
সেজেগুজে সালংকারা। অস্পরারা নৃত্যগীত করছে। আতর ছুড়াচ্ছে।  
আর তুমি কিনা আশ্চাকুড়ে ছানাপোনা নিয়ে ঘোঁত ঘোঁত করছ। এ কি  
সাংঘাতিক আত্মবিস্মৃতি। বড়ো বড়ো দেবতাদের দিকে আঙুল তুলে নারায়ণ  
বললেন, ‘দিস ইজ ফর ইউ। বয়োজ্যেষ্ঠ আপনারা। অনবরত একটা না একটা  
উপদ্রব তৈরি করে, আজ বরাহ, কাল নৃসিংহ, পরশু কুমার করে আমার ঘরসংসারের  
বারোটা বাজালেন। এবার সবকটার মূখে নড়ো জেদলে, খেংরে বিষ ঝেড়ে দেবো।  
মাতাল, লম্পটের দল।

দেবতাদের মূখ চুন। নারায়ণটার কি বড়ো ব্যয়ে ভীমরীতি হল। তুই  
দেবতা জন্ম ভুলে শূকর সেজে শূকরীর সঙ্গে সংসার পাতলি। ইন্ডিয়েট!

শেষকালে দেবতাদের সভায় শেষ রাতে স্থির হল, নারদকো বোলাও।

নারদ চোখ রগড়াতে রগড়াতে রাগ রাগ মূখে এসে ঢুকলো। তার শরীরট  
ছালো না।

দেবরাজ বললেন, ‘নাড়ু, নারায়ণকে যে সেভ করতে হবে। বেচারি মর্তে  
গিয়ে বেহেড হয়ে গেছে।’

নারদ বলল, ‘আমি স্যার এখন মর্তে যেতে পারবো না, আমার শরীর  
খারাপ।’

দেবরাজ বললেন, ‘তোমাকে যে একবার বরাহরূপী নারায়ণের কাছে যেতেই  
হচ্ছে।’

এই ভরটাই নারদ করেছিল। কিন্তু কী আর করা, দেবরাজের হুকুম।  
শেষে নারদ ঢেকিতে করে বরাহ অবতারের কাছে গিয়ে ল্যান্ড করল।

বললে, 'এই যে গদরু, মেমোরিটা একবারে গুলে খেয়ে বসে আছ যে।  
এটা তো তোমার আসল রূপ নয়।'

বরাহ প্রথমে আটক করতে এল। নারদ প্রস্তুত ছিল। 'নারায়ণ নারায়ণ'  
বলে বার কতক খোঁচাখুঁচি করতেই, শঙ্খ, চক্র, গদা, পশ্মধারী বেরিয়ে  
এলেন। নারদকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দোস্ত! মাই সের্ভিয়ার! কিন্তু মন্দ  
ছিলুম না হে। আহা! নিদ্রা, বেড়ে লাগছিল। বাট পাস্ট ইজ পাস্ট। চলো  
কেটে পড়ি।'

আয়নার বস্কমকে বস্কম বললে, 'খান ভানতে শিবের গীত গাইলে কেন?  
হোয়াট ইজ দি মিনিং? তুমি বলতে চাইছো, পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু,  
মহেশ কীদে তাই তো?'

'এগজ্যাক্টলি!'

'তা মাঝখানে ওইসব ভ্যানতারা করার কি দরকার ছিল? ছোটো  
দু'লাইনের স্টোরি উইথ এ বোল্ড সারমেন। নিজের আসল সত্তাটাকে হারিয়ে  
ফেলো না। বি এ কর্মমোগী, দ্যাটস অল। জড়িয়ে পোড়ো না। সেই সার  
কথা, পাকাল মাছটি হয়ে পিহলে বেড়াও, সব সময় ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা কর  
নিজের বোয়োসিতে।'

'তাইতো বলতে চেয়েছি, তোমার নিজের প্যাঁচালো, প্রভাবিত মনের  
রিফ্লেক্সানে, সত্য, হ্রোতা, দ্বাপর, কলি, পুরাণ, বর্তমান সব এক করে  
ফেলেছো। তাই তো সাধক গিয়েছে, 'তারা কতদিনে কাটবে বল এ দরুন্ত  
কালের ফাঁসি।'

বস্কম তাড়াতাড়ি আয়নাটা উপড় করে রাখলো। দার্শনিক বস্কমকে  
উল্টে চাপা না দিলে আসল বস্কমের অফিস যাওয়া মাথায় উঠবে। প্রায় দশটা  
বাজলো। বারোটা অবদি লেট অ্যাটেনডেনস চলল। তারপর অফিস যাবার  
আর কোনো মানেই হয় না। এদিকে পেটের যে রকম গুমোট অবস্থা! দ্বিতীয়  
কাপ চা-টা পেটে পড়লে হয়তো একটু কাজ হত। প্রতিমাকে খোঁপিয়ে দিয়েছে,  
এখন কিছুদিন বস্কম একঘরে; ধোপা নাপিত সব বন্ধ। তোমার তালে তাল  
দিয়ে চলতে হবে, তাই না। তুমি আমার মানি প্ল্যান্ট দেখেছো, তাই না। নাড়া  
দিলেই টাকা পড়বে। ওঃ, সোনার বালা! বস্কম মাথাটা এমনভাবে  
ঝাঁকালো, যেন তার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। তার নিজের বিয়ের  
আংটির সোনাটা তো গেছেই, প্লাস আরো কয়েক পল্লসো সোনা, প্লাস

মজুদরি। বিষ্ণুর দোকানে আড়াইশো টাকা ধার। যতদিন না দিতে পারছে আসা যাওয়ার পথে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকবে।

ঘরের বাইরে প্রতিমার এলাকায় পা দিয়েই বস্কিমের ক্ষোভটা আবার উথলে উঠল। বিয়ে করে ঘোড়ার ডিম তার লাভটা কি হয়েছে। এর চেয়ে ব্যাচেলার থাকলে কত আরামে থাকতো। তাড়াহুড়ো না করলে আর একটু বাড়িয়ে, দেখে শুনবে বৌ আনা যেত। আর একটু চোখা নাক, টানা চোখ, ধারালো মুখ, আর একটু ভাল ফিগার, মৃদুভাষী, নম্র, সম-পিতা, ছোটো নিট পারিবার। এ এক ডাকা হাঁকা ধ্যান্ডে জিনিস। যত পুরোনো হচ্ছে তত আওয়াজ বাড়ছে।

বস্কিম যেন পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী, ক্ষতিবিক্ষত মানুষ। বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বস্কিম বেশ জোরে জোরে বলল, ‘যত সব থার্ড ক্লাশ ব্যাপার। প্রেজেন্টেশানের লোভে কে’টিয়ে নিমন্ত্রণ করেছে আর যত সব পচা জিনিস গিলিয়ে মানুষ মারার তাল করছে। দেশের শত্রু, মার্ডারার!’

‘মুখ সামলে!’ প্রতিমা রান্নাঘর থেকে ফোঁস করে উঠলো। বস্কিম এইটাই চাইছিল। চেঁচামেচি বরে অন্তত মনটা খোলসা হোক, ‘মুখ সামলে কি। ফ্যাঙ্ক্ট ইজ ফ্যাঙ্ক্ট। এত জায়গায় নেমন্তন্ন খেয়েছি এ রকম পেটের অবস্থা কখন হয় নি। নেভার!’

‘মাতা না রেখে খেলে ওই রকমই হবে। আমরাও তো খেয়েছি। আমরা-দের কিছু হল না, ওনারই সব হয়ে গেল।’

‘তোমার যে বাপের বাড়ি! বাপের বাড়ির সব কিছু অমৃত সমান।’

‘কোনটা পচা ছিল—’

‘প্রথম তেল। ওটা তেল নয়, ডিজেল। মাছগুলো মর্গ থেকে এনেছে। ওই বোগড়া চালে কোনো শিক্ষিত লোক ফ্রায়েড রাইস করে না। মাংস ধাপা থেকে তোলা। মিষ্টি কাগজের মণ্ড থেকে তৈরি। পেটে ওই মালের খাবা সামলাতেও আরো দুশো যাবে। হাজার টাকার বালা দুশো টাকার ঠেলা। স্বশ্রমবান্ধির নিকুচি করেছে।’ বদরুশ ঝাড়তে ঝাড়তে বেশ জুত-সই করে বস্কিম আক্রমণ শানিয়ে নিলে।

‘ও, বলার দামটা মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। আড়াইশো থেকে আথ ঘণ্টার মধ্যে হাজারে উঠলো।’

‘আজ্ঞে না, ঘর থেকে যে সোনাটা গেল তার দামটা তখন ধরা হয়নি।’

‘সেটার আবার দাম কি? ও সোনা তো ও বাড়িরই। মাছের তেলে মাছ ভাজা।’

‘বাঃ, ভাল যুক্তি! তার মানে তুমি বলতে চাইছো, বিয়ের সময় যা ছিটে ফোঁটা দিয়েছিল সব এইভাবেই উসুলা করে নেবে?’

‘উসুলা করে নেবে কেন? তোমার কেনার ক্ষমতা থাকলে কিনে দাও। নেই বলেই এই অবস্থা। অন্য কোনো বোঁ হলে এইভাবে ঘরের সোনা দিত বার করে? নেহাত আমার মত বোঁ পেয়েছিলে তাই বতের গলে?’

‘আহা কি উদারতা! আমার কোনো রিলেটিভের বিয়ে হলে দিতে?’

‘রামঃ, তোমার রিলেটিভরা আমাকে কি দিয়েছে, যে আমি দেবো। যারা দেয় তাদেরই গায়ে গায়ে শোধ করে দিতে হয়। একেই বলে শোধ বোধ। কিছন্ন নিলেই কিছন্ন দিতে হয়।’

‘সমান সমান হতে আর কত বাকি?’

‘ওঃ, এখনো অনেক বাকি? সমান সমান হতে সব ভাই ফুরিয়ে যাবে। আর তো মাত্র দু ভাই বাকি। এখনো এই চার চার আট গাছা চুড়ি আছে। গলার হার আছে। আমার আংটিটা আছে। আইবুড়ো বেলাব দুল আছে। নাকছাবি আছে।’

‘আরো আছে। একটা পালিশওয়াটা খাট আছে, ছেঁড়া তোশক আছে, দাগ লাগা লেপ আছে, আমার বিয়ের পোকাফুরটো সিমেকের পাঞ্জাবিটা আছে, জোড়ের কাপড় আছে, একটা জলচৌকি আছে, স্টিলের ট্রাংক আছে, কয়েকটা কাঁসার বাসন আছে, আর আছে তোমার হাতঘড়িটা। ছেলেমেয়ে আধাআধি ভাগ। হাফ আমার, হাফ তোমার। তোমার হাফটা শ্বশুরবাড়িরই প্রাপ্য।’

‘ওদের অতটা ছোটলোক ভেবে না। তোমার মত অত চুলচেরা হিসেবে ওরা চলে না।’

‘খুব চলে। তা না হলে তোমার এই রকম স্বভাব হয়। এ বাড়ির অশ্বেক মালই তো ও বাড়িতে পাচার। ওদের হল সেই থিম্মোরী—জমি যার ফসল তার। আমি হলুম ভাগ চাষী, তোমার সয়েলে বারো বছর চাষ করছি। ফসল সব ওই গোলায়! আমার ভাগে বুড়ো আঙুল। একটা হিসেব তোমাদের হিসেব থেকে বাদ পড়ে গেছে। আর সেই হিসেবের বেলায় জেনে শুনে অশ্ব হয়ে থাকাই ভাল।’

প্রতিমা ঘেস ঘেস করে লাউ কাটতে কাটতে বললে, 'সেটা কি ? আমার হিসেবে ওদের এখনো অনেক পাওনা ।'

বিশ্বকম মাথায় তেল মাখতে মাখতে বলল, 'এই যে বারোটি বছর তোমাকে ভাত কাপড়ে পুর্বাছি, তার কস্টটি তো বাছাধন করে দেখোনি । ডোল এক সের চাল, এক চাকা মাছ, আলু-পটল, কপি-মুলো কচু-ধেঁচু, গাজর-মাজর চা-চিনি ডাল-দুধ, শাড়ি-জুতো, সিনেমা-থ্যাটার । এসব দেবোত্তর প্রপাটি থেকে হচ্ছে, না গোরী সেনের ফাইনানসে !'

'তার বদলে সার্ভিস যা পাচ্ছ চার ডবল ।'

'আরে যাও, মাসে একশো টাকা দিয়ে একটা মেয়েছেলে রাখলে টোরেন্ট ফোর আওয়ার্স আমার সেবা করতো । তাকে হুকুম করা চলত । তটস্থ হয়ে থাকতো । তোমার মত মাথায় চড়ে বসত না । আমার ব্রাডার লিক করে দিত না । যে নৌকোয় চড়ে নদী পার হচ্ছে সেটার তলা ফাঁসাবার জন্যে আকুল-বিকুল করত না । একে কি বলে জানো, সাবোতাজ, অন্তর্ঘাত ।'

প্রতিমা আধখানা লাউ ধমাস করে আনাজ রাখার চুবাড়িতে ফেলে, উহু উহু করে উঠলো । বিশ্বকম আড় চোখে দেখল । আঙুলের মাথা থেকে বাঁজিয়ে রঙ পড়ছে । প্রতিমা উঠে দাঁড়াল । কয়েক ফোঁটা গাঢ় লাল রক্ত মেকোতে পড়েছে । কুঁচো কুঁচো সাদা নরম লাউ জায়গায় জায়গায় লাল । বিশ্বকম আঙুলটার দিকে কুঁচো পড়ে বলল, 'কেটেছো তো ! একেবারে অকর্মণ্য । ওয়াথ'লেস টু দি প্যাওয়ার ইনিফিনিটি ।'

'একেবারে অকর্মণ্য ! সকাল থেকে কানের কাছে বকবক করে মাথা খারাপ করে দিলে ! কিনা একটা বালা !'

প্রতিমার চোখে জল ।

বিশ্বকম আবার অশ্রুজলে বড়ই কাতর হয়ে পড়ে । রক্তের উধুঁচাপ হাঁত মধ্যেই নামতে শুরুর করেছে । আঙুলটার জন্যে এখুঁনি কিছুর দরকার । অন্তত মানবিক কারণে । বারো বছরের জীবন-সঙ্গিনী । রাগ করে কতক্ষণ কথার চাবুক মারা যায় ? বিশ্বকম বললে, দাঁড়াও দাঁড়াও, ডেটল দিয়ে দি । আগে সাবান দিয়ে ধুই ।'

'ধাক ধাক, তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না । আমার জন্যে একেই দেউলে হয়ে গেছো । আমি মরলেই তো তোমার জ্বালা জুড়োর ।'

প্রতিমা হন হন করে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল । বিশ্বকম মনে মনে



বললে, মানুষের মৃত্যু যদি অতই সোজা হত। কত বড় বড় দুর্ঘটনার ছিন্ন ভিন্ন মানুষকে জোড়া লাগিয়ে বাঁচিয়ে দিচ্ছে, এ তো সামান্য আঙুলটা একটু উসকে গেছে, সন্যোগ পেয়ে গেছে এইটাকেই এখন মূলধন করে একচোট আপারহ্যাণ্ড নেবে। তারপর ভাবলো দোষ কি? সে যদি বালা নিয়ে সারা সকাল মাতামাতি করতে পারে, প্রতিমা কাটা আঙুল নিয়ে লড়ে যাবে, এ তো খুব স্বাভাবিক।

বিশ্বকম সাবান দিয়ে তেল হাত ধুয়ে তাক থেকে ডেটেলের শিশি নিয়ে শোবার ঘরে যখন এসে ঢুকলো প্রতিমা তখন একথানা ন্যাকড়া দিয়ে বাঁ হাতে ডান হাতের কাটা আঙুলটা জড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। ন্যাকড়াটা ইতিমধ্যে রক্তে লাল হয়ে গেছে। পাকা কলার মত ঠোসা ঠোসা আঙুলে কি কম রক্ত! বিশ্বকম বললে, ‘দাঁড়াও দাঁড়াও, কি একটা যা-তা ন্যাকড়া ডেটেল না দিয়েই আঙুলে জড়াচ্ছ। এখুনি বিষিয়ে উঠবে যে।’

‘ওঠে উঠবে, আমার উঠবে, তোমার তাতে কি?’

প্রতিমার কথায় চাবুক খাওয়া লোকের মত বিশ্বকম টান টান হয়ে গেল। ইস বচনের ছিরি দেখ। হারবো বললেই হারে গা, খামচে খুমচে মারেগা বিশ্বকম হুঁ হুঁ করে শীতল হাসির ঢেউ তুলে বললে, ‘আমার কি, তাই না? একটা কিছুর হলে তখন কোন সম্বন্ধী দেখবে? কোনো শালা আসবে না। এই শমাক্ষেই ডাক্তার বদ্যি করতে হবে চাঁদু।’

‘তোমাকে আর কিছুর করতে হবে না। তোমার পয়সা ব্যাংকে ডিম পাড়ুক। আমার জন্যে অনেক করেছে। আর করতে হবে না। আমার লজ্জা নেই তাই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি। আমার বাবা বেঁচে থাকলে এই হাল হত? জেনেই গেছ আমার তো কোনো শাবার জারগা নেই, তাই অণ্ট প্রহর ধামসে যাচ্ছ।’ প্রতিমা বিশ্বকমের দিকে পেছন কিরে ফুঁলে ফুঁলে কাদতে লাগল।

বিশ্বকম মনে মনে বললে, কামা তোমাদের হাতখরা। সারা জীবনের অশ্রু জল ধরে রাখতে পারলে ভারতবর্ষে সেচসেবিত এলাকা আরো বেড়ে যেত। না, তা কি করে হয়। চোখের জল তো আবার স্যালাইন। সামুদ্রিক মাছের চাষ হতে পারতো। হাঙর কিংবা তিমি লাট খেত। তুলো ডেটলে চুবিয়ে এগিরে গেল, ‘অফিসের বারোটা বেজে গেল। আচ্ছা ফাঁপরে পড়ছি।’

বিশ্বকম তুলো আর শিশি হাতে প্রতিমার পেছন থেকে সামনে এগিরে

গেল। উত্তরটা ঠিকই দিল। আঙুল কাটতে পারে, তা বলে যা খুশি তাই বলে পার পেয়ে যাবে তা তো হয় না। বণ্ডিকম বলল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার বাবা বেঁচে থাকলে সব হত। তিনি থাকলে উনুন ধরিয়ে দিতেন কারণ মেয়ে বণ্ট ব্যবহার করতে জানে না। তিনি বেঁচে থাকলে স্বর্গে’ অসরারা নৃত্যগীত করত, দুন্দুভি বাজাত আর আকাশ থেকে তাক করে এই বাড়ির ওপর পুষ্প বণ্ট করত। দেখি আঙুল থেকে তোমার ন্যাস্টি ন্যাকড়াটা সরেও।’

প্রতিমা বড় দোকানের শো-কেসের ঘূর্ণায়মান প্রদর্শনী চাকতির মত কিস্বা আহলাদী পদতুলের মত আবার ঘুরে গেল। তুলো হাতে ভাষাচাক্যাক্য বণ্ডিকম আবার পেছনে সরে গেল। বণ্ডিকম ছাড়বে না। অ্যান্টিসেপটিক লোশন লাগিয়ে নিজে হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে স্বামীর কতব্য সে করবেই। এমন কোনো লুপ হোলস সে রাখবে না যার ফাঁক দিয়ে বিবেক বেরিয়ে এসে বলবে, নির্দয়, হৃদয়হীন, পাষাণ্ড। প্রতিমাকেও পরে খোঁচা মারার সন্ধান সে দেবে না। বণ্ডিকম চক্রাকারে ঘুরে আবার সামনে গেল। প্রতিমা আবার ঘুরে গেল। তিনশো ষাট ডিগ্রির খেলা চলেছে। বাড়ির কাঁটাও এদিকে ঘুরছে। শেষে আর কোনো উপায় না দেখে বণ্ডিকম খপ করে প্রতিবার হাত চেপে ধরল, ‘চালাকি পেয়েছো, না। বড়ী বয়েসে ইয়ারকি হচ্ছে? জানো আমার সময়ের দাম আছে, অফিস বেরোতে হবে।’

প্রতিমা হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, ‘কে তোমাকে আটকে রেখেছে। যাও না অফিসে, চলে গেলেই পারো।’

‘চলে গেলেই পারো।’ বণ্ডিকম ভেঙে উঠলো, ‘আহলাদী পদতুলের মত কোমর দুলায়ে দুলায়ে না ঘুরে আঙুলে ওষুধটা লাগাতে দিলেই পারো।’

প্রতিমা প্রাণপণে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, ‘দখা করে আমার হাতে ওষুধ লাগাবার চেষ্টা করে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হবে না। আমার চরকার আমিই তেল দেবো।’

‘ইট ইজ মাই চরকা। তেল আমাকেই দিতে হবে। বারো বছরেই ইজমেন্ট রাইট। জমির মালিক আমি। ইউ আর মাই জমিদারী।’ বণ্ডিকম ভীষণ ক্ষেপে গেছে। ওষুধ লাগাবেই।

প্রতিমা আপ্রাণ চেষ্টা করে খামচা-খামাচি করেও যখন দেখলে বণ্ডিকমের শক্ত মূঠো আলগা হচ্ছে না তখন একেবারেই প্রাকৃতিক কারণদ্বারা খ্যাক করে

বাঁকমের হাতে কামড় বসিয়ে দিলে। খুব জোরে নয়, অনেকটা কুকুরের আদুরে কামড় কিংবা 'লাভ বাইটে'র মত। সন্দের সময় এই কামড়ের আলাদা অর্থ হতে পারত। ঝগড়ার সময় এই সামান্য কুটুকুটু কামড়েরও অন্য মানে। বাঁকম হাত আলগা তো করলই না, বরং আরো জোরে চেপে ধরে বললে—

‘অতই সোজা না। কামড়াও, যত পার কামড়াও, তলপেটে ষোলটা ইন-জেকসন নেবো, সেও তি আচ্ছা, তবু দেখবো কতটা নীচে তুমি নামতে পার। যেমন কুকুর তেমনি মৃগদূর। ওই দাঁত আমি হাঁ করিয়ে উকো দিচ্ছে ঘষে ঘষে ফোকলা করে দেবো। কতমড় করে মাংসের হাড় চিবোনো জন্মের মত ঘুঁচিয়ে দেবো।’

প্রতিমা এতখানি হাঁ করে বাঁকমের হাতটা ধরেছিল ঠিকই, তবে সেটা যতটা ভয় দেখাবার জন্যে ততটা কাগড়াবার জন্যে নয়।

বাঁকমের মনে হাঁচ্ছিল ফোকলা দিদিমা যেন তার হাতটা পাগলাচ্ছে। প্রতিমারও হয়েছে মহাবিপদ। কতক্ষণ কামড়ে বসে থাকবে। সে তো আর কচ্ছপ নয় যে মেঘ ডাকলে তবে ছাড়বে। বাঁকম ডেডলক অবস্থাটা কাটাবার জন্যে বললে, ‘যত চাপ পড়বে তত রক্ত বেশী বেরোবে। ছেলেমানুষী করার ব্যেস আর আমাদের নেই। মাথা ঠাণ্ডা কর। যে কোনো এক পক্ষকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। যেহেতু তুমি আহত সেই হেতু পরাজয় তোমারই। আমি তোমার ভাল করতে এসেছি, ভালরই জয় হয়। ধর্ম, নাটকে, উপন্যাসে, সর্বত্রই এক বিধান।’

প্রতিমা বাধ্য হয়েছে পাগলাপাগলি বন্ধ করে মৃদু সরিয়ে নিল। মৃদের লালান বাঁকমের হাত ভিজ়ে। পরাজিত প্রতিমা খাটের ওপর ধড়াস করে শুয়ে পড়ল। এ ছাড়া কি আর করবে। গো-হারান হেরেছে। বাঁকম ওষুধ লাগিয়ে দিল। ইস, বেশ কেটেছে! কয়েক দিন জ্বরদন্ত ভুগবে। আলমারি খুলে ফাস্ট’এড বক্স থেকে ব্যাশেডজ বার করে বাঁকম দক্ষহাতে আঙুলে জড়িয়ে দিল। আঙুলটা বেগ গোদা হয়েছে। নাও এখন লাগেজের মত পড়ে থাকো। আমার কাজ শেষ। এ টি এস নিতে হবে নাকি? লম্বা বণ্টির কাটান কি আর এমন হতে পারে। হলে বন্ধুতে হবে ভাগ্য।

বাঁকম বাথরুমে ঢুকে পড়ল। পেটটাকে এখন খোঁচাখুঁচি করতে হবে। সলিড পাথরের মত হয়ে আছে। নাঃ, ব্যেস সত্যিই বাড়ছে। সামান্য ষাওয়াও আর সহ্য হচ্ছে না। তলপেটে গোটা কত ঘুঁসি ঢালাল। প্যাত প্যাক করে

বার কতক টিপলো। নাঃ পেটও অভিমান করে বসে আছে। নিজের পেটেই কথা শুনছে না। ডিসওর্ডিডিয়েন্ট। পরের বাড়ির মেয়ে কথা শুনবে! গ্রেট এক্সপেকটেশন বন্ধ। গুমোট পেট নিষে কি আর রাস্তায় বেরোনো যায়। বাড়িতে বসে থাকারও উপায় নেই। আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। যাক চানটাতো করা যাক।

স্নান সেরে বস্কম ঢকঢক করে কয়েক গেলাস জল খেল। ছ'চামচ ভাস্কর লবণ। একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো। বাবুদা সব বিয়ে করবেন আর ছাইপাশ খাইয়ে মানুষের সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে তুলবেন। অনেকটা সেই ইললিসিট লিকার খাবার মত কেস। না খেলে বলবে বড়লোকি চাল হয়েছে শালার। এইবার আসছে পরপর অম্প্রাশন। বড়বাজারে স্টিলের বাসনের দোকান ত বাঁধাই আছে। আজকাল দোকানে গিয়ে দাঁড়ালেই কাজ হয়ে যায়। মালিক জানে লোকে কি চায়। একটা ছোটো থালা, পুচকে গেলাস আর বাটি। প্যাক করকে দাও। সোনালী রোলক্স রিবনের বাহার। প্যাকিং চার্জ একস্ট্রা টু-রুপিজ বাবুদা। আবার সেই লুচি, ঘি-ভাত, আঁশটে মাছ, এঁচোড়, টেনে ছেঁড়া যায় না মাংস, মাছ, দই, বোঁদে, পাঁপড়, চার্টনি, রসগোল্লা! ওয়াক!

খাবার কথা মনে হতেই গা গুলিয়ে উঠেছে। ওয়াক। চার গেলাস জল পেটে ঢেটে খেলিয়ে দিচ্ছে। তার উপর ভাসমান ভাস্কর লবণ। হিংয়ের ঢেঁকুর উঠছে। সংসারেও মিউটিনি। পেটেও মিউটিনি। বড় এক গেলাস লেবুর জল খেতে পারলে হত। কে করে দেবে! বিদ্রোহী প্রতিমার আঙুল ফুলে কলাগাছ। তিনি এখন নতুন চাল চালার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। যত বেলা বাড়ছে বস্কমচন্দ্র ততই কাবু হয়ে পড়ছে। ঘন ঘন ঢেঁকুর। ওয়াক ওয়াক করে সব ওয়াক আউট করে পেটের অ্যাসেমরি থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাথরুম ঘর, ঘর বাথরুম, ঘণ্টাখানেক এই চলল। ওঃ আই অ্যাম টেরিবল সিক মাই লর্ড। প্রতিমার চোখের সামনে দিয়ে বস্কমের আসা যাওয়া। সকালের মত টান টান বুক নেই। গলা দিয়ে চিঁ চিঁ শব্দ বেরোচ্ছে। হায় ভগবান ক্রমশই কুঁজো হয়ে আসছি। অদ্যই শেষ রজনী মাগো।

ফন্ ফন্ করে পাখা ঘুরছে। বাঁকম খাটে চিংপাত। ঘণ্টাখানেক হিসেব রাখতে পেরেছিল। তুমি আঙুল কেটে টেক্সা মারতে চেয়েছিলে। আমি মিনি কলেরা দিয়ে স্কেয়ার করে বেরিয়ে গেলুম। একবারে দহ ছেড়ে বেরিয়ে যেও না মানিক। অন্তর্বাক্ষমকে বাঁকমের রিকোয়েস্ট। দিন ক্রমশ বাদুড়ের ডানার মত ঝুল আসছে। প্রতিমা আশেপাশে আছে। কাছাকাছি নেই। দৃষ্ণনের মাঝখানে সোনার বালার গোল ফোকর। স্বর্ণ ব্যবধান। শেষের সৈদিন অতি ভয়ঙ্কর। পা দ্রুতো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ও খাট আর বিছানাটাতো স্বপ্নের বাড়ির সম্পত্তি। এর উপর মরাটাতো ঠিক হবে না। প্রভিডেন্ট ফ্যান্ডের টাকা থেকে দাম কেটে নেবে। নেমে শুনই বাবা।

বাঁকম মেঝেতে সত্তরঞ্জির উপর নেমে এল। এটা নিজের পরসার ফেনা। এখানে সে বুক ফুলিয়ে, তাল ঠুকে মরতে পারে। দেহটাও আমার, সত্তরঞ্জিটাও আমার। কোনো শ্যালকের সম্পত্তি নয়। মেঝেতে শুয়ে শ্রমের দৈহিক আরাম না হলেও বেশ মানসিক আরাম বোধ করল। ভেতর থেকে তার অন্তরাড়া বলে উঠল, 'আরে ইয়ার, তলায় শক্ত জমি মাথার ওপর নীল আকাশ, ব্যাস্' এর চেয়ে ভাল আর কি আছে। সকাল থেকেই তো পবন আহার করে পওহারী। এ যাত্রা যদি বেঁচে যাও এই শ্রম শরীরের ওপরই আগামী বিশুদ্ধ জীবনের ফাউন্ডেশান স্টোন প্যাঁ পোঁ প্যাপর পোঁ করে লে কর। জীবনটাকে ওই প্রতিমা-বালা, বিয়ে, ভাত, প্রাণের বরবাদ করো না। আমাকে বেরোতে দাও ফাটতে দাও, ফাটতে দাও, গ্রেট গ্রেটার, গ্রেটেস্ট হতে দাও।

'তুমি হঠাৎ নেমে শুলে কেন?' প্রায় দশ ঘণ্টা পরে প্রতিমার কণ্ঠে যেন একটু দরদ।

'হুঁউ হুঁ আর কি? আমার আর হবে না দেরি, আমি শুনছি ওই শুনছি ওই বাজে বাজে তোমার ভেরী। আমি শুনতে পাচ্ছি, ডাক এসেছে, চলে আস।' কুঁই কুঁই কবে বললে।

প্রতিমা আকুল হয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হাত বাঁকমের কপালে রাখল। বাঁকম তখন বলছে, 'তাই তো 'নেমে এলুম। খাট আর বিছানাটাতো আমার নয় ওতো চলে যাবে। এখান থেকে বের করার সন্নিবেশ। সত্তরঞ্জিতে রোল করে খাটেরা লাদাই করে দাও।'

প্রতিমা নাকটানার মত একটু শব্দ করল। হাতটা মাথার চূলে স্থির।

বস্কিম আর একটু অ্যাড করল, 'বাড়িটা রইল, কিছু টাকাও রইল ! অবশ্য তোমার ভোগে লাগবে না । তোমার ভায়েরা দখল করে তোমাকে একটা লাঠি মারবে । হেলেটা আর মেমোটর জন্মেই ভাবনা । মামাদের হেলেমেয়ে ধরে ফাইফলমাস খেটে পাতকুড়োনো হয়তো একটু জুটবে । বড় হলে ফুটপাত গতি । হা, হা, হা ভগবান ।'

বস্কিমের কথা বলতে প্রকৃতই কষ্ট হচ্ছে । গলা শুষ্কিয়ে যাচ্ছে । তা না হলে ভবিষ্যতের হ্যাঁ আরো গাঢ় রঙে রেখায় অঁকার ইচ্ছে ছিল । প্রতিমা ইতিমধ্যে বেশ বারকতক ফোঁদ ফোঁস করেছে । বস্কিম উপড় হয়ে একপাশে ঘাড় কাত করে চোখ বুঁজিয়ে শুয়ে আছে । খাও, মাঝরাত্রে ভ্রাতার যৌভাতে হাঁড়ি হাঁড়ি দই খাও । সর্দি হবে না ? নিমোনিয়া হবে । এখন আর কি ? আহলাদের সময় বাপের বাড়ি ; অসুস্থ, নোবা, ডাঙার, বন্দি স্বশ্রুরবাড়ি । তখন বস্কিম আছে, গামছা আছে, বস্কিমের ঘাড় আছে, শাশুড়ী আছে । প্রতিমার সর্দি না ; আসলে সে অল্প অল্প কাঁদছে । মনে দুঃখ হয়েছে । বস্কিম একটু মৃত্যু-টুত্মের কথা বলেছে, সাদা থান, শাঁখাহীন হাত, সিঁদুরশূন্য সিঁথি, মাছশূন্য দিন ! আহা বড় কষ্ট গো । পংকু হয়েও ঘোষালবাবুর মত পড়ে থাকো বেডসোর নিয়ে ।

সেবা টেবা আমার ধাতে নেই । সকাল সন্ধ্য দু'মুঠো গিলিয়ে দেবো । তারপর মার দেওরা জর্দি আর দু' খিলি পান মুখে ঠুসে সিনেমা, যাত্রা, ফাল্লা, ফালা ।

প্রতিমা কানের কাছে মুখ এনে জিগ্যোস করল, 'এইবার একটু খোল খাবে ?'

'খোল ? খোল আর মুখে কেন, এতকাল তো মাথাতেই ঢেলে এসেছো ।'

'আঃ, এই অসুস্থ অবস্থায় বাঁকা বাঁকা কথা বলতে নেই । শরীরে আর কিছু নেই । কয়েকদিন একটু শক্তি করে নাও, তারপর আবার হবে ।'

'ভুতের মুখে রাম নাম । এ যাত্রা যদি টিকে যাই, সন্দেহ আছে, তাহলে সাফ বলে রাখছি তোমার বাপের বাড়িতে জল পর্যন্ত খাবো না । সব বিষাক্ত ; তুমি যাবে, সন্দেহের বাস্ক আর উপহারের মোড়কটি নামাবে । থাকতে হয় থাকবে তুমি । আমি আর ওর মধ্যে নেই । তবে একটা সর্বিধে, এমনি ওঁরা কখনই আদর করে ডাকেন না, এই বিশ্বে পালা পার্বণেই জামাইয়ের খোঁজ পড়ে । লাটের টাকার লাটের মালের আদর হয়ে যায় । উড়ো ঠে গোবিন্দায় নমঃ ।'

প্রতিমার দাঁত কিড়মিড় করছিল। অন্য সময় হলে লেগে যেত। কোনো রকমে সামলে নিল। সামলে নিয়ে বললে, ‘বালার শোকটা ভোলবার চেষ্টা কর। বালার ডবল আমি বাগিয়ে এনেছি। পরে হিসেব করে দেখো। প্রণামীর কাপড়, যেটা আমাকে দিয়েছে, ষাট সত্তর টাকা হবে। কালকে প্রেজেন্টেশান যা পোয়ে-ছিল তার থেকে দুটো শাড়ি, একটা লেডিজ রিস্টওয়াচ কেপে এনেছি। তাহলে ষাট, আর ষাট আর ষাট কত হল?’

‘একশো আশি।’

‘হ্যাঁ, একশো আশি আর ঘড়িটা ধর দুশো তা হলে তিনশো অর্থাৎ তিনশো আশি। ছাড়া বিয়ের আগে ছোড়দা এমনি দেড়শো দিয়েছিল।’

‘সেটা তো আবার মেজদার বাঃ শোখে চলে গেল।’

‘ও হ্যাঁ, তাহলে ফোন্ডিং ছাড়াটা ধরো, ষাট সত্তর হবে। তারপর একটা বড় স্টেনলেস স্টিলের থালা দাব বাটি আটকে বেখেছি। ওগুলোও দেবো না।’

বিক্রমের ভেতরে যেন একটু শান্তি আসছে। দুর্বল ভাবটা যেন কেটে যাচ্ছে। মাথাটা ঘেঁষে থেকে অল্প এমটু তুলে দেবল, না, তেমন বৌ করে ঘনুয়ে গেল না।

প্রতিমা বললে, ‘আমাকে কি তুমি এতোই ক্যাবলা ভাবো। তুমি কি ভাবো আমি মাল চিনি না। তোমার সব শালাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। এক হাতে যেমন দিচ্ছি, আর এক হাতে তেমনি আদায় করে নিচ্ছি। দু’চার টাকা এদিক-ওদিক হতে পারে। তাও ঠিক উসুদ করে নেবো। মার পণ্ডরস্কের আংটিটা বাগাবার তালে আছি। আর এবার থেকে বলে রাখছি, ভাতে স্টেনলেস নয়, স্নেফ ওই অ্যালুমিনিয়াম।’

বিক্রম উপড় থেকে চিং হয়ে বলল, ‘কাঁচকলা দিয়ে ন্যাংলা সিঙ্গি মাছের ঝোল আর সরু চালের ভাত খাবো।’

প্রতিমা বললে, ‘রাত ন’টার সময় ন্যাংলা আর পাবে কোথায়? এখন চিড়ে দই দিয়ে চটকে খাও। কাল সকালে দাম বন্ধে মাছের ব্যবস্থা হবে। তা না হলে স্নেফ গাঁদাল পাতার পাতলা ঝোল।’

বিক্রম ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। মন বললে, ‘এ ওয়ান হাজ্জ মালটিসাইডস।’

নগেন। আমাদের বন্ধু  
নগেন। অ্যামিবারোসিস এবং  
জিয়ার্ডিয়ারোসিসের রুগী। অব-  
চ্ছিন্নভাবে আজ সতেরো-  
আঠারো বছর ধরে ভুগছে।  
ওষুধ বাদ্য অনেক করেছে  
কিছুতেই কিছু হয় নি।  
ডাক্তাররা বলেছেন, এ রোগ  
সারার নয়। বিশেষ করে  
নগেনের মত অসংযমী ছেলের।  
খাওয়া-দাওয়ার কোন ধরাকাট  
নেই, মূহূর্মূহঃ চা, ভাজা  
কিছু না খেলেই ভাল হয়।  
অথচ ঘিয়ে ভাজা তেলে ভাজার  
সঙ্গে তার যেন নাড়ীর  
যোগ। নগেনকে দেখলে  
ডাক্তাররা এখন বিরক্তই হন।  
চিকিৎসা করাতে করাতে  
নগেন নিজেই এখন ডাক্তার।  
পেটের কোন অবস্থায় কোন  
বাড়ি ক'টা, ক'দিন খেতে হবে  
নগেনের সব জানা। মাঝে মাঝে



## ডেলিভারি

সে খুব সাবধানী আবার কখন ভীষণ বেপরোয়া।

নগেনের বর্তমানে সমস্যা একটাই। সে বেগধারণ করতে পারে না।  
অবশ্য নগেনের দাদু সংস্কৃতে বলতেন—ন বেগ ধারয়েত ধীমনে এবং  
শ্লোকের নির্দেশ মেনে তিনি যে কোনো জায়গায় নির্বিবাদে বসে যেতে পারতেন।  
বসুধৈব কুটুম্বকম্ ভেবে যে কোনো বাড়িতেও ঢুকে গিয়ে আসল কাজটি  
হাসিহাসি মূখে সেয়ে নেবার মত ক্ষমতা ও সাহস রাখতেন। বৃদ্ধের পক্ষে  
যা সম্ভব, যুবক এবং জাজুক নগেনের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং



নগেন পকেটে একটি নিজের তৈরী গাইড নিয়ে ঘুরতো। প্রচণ্ড বেগে যখন বিহবল তখন তার চিন্তার শক্তিও থাকে না। সেই সময় এই ধরনের গাইড ভীষণ কাজে লাগে। গাইডটাই তার রক্ষাকবচ, আশা ভরসা, অর্ধবিশেষ।

গাইডে আছে, কলকাতার কোন অঞ্চলে বেগপারণ করতে না পারলে চট করে কোথায় ঢুকে কাজটি সেরে নেওয়া চলে। লিস্টে সিনেমা হল আছে যেখানে টিকেট ছাড়াই ল্যাম্পের কাছে ঢোকা যায়। আছে বনেজ, অফিস, পরিচিত লোকের বাড়ি। নগেনের মত রুগীর অভাব কলকাতায় নেই। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও অনেক আছে। ফলে একটা আনন্দের জিহ্বা সংস্থার মত গড়ে উঠেছে, যার নাম দেওয়া যেতে পারে—আমিষিক আনন্দের সন্থা অফ কলকাতা মেট্রোপোলিস, সংক্ষেপে ‘এ এ সি এন।’ সদস্যদের বিভিন্ন সময়ের আলোচনায় এবং পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের ফাঁকে ফাঁকে নগেনের গাইড পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। নগেন জানতো না যে কলকাতার সমস্ত পেট্রল পাম্পের সঙ্গে একটি করে ল্যাম্প যুক্ত আছে। নগেনের এক বন্ধুর কল্যাণে লিস্টে পেট্রল পাম্প সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে। পেট্রল পাম্প শব্দ ফিলিং স্টেশন নয় রিলিভিং স্টেশন এবং এ এ সি এম-এর সদস্যরা প্রায় প্রত্যেকেই তা জেনে গেছেন, এবং মোটামুটি একটা আশ্বাসের ভাব নিয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারছেন। খালি ট্যাঙ্ক যেমন ভরে নেবার ব্যবস্থা আছে, ভর্তি ট্যাঙ্কও তেমনি খালি করার উপায় আছে।

প্রথম প্রথম নগেন খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। শেষে অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশে পরের পয়সায় সে সাঁকিছু খেতে শুরু করেছে। নিজের পয়সায় খাওয়ার কোনো মানে হয় না, কারণ মুখ আর জিভ দিয়ে যা ঢুকছে তাতে পুষ্টি হচ্ছে পেট ভর্তি এক গাদা প্যারাসাইট, যারা গীতার উক্ত আত্মার মত—নৈনং হিন্দ্যন্তি শম্ভানি, নৈনং দহতি পাবক, এমন কোনো ওষুধ নেই যা এই প্যারাসাইটের কলোনি ধ্বংস করতে পারে। ফলে খাওয়ার মানেই হল—স্বাদ হামারা পুষ্টি তুমহারা। ভস্ম নিজের ঘি ঢেলে লাভ কি! পরের ঘি-ই ঢাল।

নগেনের চাকরিটাও বেশ মজার। পরের ঘি ঢালার সুযোগ অটল। কারণ জিগোস করলে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারব না, শুধু বলব—হুঁহুহুহু। নগেনের পিছনে পিছনে একদল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সব সময় ঘোরে। পার্ক স্ট্রীট থেকে শুরু করে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত বড় ছোটো সমস্ত দেশী বিদেশী,

মোগলাই খানাঘরে মাথা হেলালেই সে যেতে পারে এবং তার গভর্নু সন্তান-  
দলের আকৃতিতে তাকে যেতেও হয়, যে সন্তানকে সে বোনোদিনই ভূমিষ্ঠ  
করতে পারবে না।

সেই নগেনেরই এই কাহিনী। বসেছিল অফিসে। ঘরে ঢুকলো যোশী।  
লম্বা চণ্ডা ফুটবল চোখা। বড় বাজারের গলি। তখা গলি হাঁসপুকুরে  
তার কারখানা। তার থাকার বাড়ি পাঁচতলার শোবার ঘরের পাশে ঘরে  
দুটো মোষ পুড়েছে। নগেন একদিন দেখে অবাক। যোশার ঘরে বসেই মালাই  
খেতে যেতে পাশের ঘরে ভৌস ভৌস নিশ্বাসের শব্দ শুনতে ভেবেছিল হয়তো  
যোশীর ফোনে মোটাসোটা আগ্নেয়ের ঘূনের শ্বাস-প্রশ্বাস। অঙালীরা একটু  
মোট 'হয়ে মানে'। শেষে জানতে পারল ও বরের বানিন্দা দুটো সমান  
সাইজের পুখেলা মোষ। এ যেন এক বিশাল ধাঁধা। মোষ দুটো পাঁচ তলায়  
উঠলো কি করে? যোশী বলেছিল, কেন? কোলে বসে তুলেছি। কত শক্তি  
এরা রাখে। নগেন অবাক। অবশেষে যোশী সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল।  
মোষ দুটো যখন শিশু ছিল তখন তাদের এনে তোলা হয়েছিল। এখন বড়  
হয়েছে দু'ব'দেছে, আর তুমি মালাই খাচ্ছ। নগেনের আর একটু প্রশ্ন  
বাকি ছিল।

‘বোলেন না মশা?’

নগেন বললে, ‘এরপর যদি মরে যায়?’

যোশী হেসে উঠল, ‘অর্গম তো মরতে পারি নোগেনদা। হামার বোডি  
যে ভাবে ওতারবে ওইস ভী উতারবে। এতো প্লেন এন্ড সিমপল বেপার  
মোশা।’

সেই যোশী অবেলায় এসে নগেনকে পাকড়াও করল। অনেক দিন নাকি  
নগেন যোশীর হাঁসপুকুরের কারখানামুখে হয় নি। আজ আর নিষ্কৃতি নেই,  
যেতেই হবে। প্রথমে নগেন একটু ইতস্তত করেছিল। কদিন একটু কোষ্ঠ-  
কাঠিন্য চলেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরাই ভাল। যোশী কিন্তু ছাড়ল না।  
প্রায় জোর করেই তাকে তুলে নিয়ে গেল।

যোশীর কাছে যাওয়া মানেই খাওয়া। প্রথমেই এল তেওয়ারীর সিকান্দা।  
খাঁটি ঘিয়ে ভাজা, টাটকা গরম। বেশ বড় বড় সাইজ। খাবোনা-খাবোনা  
করেও নগেন গোটা চারেক মেরে দিল। লাভুও খেয়ে ফেলল গোটা কতক।  
তারপর আখসেরী মাড়োয়ারী চা। বট পাতার রসের মত ঘন মোটা আখসের

দুধ একটু চা। রং করা। ঘোশী যেমন খাওয়াতে ভালবাসে তেমনি অনর্গল কথাও বলে। সব বিষয়েই যেন সে সমান পণ্ডিত। বাংলা মেশানো হিন্দীতে কি যে বলে বোকাও যায় না। নগেন অনেক কণ্ঠে ঘোশীর হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করে চিৎপুরে ট্রাম ধরার জন্যে এসে দাঁড়াল।

ট্রামে উঠে নগেন বসতে পেয়ে গেল। ট্রাম চলেছে ধিকি ধিকি, বড়বাজারের রিক্সা আর ঠেলার ভিড় ঠেলে বিশাল বিশাল ভুড়িকে পাশ কাটিয়ে। ট্রাম বেশ কিছুটা এগিয়েছে, হঠাৎ নগেনের মনে হল পেটটা যেন কি রকম করে উঠল। সেই কি রকম করে ওঠাটা যেন ভীষণ পরিচিত। নগেনের বিশ বছরের শত্রু। প্রথমে নগেন পেট থেকে মনটাকে সরিয়ে আনতে চাইল। কেমন রিক্সা চলেছে গুটি গুটি। দোকানে কত আলো, কত মান। মালের কথা মনে হতেই মলের দিকে মন চলে গেল। পেটটা সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ মূচড়ে উঠল। বড়বাজারের দিকে বড় একটা আসে না। সুতরাং এই ধরনের এমার্জেন্সির সময় কোথায় যেতে হবে লিস্টে সে রকম কোনো জায়গার হাঁদস নেই। বাড়ি এখনো এক ঘণ্টা পথ। খুব নার্ভাস হয়ে গেল নগেন। এদিকে ট্রামটাও যেন শামুকের মত চলছে। নিশাস বন্ধ করে ওলপেটট ভেতরে টেনে মূলবন্দ মদ্রার মত করে নগেন নিয়মমুখী বেগটাকে উর্ধ্বমুখী করার চেষ্টা করল। কোনো কাজ হল না। বরং উল্টো ফল হল। আর বুঝি ধরে রাখা যায় না। ইন্টেলেক্টকে স্মরণ করল। মানত করল মনে মনে। প্রতিজ্ঞা করল জীবনে কোন পাপ করবে না। মেয়েছেলের দিকে কুনজরে তাকাবে না। বাসে-ট্রামে ভাড়া ফাঁকি দেবে না। স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে না। কোথায় কি? কিছুতেই বেগতো কমে না। সারা শরীর ঘেমে গেছে।

নগেন দুম করে পেরে স্টপেজে নেমে পড়ল। সে যদি রাস্তার নেড়ীকুকুর হত, বেশ হত তাহলে। কোনো সমস্যাই থাকত না। ভগবান তাকে কুকুর করলে না কেন? নগেন তখন মরিয়া। একটা কিছু তো করতেই হবে। তার মত লোকের দৃষ্টি থাকাই ভাল। ওইতো ফুটপাথে অত লোক পড়ে আছে। কই তাদের জীবনে তো এই ধরনের সমস্যা নেই। কখন যায়, কোথায় যায়, কেউ জানে না। আর এই এক হতচ্ছাড়া পেটের জন্যে নগেনের কোঁরসারটাই নষ্ট হয়ে গেল। এপয়েন্টমেন্ট রাখতে পারে না। সময়ে অফিস যেতে পারে না। কোথাও বেরোবার আগে বার তিনেক বাথরুমে ছুটতে হয়। সাহস করে খেতে পর্যন্ত পারে না। নিজেকে অগ্নীল একটা গালাগাল দিয়ে নগেন রাস্তা:

ক্লেশ করল। সামনেই ‘মাতৃসদন’, মেয়েদের হাসপাতাল। আর সময় নেই।  
 যা হোক একটা কিছু করতেই হবে। পদলিসেই ধরুক আর ধরেই পেটাক নগেন-  
 ‘মাতৃসদনে’ ঢুকে পড়ল।

গেটের পাশেই ছোটো একটা ঘর। একজন সিস্টার দাঁড়িয়ে আপন মনে  
 একটা ইঞ্জেক্সানের শিশির মধ্যে ‘ডিসটিলড ওয়াটার’ পদুরে কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে  
 গোলবার চেষ্টা করেছিলেন। নগেন হস্ত-দন্ত হয়ে ঢুকেই বলল, ‘দিদি বাঁচান।’  
 সিস্টার মুখ ফিরিয়ে বললেন, ‘ব্যথা উঠেছে? এনেছেন সঙ্গে করে?’ নগেন  
 একটু ঘাবড়ে গেল। সিস্টার সাহস দেবার গলায় বললেন, ‘ভয়ের কি আছে?  
 ফাস্ট ডেলিভারি বুঝি? কাড’ করা আছে তো?’ নগেন এতক্ষণে বুঝলো।  
 এই ধরনের কথাই সে শুনিয়েছিল এক মাঘের রাতে ‘মাতৃমঙ্গল’। নগেনের তখন  
 প্রায় বেরিয়ে এসেছে। লজ্জায় বলতে পারছে না কেসটা কি, কার কেস?  
 কিন্তু এইরকম সময়ে নানদুশের লজ্জা বলতে কিছু থাকে না। নগেন দাঁতে  
 দাঁত চেপে বলে ফেলল, ‘আমাকে ল্যাভেটরীটা দেখিয়ে দিন।’ নগেনের মুখ  
 দেখে ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা বুঝলেন, হাত তুলে বললেন, ‘ভেতরে ফ্যামিলি  
 কোয়ার্টারের মধ্যে আছে যেতে দেবে কিনা জানি না।’

বুনোচের মত নগেন দৌড়োলো। একটা দেয়ালের গায়ে তাঁরে আঁকা  
 ‘ফ্যামিলি কোয়ার্টারস’ শব্দটা নগেন পড়তে পেরেছে। আর তাকে আটকান  
 কে? পরে পদলিস কেস হলে দেখা যাবে। দু’পাশে সারি সারি ঘর।  
 কোনো ঘরে এক ভদ্রমহিলা পেটিকোট পরে ব্রাউজ পরছেন, কোনো ঘরে চুল  
 বাঁধছেন, কোনো ঘরে চৌকিতে বসে নিছক পা দুলিয়ে চলেছেন। মহিলাদের  
 সব একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। কোনো বাইরের পদরুশের যা দেখা উচিত নয়।  
 নগেন ঠিক দেখছেও না। এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দ্রুত বেরিয়ে যেতে যেতে শুধু  
 এক বলকের জন্যে চোখের পর্দায় ভেসে ওঠা।

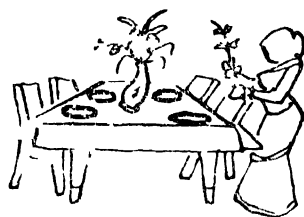
নগেনকে কিন্তু অনেকেই দেখে ফেলেছেন। নারী কণ্ঠের অতর্কিত চিৎকার  
 ‘কোন, কোন।’ একেবারে শেষের ঘরটা বাধরুদ্ধ। নগেন কাঁ করে ঢুকেই  
 দরজার বন্ধ করে দিল। বেশ প্রশস্ত ঘর। আলো নেই তবু খুব অসুবিধে হল  
 না লক্ষ্যস্থল খুঁজে নিতে। প্যান্ট নামাবারও যেন সময় নেই। নগেন বসে  
 পড়ল।

এদিকে দরজায় থান্ডা পড়ছে। পদরুশের বাজখাই গলা, ‘অন্দর মে কোন

হো?’ মেয়েরা দরওয়ান ডেকে এনেছে। নগেন ততক্ষণে প্রথম লট নানিয়ে দিয়েছে। গলার স্বরও ফিবে এসেছে। কদুণ গলার উত্তর দিল, ‘ম্যাস নগেন হো, বহত বিপদমে গিব গিয়া ভাই, মাফি মাওতা, চোর নেহি, ডাকু তি নেহি. ম্যাস নগেন হু!’

বেরিষে আনাব সমন গেটেব কাছে সিস্টাবেব সঙ্গে দেখা। হেসে, রি.গ্যাস করনো, ‘ডেলিভারি হল?’

নগেন একমুখ হেসে বলল, ‘আজ্ঞে হ্যা, নেক ডেলিভারি।’





টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আসছে উত্তর থেকে। ভীষণ ঠান্ডা। অন্যদিন এই সময়টায় শশাঙ্কবাবু সাধারণত বেড়াতে যান। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা। বড় রাস্তা পেরিয়ে আবার গলি। গলির মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে সন্ধ্যার মুখেই ফিরে আসেন বাড়ির দরজায়। বৃদ্ধ মানুষ। সকাল-বিকেল না বেড়ালে ভাল হজম হয় না। এই বয়েসে লোভটাও বাড়ে। মাঝে মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে এটা সেটা খেয়ে ফেলেন। তারপর পেট যখন হাঁসিফাঁস করে তখন প্রতিজ্ঞা করেন, না, আর কখনও অখাদ্য-কুখাদ্য খাব না! আজ সেই রকম একটা দিন। সকালে মেঘলা দেখে দুটো চপ খেয়েছিলেন। দুপুরে খেয়েছেন খিচুড়ি আর সের্কা পাঁপড়। একটু আগে খেয়েছেন চা আর নিমকি। এখন বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। অন্যদিন এক মাইল বেড়ালে আজ তিন মাইল বেড়ান উচিত।

ঘরের একটা জানালা খুলে শশাঙ্কবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। আরো কালো হয়ে এসেছে আকাশ। চারপাশ যেন মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে গেছে। ছাতা নিয়ে বেরোন যেত যদি দমকা হাওয়া না থাকত। জানালাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরুর করেন। সন্ধ্যার আগেই ঘরে অন্ধকার নেমেছে! আলোটা জ্বালালেও হয়, না জ্বালালেও হয়। সারা দুপুর

অনেক পড়েছেন। কাপসা আলোয় পায়চারি ভাল। ঘরে ঘরে ঘুরেই তিন মাইল বেড়িয়ে নিতে হবে।

একটা ফ্ল্যাটের একেবারে ওপরের তলায় শশাঙ্কবাবু থাকেন। স্ত্রী মারা গেছেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। থাকে জামসেদপুরে। ছেলের বিয়ে হয় নি। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বড় চাকরিতে ঢুকেছে। ছেলের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। বেশি দেরি করতে চান না। বৃদ্ধ বয়সে একা থাকতেও ভাল লাগে না। সারাদিন নিঃসঙ্গ। বই, কাগজ, ছবি, আকাশ, ফুলগাছের টব, বারান্দা, রাস্তা, আশপাশের বাড়ি—এই তো তাঁর জগৎ। এব বইবে তো যাবার উপায় নেই। কাঁহাতক ভাল লাগে। ঠিকে একজন কাজের লোক আছে। ফুডুদু করে আসে, ফুডুদু করে পালিয়ে যায়। মাঝে মধ্যে এঁবটা ছোঁচা বেড়াল আসে সঙ্গ দিতে। তিনি তাকে দুধ রুটি মাছ খাইয়ে তোয়াজ করেন। যদি পোষ মেনে যায়। এঁবটা কিছু নিরে থাকতে হবে তো।

শশাঙ্কবাবু এতক্ষণ পোশ হয়ে ঘুরছিলেন। হঠাৎ তাঁর একই মজা করার ইচ্ছে হল। ঘরে ঘরে ইংরেজী অক্ষর লিখতে শুরুর করলেন—এ বি সি ওয়াই এ ডবলু। রাত আটটা কি নটার সময় সুদুখী আসবে। ছেলের নাম সুদুখী। তার আগে অবশ্য দানাবান্না করার মহিলাটি এসে যাবে। নুখে পান। খোঁপাটা মাথার পেছন দিকে ঊঁচু করে তুলে রাখা। মহিলাটির চালচলন কেমন কেমন হলেও রাঁধে ভাল। কামাই করে না।

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। এমন সময় কারুর তো আসার কথা নয়। আজকাল পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে দরজার কড়া নড়লে, কি বেল বাজলে ভয় করে। একা থাকেন। শরীরে তেমন শক্তিও নেই। অস্ত্রও রাখেন না। ইদানীং ফ্ল্যাট বাড়িতেই তো নানারকম খুনখারাপি হচ্ছে। দরজার ম্যাজিক আজও নেই যে আগন্তুককে দেখে নেবেন।

শশাঙ্কবাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কে?

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে জবাব এল—আমি।

—কে সন্ধ্যা?

—না আমি।

—তবে কি রমা?

রমা হল নিচের ফ্ল্যাটের পরেশবাবুর মেয়ে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে

মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, তবে ছেলের বউ করা চলে কিনা ভাবতে হবে।

—না আমি।

শশাঙ্কবাবু খুব সমস্যায় পড়ে গেলেন। মহিলা কণ্ঠ, অথচ সন্ধ্যা নয়, রমা নয়। তাহলে কে? কোন পুরুষ মহিলার গলা নকল করছে বলে মনে হয় না। ওপাশে নির্ভেজাল কোন মহিলাই দাঁড়িয়ে আছেন। একমাত্র মহিলারাই কে জিজ্ঞেস করলে আমি আমি করেন। তাছাড়া শাড়ির খসখস শুনতে পাচ্ছেন।

—দয়া করে নামটা বলবেন। শশাঙ্কবাবু সরাসরি নাম জিজ্ঞেস করলেন।

—দরজাটা খুলুন। নাম বললে চিনতে পারবেন না।

—না, না আজকাল দিনকাল ভাল নয়। পরিচয় না দিলে দরজা খুলব না।

—আ গেল যা। পুরুষ হয়ে মেয়েছেলের মত ভয়ে মরছে দ্যাখো।

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথা শুনে বুদ্ধিতে পেরেছেন, চোর ডাকাত নয়, আদি অকৃত্রিম গেরস্থ মহিলা। সাহস করে দরজাটা খুলে দিলেন। দরজার সামনে মোটাসোটা মাদা-বয়সী এক মহিলা। পাকা পেশার মত বঙ। হাতে ঝুলছে পেটমোটা চটের লেডিজ ব্যাগ। মহিলা সংক্ষিপ্ত একটি নমস্কারঠেকেরই বললেন,

—বিপদে পড়ে এসেছি। চিনতে পারছেন কিনা জানি না। পেছনের ফ্ল্যাটের দোতলায় থাকি। দু-একবার চোখাচাখি হয়েছে। একদিন বাসে ওঠার সময় আমাকে ধাক্কা মেরে নিজেই টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ধরোছিলুম বলে মাথাটা পেছনে চাকায় যায়নি। মনে পড়ছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন। কি বিপদ বলুন?

মহিলা ভেতরে এসে দরজার ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলেন,

—এখন কারুর আসার সম্ভাবনা আছে?

—আজ্ঞে না।

—বেশ — খুব ভাল কথা। আপনার শোবার ঘরে একবার চলুন তো।

শশাঙ্কবাবু মহিলার অসঙ্কোচ ব্যবহারে প্রথম থেকেই হকীকতগে গিরেছিলেন, এবার একেবারে অভিভূত হয়ে বললেন,

—না না শোবার ঘরে কেন? বসার ঘরে বসাই তো ভাল।

—বসতে আমি আসিনি। এসেছি কাজে। সে কাজটা শোবার ঘরে না গেলে হবে না।



কথা বলতে বলতেই মহিলা শোবার ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। শশাঙ্কবাবু খুব অবাক হলেন। কোনটা শোবার ঘর মহিলার জানা। হাত ধরে টেনে আনতেও পারছেন না। পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন। শোবার ঘরেই সংসারের যথাসর্বস্ব। দুপাশে দুটো খাট। একটা নিজের অন্যটা ছেলের। দুজন এক ঘরে গেল। শশাঙ্কবাবু এটা শব্দে পারেন না। ঘুম আসে না, ভয় ভয় করে। দেড়গজ পাশে আগের সুইচ। জ্বালাতে যাচ্ছিলেন! মহিলা হাঁ হাঁ করে উঠলেন—

—খবরদার না। আলো জ্বাললেই সব নাট হয়ে যাবে।

শশাঙ্কবাবু হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—কি করতে চাইছেন আপনি? আমি তো মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।

মহিলা শশাঙ্কবাবুর বালিস থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বললেন,

—ওয়াচ। ওয়াচ করতে চাইছি।

—তার মানে? কাকে ওয়াচ করবেন?

—ওই যে ও বাড়ির বড়োটাকে। আমার স্বামী।

শশাঙ্কবাবুকে আর কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে উত্তর দিকের জানালার খুঁজিড়িটা ফাঁক করে দেখতে দেখতে বললেন,

—হুঁ, আলো জ্বালা করুন। তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়। কতক্ষণ তুমি আলো না জ্বলে থাকবে। এই আমি বসলুম খাটের কিনারায়।

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দেখলেন মহিলা তাঁর খাটের পাশে জাঁকিয়ে বসেছেন। একটা পা তুলে দিয়েছেন মাথার বালিসে। কিছু বলতেও পারছেন না চম্পু লজ্জায়। অথচ প্রায় অপরিচিত এক মহিলা একেবারে বিছানায় গিয়ে বসবেন এটাও বরদাস্ত করা যায় না।

ছেলের খাটে বসে ব্যাপারটাকে একটু পরিষ্কার করার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন,

—ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপার? বড়োকে ঘোড়া-রোগে ধরেছে।

—বড়ো কাকে বলছেন, আমাকে?

—হুঁ, আপনাকে কোন সাহসে বলব? বলছি আমার কত্তাকে। সেই

কচিথেকো দেবতাটিকে ।

—তার মানে ?

—তাহলে এবটু ভেঙেই বলি । তার আগে ডিডেন্স করি, চারের ব্যবস্থা-  
টেক্সা আছে !

ব্যবস্থা আছে, করার লোভ নেই ।

—এবটু চা না খেলে ঠান্ডায় যে মরে যাচ্ছি । আদি বংশ আপত্তি  
আছে ?

—আপত্তি নেই, তবে সেটা কি ভাল দেখাবে ।

—ও বাবা । আজকাল আমার ভাল মন্দার এত বিচার আছে নাকি ।  
চলুন কোথায় কি আছে দেখে নি ।

চা তৈরি হল । শশাঙ্কবাবু বিস্কুট বের করলেন । বসার ঘরেই চা-পর্ব  
শুরু হল । মহিলা চা খেতে খেতে নিম্নেকের নিজে তারিফ করলেন,

—চ-টা বেশ করেছি কি বলেন ?

—হ্যাঁ বেশ হয়েছে ।

—তাও তো মন মেজাজ খিঁচড়ে আছে ।

চা খেতে খেতে মহিলা যা বললেন, স্বামী বিবেদারী করেন । পরসা কড়ি  
আছে । মহিলা বড় একটি হাসপাতালের নার্স । ছেলেপুলে হয়নি । বছর-  
খানেক হল ভদ্রলোক দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়কে বাড়িতে এনে রেখেছেন ।  
মেয়োট কলেজে পড়ে । সেই মেয়োটকে কেন্দ্র করেই যত অশান্তি !

খালি কাপটা টেবিলে রেখে মহিলা বললেন,

—চারদিকে ছিছি পড়ে গেছে । কান পাতা যাচ্ছে না । নিচের ফ্ল্যাটের  
নন্দা অনেক কিছু দেখেছে । সেদিন আমার খোঁজে দুপুরবেলা ওপরে উঠে-  
ছিল । ওপরে উঠে দেখে, আরে ছি ছি, বড়োর মূখে আগুন ।

শশাঙ্কবাবুর অন্যর পারিবারিক কথা শুনতে ভাল লাগছিল না । এসব  
নোংরা ব্যাপারে তাঁর জড়িয়ে পড়তে একদম ইচ্ছে করাইল না । মহিলাকে কোন-  
রকমে বিদায় করতে পারলে তিনি বেঁচে যান । একি উটকো বামেলা ! শশাঙ্ক-  
বাবু চাইলেই তো আর হবে না, মহিলা নিজের মনে বলছেন,

—অ্যাঁ, যে ব্যয়েসে লোক বনে যেত, সেই ব্যয়েসে তুই ভর দুপুরে একটা  
ছড়িকে কোলে বসিয়ে মূখে রসগোল্লা গুঁজে দিচ্ছিস ? তাহলে আমার যখন  
নাইট ডিউটি থাকে তখন তুই কি করিস ? কি শয়তান, কি শয়তান ।

মহিলা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। শশাঙ্কবাবু হাঁ করে দেখছেন তাঁর গতিবিধি। আবার শোবার ঘরের দিকে চলেছেন। উত্তরের জানালা দিয়ে তাকালে একটা বারান্দার কিছন্ন অংশ একটা ঘরের পুরোটাই চোখে পড়ে। খাট, ড্রোইং টেবল, চেয়ার আলনা। বারান্দার রেলিং-এ লাল টকটকে একটা সাম্রার তলার দিক হাওয়ায় অসভ্যের মত ফুলে ফুলে উড়ছে। খড়খড়ি জানালার পাখি ঈষৎ ফাঁক করে মহিলা নিজের শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন,

—মহারাজী চুল বাঁধা হচ্ছে। আহা যেন এতিসারে খাবেন! মরণ আর কি? বড়োটা গেল কোথায় দেখছি না তো।

শশাঙ্কবাবুর খুব ইচ্ছে করছিল ঘটনার ন্যায়কাকে একবার চোখের দেখা দেখেন। মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রাখলেন। মহিলা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,

—গানী আমার মাথা খাবার জন্যে এসেছেন। মানুষের উবগার করতে নেই।

—আপনার স্বামীকে বারণ করুন না। বোকাতে পারছেন না!

—বোকানো? কাঁটাপেটা পৰ্ব্বত হয়ে গেছে। পুরুষ হল পতঙ্গ। আগুন দেখলেই কাঁপিয়ে পড়ে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো, আর ওটাকেও একবার এখানে এসে দেখে যান। তারপর বলুন তো, আমার কোন জিনিসটা কর্মিত আছে। আসুন, আসুন।

শশাঙ্কবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। চোখে ক্যাটারাক্ট ফর্ম করছে। ভাল দেখতে পেলেন না। তবু তাঁর মনে হল, এই মহিলার তুলনায় ওই মেয়েটির সব কিছন্নই কম কম—বয়েস কম, মেদ কম। বেশির মধ্যে চুল, শরীরের খাঁজ। সরে এলেন শশাঙ্কবাবু। এইবার তাঁকে বিচারকের রায় দিতে হবে।

—না আপনার চে' সব কিছন্নই ওনার কম কম। কেবল চুলটাই যা বড়।

—আরে মশাই, ওই বয়েসে আমার চুলও পাছা ছাড়িয়ে নামত। এখনই না হয় টিকিটিকির ন্যাজ হয়ে গেছে। সব পুরুষেরই এক রা, সব শেম্মালের মত। চুল আর বুক দেখেই গলে গেল।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে খুব অপরাধী মনে করলেন। সত্যিই তো মেয়েদের ওই দৃষ্টি বস্তুর প্রতি যোবনে তিনিও ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতেন। মনটা কেমন হু হু করে উঠত। সেই আকর্ষণের ছিটেফোটা বড়ো শরীরে এখনও পড়ে

আছে। হিংসে হলে কি হবে, মেরেটির চুলের ঢল সত্যি চোখে পড়ার মত। মাথাটা একপাশে কাৎ করে চুলে চিরুনি চালানো, সন্ধ্যাবেলা আলো ঝলমলে ঘরে দীর্ঘকায় স্লিম এক মহিলা, সংসারে এর চে' সুখের দৃশ্য আর কি আছে। অথচ এই মহিলাটি রাগে জ্বলে যাচ্ছেন।

চটের হাত ব্যাগ থেকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মহিলা চ্যাপটা একটি কোটো বের করে মুখে কিছন্ন পদ্বলেন। পাশের ঘরের আলোর আভা এ ঘরে এলেও শশাংকবাবু স্পষ্ট কিছন্ন দেখতে পাচ্ছেন না। শব্দ শুনে মনে হল পান চিবোচ্ছেন।

—পান খাবেন : মিনিট মশলা দিয়ে সাজা।

সন্ধ্যাবেলা পান আর খাবো না। আগে খুব খেতুম। এখন সকালে খাবার পর সুপুর্নি। হাড়টা এক ঝিলি খাই।

—আমি খুব খাই। খুব থেকে উঠে শব্দ করি যতক্ষণ না শব্দে যাচ্ছি। কিছন্ন একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। ছেলে নেই পুঁলে নেই। সংসারটাও পরের হাতে চলে যেতে বসেছে। ফ্রাসট্রেশন, ফ্রাসট্রেশন।

মহিলা চেঁচির ওপর বেশ ভাল করে নড়েচড়ে বসতে বসতে খুব ঘরোয়া গলার জিজ্ঞেস করলেন,

—৭৭ খাটে কে শোয় ?

—আমার হলে।

—আমি যেটার বসে আছি ?

—ওটা আমা :।

—একটু ঘরে বাপ ছেলে। ছেলের বিয়ে দিতে হবে তো ?

—হ্যাঁ মেয়ে দেখছি।

—তখন তো ঘর আলাদা করতে হবে।

—বসার ঘরের একপাশে সরে যাবো। অসুবিধের কিছন্ন নেই।

—ছেলের বউ একটু দেখে শুনে করবেন। আজকালকার মেয়েদের ছিঁরি দেখছেন তো। নিজের বউটিকে তো খেয়ে বসে আছেন। যে বয়সে নিজের বউকে সব চে' বেশি দরকার হয় সেই বয়সেই তো ঘর খালি। এখন লাগছে কেমন একলা একলা।

—একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সকলকেই তো যেতে হবে। আগে আর পরে।

শশাঙ্কবাবু শব্দ কবে হাসলেন। হেসে অনেব গোথে ধরা পড়ে যাওয়া নিঃসঙ্গতাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কবলেন। মহিলা শুনলেন কি শুনলেন না বোঝা গেল না। জানালাব পাখি খুলে চোখ বেখেছেন। পুরো মনোযোগটাই ওখানে। চাপা একটা গর্জন শোনা গেল,

—আহা হা, পটেন বিবি। মবা মানুষেও লজ্জা থাকে, উনি শব্দ সাধা পবে ধবম্ব টুড়ে টুড়ে বেড়াছেন। জানালা খোলা। আলো জ্বলছে সায়ার রঙ দেখো—লাল, নীল হলদে, সবুজ। যে তিনিচা চাপা থাকবে তার আবার অত বেগে বাহার কি জ'না? আগুদেব আমলে সব সাদা ছিল। এখন আবার লুঙ্গি উঠেছে বুড়োনি নিশ্চয় ঘবে মাপে কোথাও ঘাপটি মেবে বসে বসে উর্বশীব নৃত্য দেখতে। বাড়ি নম তো দেখালায়।

জানালাব পাখি ফেলে দিখ মহিলা সোজা হষে বসে শশাঙ্কবাবুকে প্রশ্ন করলেন,

—আসকাল মেয়েগুলোব কি হযেহে বলতে পাবেন? পুরুষদের না হয় ফুলে ফুলে মবু খেয়ে উড়ি বেড়ানোই চিকালো স্বভাব। ছুঁড়িগুলোব এই মতিচ্ছন্ন ধরেছে কেন?

শশাঙ্কবাবু কিছক্ষণ চুপ কবে গইলেন। প্রশ্নেব কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। এক সময় বললেন,

—কালেব হাওয়া।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে সাবধানে, হিসেব কবে করে বললেন,

—এক এক বয়সের নেযেকে এক এক বকম দেখতে। কম বয়সে এক রূপ, বেশি বয়সে আব একরকম রূপ। দুটো বুপই ভাল।

মহিলা খাটেন ওপব বেশ কবে নড়েচড়ে বসলেন। সাবেক আমলের অমন শক্ত খাটও শব্দ করে উঠল। মুখে আর একটু মশলা ফেলতে ফেলতে বললেন,

—বুপসী অ-বুপসী কখা হচ্ছে না, আমার কথা হল তোলাজ। ক'টা স্বামী স্ত্রীকে তোষাজে রাখতে পারে? সারা জীবন বাবুৱা খামসে যাবেন বুড়ো বয়সে চাইবেন স্ত্রীর যৌবন, পাছা ভর্তি চুল, সরু কোমর, টান টান তেল তেল চামড়া, হাত ভর্তি...।

শশাঙ্কবাবু আতঙ্ক কেশে উঠলেন। এ'র মুখে তো কোন কথাই আটকায় না।

—কাশি হয়েছে দেখছি। আর হবে না। বর্ষায় চারদিক ঢাপ-ঢ্যাপে হয়ে  
আছে। রক্তের জোঁরও তো কমছে। বদকে বসেছে ?

—না, শুকনো কাশি।

—একটু মালিসটালিস, কেই বা করবে? এই বয়সের বিবাদের বড়  
কণ্ট। ওই মড়া কিন্তু বদল না, বউ কি জিনিস? এই তো সেবার,  
অস্থানে বিষফোঁড়া হল। সাবান্নাত ঘুমোতে পারে না। কে সেবা করল?  
ফদুতির মেয়ে জুটবে অনেক। কথায় বলে ভাত ছড়ালে কাগের অভাব  
হয় না। কিন্তু সেবার মেয়ে ওই একটাই—বউ। কিল মার, চড় মার,  
কাটা মার, শেষ পর্যন্ত বউই ভরসা। বয়েস তো হল, অনেকের অনেক নেতাই  
তো দেখুলুম, ঘাড়ে পাউডার, চুনট করা শূদ্রিত, বানিস করা জুতো, শালীর  
সঙ্গে রপটারপটি ভান্দর বটয়ের সঙ্গে গা ঘষাঘষি, বন্দুর বউয়ের সঙ্গে  
নুকোচুরির পিরিত, মাসকাবারি মেয়েমানুষ, শেষকালে বড়ো এসে মরল  
বউয়ের কোলে—ওগো তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই গো! যেন্না ধরে গেল  
জীবনে।

মহিলা জানালার পাখি ফাঁক করে আর একবার দেখলেন।

শশাঙ্কবাবু ভেবেছিলেন কোনও রকম মন্তব্য হবে। না হল না। অনেকক্ষণ  
বসে থেকে থেকে নিজেকে এইবার একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে। তা হলেও সন্ধ্যোটা  
বেশ কাটল। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। একটা হাই উঠল। দু হাত মাথার  
ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ঘরে আলো না জ্বললেও, বারান্দা থেকে  
আলোর একটা আভা ঘরে এসেছে। একটা আবছা স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ। চওড়া  
পাড় তাঁতের শাড়ি, হালকা রঙের ব্রাউজ। শরীরটা সামান্য ভেঙেচুরে খুব  
পরিচিত একটা ভঙ্গি তৈরি হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে সেও ত এইভাবে  
শরীর ভাঙত। বয়েস যখন কম ছিল শশাঙ্কবাবু ঠিক এই রকম মনুহুতে  
লোভ সামলাতে না পেরে শ্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে খাটে উল্টে ফেলে  
দিতেন। না, না, অতীত অতীতই, প্রাচীন ব্যাপার-স্বাপার নিয়ে মনকে দূর্বল  
করে তোলা ঠিক নয়।

বিছানা থেকে চটের হ্যান্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে মহিলা বললেন,

—যাই। গিয়ে সংসারের চুলোয় আগুন ধরাই। মেয়েদের এই জ্বালা,  
যখন আদর জোটে, তখন ফুটকলাই নিয়ে ফোটে। যখন আদর টুটে তখন  
মদগুর দিয়ে ঠোকে।

শশাঙ্কবাবু পেছন পেছন দরজা পৰ্যন্ত এলেন। বেণ্টে মহিলা, দরজার ছিটকিনিতে হাত পাবেন না। ঘাড়ের কাছে সরু সোনার হার চিকচিক করছে আলো পড়ে। গোল-গোল হাতে সাদা শাখা। শশাঙ্কবাবু গড়ন-পেটন মানেন। তেঁও এই ধরনের চেহারার যে উল্লেখ আছে তা যদি ঠিক হয়, তাহলে এই মহিলা লক্ষ্যমিস্ত্রী। ছিটকিনি খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলেন,

—আপনাকে বিয়ে করার পরই কস্তার ভাগ্য ফিরেছে, তাই না ?

দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন,

—ঠিক ধরেছেন তো। জ্যোতিষ-টোতিষ করেন নাকি ?

—তেমন ভাবে করি না, বেকার মানুষ একটা কিছুর নিম্নে থাকতে হবে তো।

—তাহলে এবার যদি আসব কোষ্ঠীটা জানব।

মহিলা বেরোচ্ছেন শশাঙ্কবাবুর কাছের মহিলাটিও ঢুকছে। অথাক হয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। এ আবার কে! মেয়েটির আজ টান করে চুল-বাঁধা। ফেস্তা দিয়ে শাড়ি পরেছে। অন্যদিনের চেয়ে আজ যেন সাজের ঘটা একটু বেশি। বেশ গুঁছিয়ে নিজের মত করে কাজ করে, তাই সব বেচাল সহ্য করে নিতে হয়। মাঝে মাঝে গুন গুন করে গানও গায়। একটু ফিচলেও আছে। এই তো সেদিন, শশাঙ্কবাবুর সামনেই ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে হাতার পিছন ঢুকিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল! কোন সংকোচ নেই। উলটে জিজ্ঞেস করল, ‘ঘামাচির পাউডার আছে আপনার কাছে?’ পাশ দিয়ে চলে গেলে ফেমস একটা যৌনতার আঁচ গায়ে লাগে। রক্ত ঠান্ডা হয়ে এসেছে তাও মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়।

দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে শশাঙ্কবাবু নিজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললেন,

—মানুষ একটু চা করবে নাকি ?

রান্নাঘরের পাশের কলে অনেকখানি কাপড় তুলে মানু পায়ের গোড়ালি ধুঁচ্ছিল। ভাল দেখতে পান না তবু ফ্রিগের জন্যে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল শ্যামলা দুটি পায়ের গোছে। সন্টার কোলা অংশ, শাড়ির পাক, নিজের বারান্দা, কিম্বিকম বৃষ্টির শব্দ, ভিজে ভিজে গাছের পাতা দোলান বাতাস, প্রতিবেশীর রেডিও থেকে ভেসে আসা সংগীত, নাঃ জীবন একটা মধুর অনুভূতি। ফুরিয়ে গিয়েও ফুরোতে চায় না। হঠাৎ মনে পড়ল, যুগু,

যুবতী, ভাজা ! তিন বাদলের মজা ॥

- মান্দু আর পা ঘষো না, এবার ক্ষয়ে যাবে ।

—রাস্তার ঘা অবস্থা, ঘেমা করে, ম্যাগো ।

- জান ত দাদাবাবু আজ ফিরবে না, কলকাতার বাইরে গেছে ।

—জানি, সকালে বলে গেছেন আমাকে । তার থেকে ওই গামছাটা দিন তো । ওটা নয়, ওটা নয়, ওই পাশের লালটা ।

—আরে বাবা লাল, নীল বোকার মত কি আর চোখ আছে আমার । এই নাও ধর !

—বাদাম দিয়ে চিড়ে ভাজব, খাবেন ।

শশাঙ্কবাবু না এসতে পারলেন না । মান্দুর খাবার ইচ্ছে হয়েছে । না বললে নৃশংসতা হবে ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ কেন খাবো না ? ভাজ-ভাজ, বর্ষায় জমবে ভাল !

মান্দুকে শোনাতে ইচ্ছে করল, যুগু, যুবতী, ভাজা । তিন বাদলের মজা । এসব কথা হঠাৎ বলা যায় না । নিজেকে সংযত করে রাখলেন । তাড়াতাড়ি ঢুকলে পড়লেন নিজের ঘরে । মন বড় মাতাল হয়েছে । বিবাহিত জীবনের কত অভ্যাস স্ত্রী বিরোধের পর জোর করে ভুলতে হয়েছে । বাবা ! অভ্যাস দোষ না ছাড়ে চোরে । শূন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে ।

বিছানায় কাৎ মেরে শূন্য পড়লেন শশাঙ্কবাবু । বেডকভারটা একটু কুঁচকে মচকে গেছে । বালিশের ঢাকাটা একটু ভিজে ভিজে । চুলের আর তেলের গন্ধ । নাকের কাছে কি একটা সুড়সুড় করছে । হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বাললেন । গোটাকতক লম্বা চুল আটকে আছে তোয়ালের রৌন্নার । বেডকভারের যে জায়গাটার মহিলা বসেছিলেন সেই জায়গাটাও সামান্য ভিজেছে । শাড়িটা বোধ হয় বৃষ্টিতে ভিজেছিল । আলোটা নিবিয়ে দিলেন । স্ত্রী সুদৃশ্য মাথায় গন্ধ তেল মাখত । সারা ঘরে এইরকম একটা গন্ধ ভেসে বেড়াত । অনেকদিনের স্মৃতি আবার ভেসে এল । মহিলাশূন্য নীরস সংসারে কিছু ক্ষণের জন্যে যেন রসের খারা বয়ে গেল । শশাঙ্কবাবু চাদরের জিজে জায়গাটার বারকরেক হাত বুলোলেন । বালিশের ঢাকায় মদ্য ভরবেড় নিজের স্ত্রীকে মনে করবার চেষ্টা করলেন । যৌবন, সংসার, ভালবাসা, কগড়া, ভাব । শরীরটা মাঝে মাঝেই একটু সঙ্গ চাইত । সুখ সাবধান করত । একটু বন্ধুসন্দের খরচ কর তাহলে দেরিতে ফতুর হবে । নিজেই কেটে পড়ল, পড়ে রইল শশাঙ্ক ।



কার কখন তেল ফুরোয়, কে বলতে পারেন বাবা !

একটু বোধহয় তন্দ্রামত এসেছিল। মানু ঘরে এসে বলছে,  
—একি চিড়ে খাননি কাকাবাবু। আমি যে চা নিয়ে এসেছি।  
শশাঙ্কবাবু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন,  
—আলোটা জ্বাল ত মানু।

ঘরের ওপর আলো লাফিয়ে পড়ল। শশাঙ্কবাবু যেন স্বপ্ন দেখছেন।  
চোখে ঘুম রয়েছে। সংসারটাকে বেশ ভরাট ভরাট লাগছে। সব যেন ফিরে  
এসেছে। এ কে? মানু, না সূধা? মানু বললে,

—অবাক হয়ে কি দেখছেন? শরীর খারাপ?

—না, শরীর খারাপ নয়। বিকেনে বেরোও পারিনি তো সন্ধ্যার দিকে  
গাটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

—সব কটা জানালা বন্ধ করে রেখেছেন, গরম লাগছে না?

চায়ের কাপটা থাটের পাশের ছোট টেবিলে রাখার জন্যে মানু নিচু হল।  
পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপার দিকে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল। কুচকুচে  
কালো চুল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মৃদু মৃদুতে মৃদুতে মানু বললে,

—মা বর্ষা নেমেছে, কি করে বাড়ি ফিরে যাব ভাবছি।

—বাড়ি ফিরতেই হবে?

—না ফিরলে আর একজন ত হেঁদিয়ে মরে যাবে।

—না, তেমন হলে এখানেও তো শোবার ব্যবস্থা আছে।

—দেখি।

মানু চলে গেল। একবার শশাঙ্কবাবুর শব্দ জ্বর হয়েছিল, মানু  
একদিন সন্ধ্যারাত জেগে সেবা করেছিল। সন্ধ্যা থেকেই মনটা বড় দুর্বল  
হয়ে পড়েছে। যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায় সে নরখাদক হয়ে  
যায়। শশাঙ্ক কি সেই বাঘ? ভাজা মূচমূচে চিড়েও এখন পাগলে  
পাগলে খেতে হয়। দাঁতগুলো বাঁধিয়ে ফেললে কেমন হয়। মৃৎপেয় চেহারাটা  
আবার যুবকদের মত হয়ে যাবে। চুলে একটু কলপ। আরও যুবক। ঘন  
পাখি কি বড়িয়ে গেছে? ভেতরটা আজ বড় শিরশির করছে। মানু  
যখন পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল তখন কেমন মনে হল। না মনটাকে বাঁধতে  
হবে।

নারী সংসৃতিমূলিকা, অর্গল সূর্যপূরকের ।

চিহ্নতমীপ নহি দেখিহি\* বুদ্ধিমত্তা ঘনের ।

এই সংসারে নারীই হল সংসারের মূল ও মোক্ষপাথের বাধা। ছবি  
মেয়েছেলেও চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি তাই ছবি 'ময়েছেলের দিকেও  
ফিরে তাকান না।

শশাঙ্কবাবু আলোটা নিবিয়ে দিলেন। বিদ্রোহী শরীরটাকে বিছানায়  
চেপে বাখার ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, জানলার পাখিটা ফাঁক করে একবার  
দেখি। সেই সন্ধ্যা, ফুলে ফুলে উড়ছে। সেই মহিলা ঘরের মাঝখানে  
দাঁড়িয়ে খুব হাত নেড়ে অদৃশ্য কাউকে শাসন করছেন। বেশ ব্যস্ত আছে।  
সেই মেয়েটি কোথায়। অনেকটা মানদুব মতই দেখতে। মানদুব চেহারার  
বাঁধনটা এখনও ঠিক আছে। একটু যত্ন থাকলে কত লাগদাই হত।

॥ দুই ॥

দুপুরের দিকে মাহলা এলেন। এখনও বেশ চুল আছে। কপালটা  
তাই ছোট। বন্দু বন্দু ধান কুটেছে। নাকের ডগাতেও পুঁতির মত  
ঘামের দানা। নাকের ডগা ধামলে প্রোমক হয়। দরজাটা ভেজাতে ভেজাতে  
মহিলা বললেন,

--যত বর্ষা হচ্ছে তত গরম বাড়ছে।

ঘাড় বেঁকিয়ে শাড়ির পেছন দিকটা দেখতে দেখতে বললেন,

চটি পরে বর্ষায় হাঁটা যায় না। কাদা ছিটকছে ?

শশাঙ্কবাবু দেখলেন। সাদা শাড়ী ভারী শরীরে মোলায়েম হয়ে জড়িয়ে  
আছে। এখানে-ওখানে সামান্য কাদার ছিটে। একটা দুটো ছিটে লেগেছে।  
একবারে স্প্রে পোণ্টং হয়ে যায়নি।

কাদার দা : ও না, বুললেন, মনের দাগের মত।

--ছেলে কোথায় ?

দাঁছেলে বেরিয়েছে।

--আজ আমার অঁ ডে। বড়ো জানে না। প্রথম প্রথম বলত আজ আর  
ও না সুধা, নাই বা ঠেলে আজ।

—আপনার নামও সন্ধ্যা ?

—কেন ?

—আমার স্ত্রীর নামও সন্ধ্যা ছিল।

—ও। এখন কি বলে জানেন, তুমি বেরোবে না? না না কামাই করা ঠিক হবে না দেশের মানদ্ব সাফার করবে। ওরে আমার দেশ হিতৈষীর বাচ্চারে! চলুন, ঘরে চলুন।

মহিলার এই আদেশের ভঙ্গিটা বেশ ভাল লাগে। তেমন তেমন মেয়ের কৃতদাস হয়েও তৃপ্ত পাওয়া যায়। মনে পড়ছে, দিগ্বিজয়ী যো শূর হোয়, বহু-গুণসাগর তাহি\*। শ্রুতাক্ষ যো করত হোয়, তাকো পদতলমাহি। দিগ্বিজয়ী, মহাবলশালী পুরুষ। মেয়েছেলের কটাক্ষপাতে পায়েব তলায় লুটিয়ে পড়ল। মহিষাসুরের বৃকে দুর্গার প্রীচরণ।

—এই নিন। ভুলিনি। কাশিটাকে ত কমাতে হবে। দু আঙুলে নিয়ে শোবার আগে বৃকে লাগাবেন। মালিশ নয়, শূদ্ধ ওপর ওপর লাগিয়ে দেবেন। আর এই নিন খাবার ওষুধ। শোবার আগে এক চামচে চেটে চেটে। ভাল মানদ্বের জন্যে করতে ইচ্ছে করে। মিচকেশ্বতানটার জন্যে অনেক করেছি, দাম দিলে না।

—আপনি শূদ্ধ শূদ্ধ কণ্ট পাচ্ছেন। হয়ত শূদ্ধ শূদ্ধ সন্দেহ করছেন! ভদ্রলোক হয়ত মেয়ের মতই ভালবাসেন।

—কিই ?

মহিলা খাটের ওপর ধপাস করে বসে, একটা পা বিছানায় রাখলেন,

—মেয়ের মত? না মেয়েমানুষের মত? শূদ্ধ তবে, ছলেপূলে হচ্ছে না দেখে দুজনেই ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা কলাম। ডাক্তার বললেন, গোলমাল আপনার নয়, আপনার স্বামীর। বৃকলেন ব্যাপারটা! ও তো এখন বেশরোয়া। চোঁড়া সাপের বিষ নেই, ছোবলালেও মরবে না! এইবার দেখুন।

উত্তেজিত মহিলা ব্যাগ থেকে একটা ভিউফাইন্ডার বের করলেন,

—নিন, চোখে লাগিয়ে দেখুন।

চোখ লাগিয়েই শশাঙ্কবাবু চমকে উঠলেন। উরে বাপ। একি। দেখছেন যেন। জিনিসটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে লজ্জায় চোখ নিনিলেন।

—এইসব জিনিস বাড়িতে আসছে কিসের জন্যে? বলতে পারেন কিসের জন্যে? সন্দেহ! সাথে সন্দেহ আসে? মেয়েছেলে হতে পারি, মদুখা হতে পারি, তা বলে তো আর গাধা নই। প্রথম বয়েসে এসবের মানে বোঝা যায়, শেষ বয়েসে মরার কালে এত চুলবুলানি কিসের? সব ওই ছুঁড়ির জন্যে। বড়ো মড়ার যৌবন ফিরে এসেছে। আমাব দিকে আর ফিরেও তাকায় না। ভাল কথা বললেও খিঁচিয়ে ওঠে। ওই ছুঁড়ি কিছনু বললেই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে।

শশাঙ্কবাবু প্রসঙ্গটা ঘোবাতে চাইলেন,

—আজ একেবারে শরতের আকাশ।

—ওসব আকাশ টাকাশ কবিবো দেখলে আপনি কি কবি? একটা পান খাবেন নাকি, জর্দা দিয়ে?

চোখের মত একটা ডিবে খুলে পব পর দুটো খিাল মুখে পুরলেন। ফর্সা গাগ দুটো ঠেলে উঠল। শশাঙ্কবাবু না বলতে পারলেন না। না, বললেই মহিলা সন্দেহ করবেন, দাঁত নেই, ফোগলা দিগম্বর।

—দিন একটাই, খাইনি অনেকদিন চেড়ে ছুঁড়ে দিয়েছি। সুধাও গেছে পানের পাটও উঠে গেছে।

—আর এক সন্ধ্যা, আবাব চালু করে দিচ্ছে। নিন হাত পাতুন, একটু জর্দা দি?

—না না জর্দা থাক। মাঝাটাতা ঘুরে পড়ে যাব।

—আহা, কচি খোকা। ঘুরে যায যাবে, জল থাবড়ে দোব। জর্দার জন্যেই তো পান।

পান, পানের পিক, জর্দা সব ভেদ করে কথা আসছে জড়িয়ে জড়িয়ে। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, পিক ফেলবেন। শশাঙ্কবাবু বুকতে পেরে বললেন,

—আসুন কোথায় ফেলবেন দেখিয়ে দি।

নর্দমার কাছে এসে ডান হাতে কাপড়ের সামনের দিকটা পুরুন্টু দুই উরুর মধ্যে ঠেসে ধরে, মদুখা ছুঁচ মত করে পোয়াটাক পিক ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। চাবপাশে চোখ ঘুরিয়ে বললেন,

—বাড়িটা নতুন, তবে জায়গা বড় কম। আব কি হবে, এরপর আর দাঁড়বার জায়গাও মিলবে না।

ঘরে ঢুকে নিজেই রেগুলেটার ঘুরিয়ে পাথার চলন বাড়িয়ে দিলেন। খাটের

ওপর বসতে বসতে বললেন,

—বেশ শান্তির জায়গা। এক ছুতোর মিস্ট্রীর হাতে পড়ে জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল।

—কে ছুতোর মিস্ট্রী?

—ওই হল ফনট্রাকটারও যা, 'মিস্ট্রীও' তাই। আপনার বউটি এত কম বয়সে খসে গেল কি করে? এমন সুখেই সংসার সহ্য হল না বুঝি?

—লিভার। লিভারটা নষ্ট করে ফেললে। খালি পেটে কাপ কাপ চা, ঘুরতে ফিরতে মূঠো মূঠো চানাবু। মেয়েদের স্বভাব জানেন ত, একগুয়ে অবদুখ, ভাল কথা কানে ঢোকে না।

—বরদার। বউ নেই বলে যা খুশি তার নামে বলে যাবেন, খেটি হতে দেব না। কিপটেমি কবেছিলেন: ভাল কবে চিকিৎসা যাবান নি। বিছানায় শুধু শুনেই হয় না, মাঝে মাঝে বোদেও দিতে হয়

চিকিৎসা করাইনি মানে? অ্যালো, হোমিও, হোমোপ্যাথি, টোটকা কোনটা বাদ গেছে? নিজে ঘাটার পর ঘাটা লাইন দিয়ে ফটি ঠাকুরের দৈব ওষুধও এনেছি। থাকবে না, যে যাবে, তাকে আটকে রাখবে কে?

শশাঙ্কবাবুর গলাটা ধবে এল। চোখ ছলছল করছে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন।

সেরিক, চোখে জল এসে গেল। 'ভীষণ দুর্বল মানব তো? ওই পান্ড-টাকে দেখে শিখুন। এক চোখে কান্না আর এক চোখে হাসি।

—বেশ হচ্ছে তো? পুরনো কথা মনে পড়লেই চোখে জল এসে যায়। দুঃখের দিনে আমার সঙ্গে কষ্ট কবে গেল, সুখের দিনে রইল না। সুধাকে আজকাল বস্তু মনে পড়ে যায়। ভেবেছিলুম ছেলের বিয়ে দিয়ে বড়োবড়ো কাশীতে গিয়ে থাকব। তা আর হল না। একলাই ঘেতে হবে। কত সব ছোট ছোট সাধ আহলাদ ছিল, যখন মেটাবার মত অবস্থা এল, সব ফাঁকা। ছেলের রোজগার, ভাল জামাই, কিছুই সহ্য হল না। হাসতে হাসতে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আসছ তো?

টেবিলে মাথা রেখে সুধার শোকে শশাঙ্কবাবু ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠলেন। মহিলার চোখেও জল এসে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে শশাঙ্কর মাথার পেছন দিকের কাঁচাপাকা চুলে হাত রাখলেন। চোখ থেকে এক ফোঁটা জল শশাঙ্কর ঘাড়ের পড়ল। আর এক সুধা শাস্ত করার জন্যে কিছু বলতে

গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিষম। পানের কুচি, জর্দার টুকরো শ্বাসনালীতে।  
দমকা কাশি। মাথার পেছনে রাখা হাত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

শশাঙ্ক মাথা তুললেন, মহিলার হাত মাথা থেকে বসে কাঁধ ছুঁয়ে বন্ধুর  
ওপর দিয়ে নেমে গেল। জোর বিষম। মূখ চোখ লাল হয়ে গেছে।  
একে ফর্সা মান্দু। শশাঙ্ক হাত ধরে খাটে বসিয়ে দিলেন। শ্রী সুধার  
বিষম লাগলে মাথার তালুতে চাঁটা মারতেন। ভাল দাওয়াই! এই সুধার  
মাথায় কি থাপ্পড় মারা যাবে। যা থাকে বরাতে শশাঙ্ক ব্রহ্মচালুতে খাবড়া  
মারতে লাগলেন, দু চারবার ফুঁও লাগলেন। সিঁথির কাছে সিঁদুরের রেখা  
বয়েসে চওড়া হয়েছে। চুলের গোড়ায় সাদার ছোঁয়া লেগেছে। মানুষের মাথা  
দেখলেই বোক যায় কটা ঝড় বয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। ভীষণ মারা হল  
শশাঙ্ক। জীবনে জীবনে ত্যাকাত্যাক করে যে শেষ হবে।

—দাঁড়া, এক গেলাস জল নিয়ে আঁস।

শুধু জল নয়, একটা তোয়ালেও ভিজিয়ে আনলেন।

—নিম্ন, মূখটা বেশ কবে মূছে ফেলুন। লাল টুকটুক হয়ে উঠেছে।  
উঁহু ওভাণে নয়, জলটা ধীরে ধীরে আঁস, তা না হলে আবার বিষম লেগে  
যাবে।

বন্ধুর ওপর থেকে কাপড় বসে পড়েছে। শশাঙ্কর মনে হাঁচ্ছল ভিজ  
তোয়ালে দিয়ে নিজের হাতে মূঁছে দেয়।

—একটু না হয় ফ্যাট হয়ে শুষে পড়ুন। না না, সঙ্কোচের কোন কারণ  
নেই! আমি পাশের ঘরের ঘরে লে যাচ্ছি।

—কেন, আপনিও ছেলের খাটে শুষে পড়ুন। এই বসে খাবার পর একটু  
বিশ্রাম করতে হয়।

—আপনার অসুবিধে হবে।

—অবাক করলেন মশাই। আপনার বাড়িতে আমি তো একটা উৎপাত।  
আমার জন্যে কষ্ট করে সারা দুপুর ঠায় বসে থাকবেন?

না বসে থাকব কেন? ও ঘরে গিয়ে কাৎ হয়ে থাকব।

—কেন এ ঘরে থাকলে কি চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে?

—এঃ ছি ছি, এই বয়েসে চরিত্র বলে কিছু থাকে নাকি? সবই ত ঘুমিয়ে  
পড়েছে।

তাহলে জানলার পাখিটা ফাঁক করে একবার দেখুন ত।

মহিলা আবার কেশে উঠলেন। বিষমের রেশ এখনও লেগে আছে।

—দেখছি দেখছি, আপনি পাশ ফিরে কিছদুক্ষণ শূন্যে থাকুন আর এক  
গেলাস জল?

—না আর জল লাগবে না।

শশাঙ্ক পাখি ফাঁক করে ও বাড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন।  
বারাণ্ডার রেলিং-এ দহাতের কনুইয়ের ভর রেখে কত্তা দাঁড়িয়ে। গায়ে  
স্যাণ্ডেগেঞ্জি, ছাপা লুঙ্গি। মাথার সামনে ওলটান ফুলকো চুল। কপালের  
দুপাশ টাকে ঝেঁষে গেছে। হাতের আর কাঁথের গুল দেখলেই মনে হয়  
শরীরে এখনও বেশ শক্তি। এক ঘূষিতে শশাঙ্ক কাৎ। পাশেই সেই  
মেয়েটি। নীল শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। এলো চুল মাথার দুপাশ দিয়ে সামনে  
ঝুলছে। চুড়িপরা একটা হাত কত্তার পিঠে। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে পাখিটা  
বন্ধ করে দিলেন। এই দিকেই যেন চেয়ে আছেন। যদি দেখে ফেলেন।

—কি দেখলেন?

শশাঙ্ক তোতলাতে তোতলাতে বললেন,

—বাবাশ্বাদেই দৃজনে দাঁড়িয়ে। বাপ মেয়েও বলা যায়, স্বামীও বলা যায়,  
বল্লেশের ডিম্বারেনসটা না বরলে।

—বাপ, মেয়ে। কই দেখি।

শূন্যে শূন্যেই শরীরটাকে ঘূঁরয়ে জানলাব পাখিতে চোখ রাখলেন,

—বাঃ, বাঃ বা ভাই। বেড়ে হচ্ছে। প্রকৃতি দেখে শরীরে প্রেম  
আনা হচ্ছে। যাচিলে জামাই রুটি না খায়। রাগি হৈলে জামাই ঢেঁকশেল  
চাটিতে যায়। মূখে আগুন তোমার। এইবার আমি যদি এই মানদুষটাকে  
জড়িয়ে ধরি। কেমন হয়।

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি সরে গেলেন খাটের দিকে।

—এত প্রেম ছিল কোথায়? নিজের বউয়ের বেলায় সব শূন্যে যায়,  
অন্যের বেলায় উথলে ওঠে। অন্য মেয়েছেলে দেখলেই আপনারা এত চুলবুল  
করেন কেন বলতে পারেন?

শশাঙ্ক শূন্যে শূন্যে বললেন,

—সবাই কি আর করে? এক এক জনের এক এক স্বভাব। কেউ কেউ  
নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। পাগলা হয়ে যায়।

—পাগলামি আমি ঘূঁচিয়ে দিচ্ছি। হুট করে বাড়িতে ঢুকে দৃজনের

পরিণত চট্কে দেবে সে উপায় রাখেনি। দরজায় কড়া নাড়লেই কত্যা অমনি লুপ্তি সামলে জপে বসে যাবেন। ছুঁড়ি গিয়ে ঢুকবে বাধরুমে। আমি এই জানলাটা খুলে এখান থেকেই চিৎকার করব, এই যে দাদু কেমন হচ্ছে, তোমাদের ঘম সব দেখছে।

—এই না।

শশাঙ্ক খড়মড় করে উঠে জানলার ছিটাকিনির দিকে মহিলার বাড়ান হাত চেপে ধরলেন। দুজনে চোখোচোখি হল।

—আমাকে বিপদে ফেলবেন না। এই সব নোংরা ব্যপারে একবার জড়িয়ে গেলে, লোক হাসাহাসি হবে।

শশাঙ্ক হাত ধরে টেনে মহিলাকে চিৎ করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

—উত্তেজনা কখন কাজ করা ঠিক নয়। যা করতে হবে ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে। চেষ্টা করুন কিছুক্ষণ শূন্যে থাকুন। ভগবানই রাস্তা বাতলে দেবেন।

শশাঙ্ক ছেলের বিছানায় গিয়ে শূন্যে পড়লেন। অনেকদিন পরে মেরে-ছেলের গায়ে হাত দিলেন। বেশ লাগল। শূন্যে একটা অনুভূতি ফিরে এল। স্ত্রীকে বেশ লাগত। পরস্পরকে যেন আরও ভাল লাগল। না না, এ ভাল লাগা ঠিক নয়। শূন্য অন্যায়, শূন্য অন্যায়। শশাঙ্ক সামালকে।

শশাঙ্ক বোধ হয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। ভাতঘুম। ঘাড়তে চারটে বাজছে। চোখ মেলে তাকালেন। বাইরে মেঘ ভাঙা রোদ। একখন্ড নীল আকাশে শরতের টুকরো মেঘ। উঠে বসলেন। সেই সূখা থাকলে এখন চায়ের জল বসত। এই সূখা শূন্য ঘুমোচ্ছে। শরীরটা শিথিল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, মুখটা প্রশান্ত। কোন রাগ বিরক্তি অশান্তির চিহ্ন নেই। ঘূমে সব মোলায়েম। অল্প বয়সে বেশ খারাল মন্থই ছিল। তীক্ষ্ণতা একটু কমেছে। তা হলেও বেশ ভালই দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে আছে। লিপিস্টিকের মত পানের লাল দাগ। খবথবে একটা পা আর একটা পায়ের ওপর আড় হয়ে আছে। একটা হাত খাটের বাইরে ঝুলছে। চিকন চিকন দুগাছা সোনার চুড়ি চিক্‌চিক্‌ করছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ভাঁজে ভাঁজে শাড়ি। গলার কাছে একটা শিরা দপদপ করছে। বৃকের ভার শ্বাসপ্রশ্বাসে ধীরে ধীরে উঠছে নামছে।



হেই মাঝি । জোয়ার আসছে ।

বিলেতে মেমসাহেবরা মৃদু চুপন করে । ঘোঁষনে একটা বই হাতে এসেছিল,  
আর্ট অফ কিসিং ।

এই বড়ো বি কেসারফুল । মক্ষী বয়ঠি সাহদ পরো পংখা গয়ে লগটাই ।  
মক্ষী ঝটপটায় শিরধুনে, লালচ বুরি দালাই । লোভই এই সংসারে পতনের  
একমাত্র কারণ । দেখ শশাংক মৌমাছির হাল । মধুতে বসলেই পাখা দূটো  
আটকে যায় । মৃত্যু । যা করবে ভেঁব চিন্তে করবে ।

শশাংক রান্নাঘরে ঢুকে চায়েব জল চাপালেন । অন্যদিন এক কাপ, আজ  
দুকাপ । শূন্য বাড়টা বেশ ভবাট লাগছে আজ । দুকাপ চা হাতে নিয়ে  
শশাংক আবার শোবার ঘবে এলেন । মহিলা তখনও অকাতবে ঘুমোচ্ছেন ।  
শান্তি আর ঘুম হাত মিলিয়ে চলে ।

—এই যে শুনছেন, উঠুন, চা এসেছে । এই যে । সুধা সুধা ।

কর্তাদিন এই নাম ধবে ডেকেছেন । উঠে বসতে, ঘুবতে ফিরতে কি অদ্ভুত  
যোগাযোগ ।

—সুধা, সুধা, চা ।

সুধা চোখ মেলে তাকাল ।

—উঠুন উঠুন, চা এসেছে ।

—আঁ সকাল হয়ে গেছে ।

—না, সকাল নয় বিকেল । খুব ঘুমিয়েছেন । কেমন লাগছে আপনার ?

চায়েব কাপটা সুধার হাতে দিলেন । কাপড়চোপড় সব এলোমেলো  
আলুথালু চেহারা । এই অবস্থায় কেউ যদি দেবে ফেলে কি যে ভাববে ।

—আপনি একবারও দেখছেন ।

—কি দেখেছি ?

—হা ভগবান ! ও বাড়ির সেই চরিত্রহীন বড়োটা ?

—না তো ।

—একটা কাজের ভার দিলুম । ব্যাটাছেলেদের মত অকর্মা পৃথিবীতে  
খুব কমই দেখেছি ।

শশাংকর সেই কথামূতের গল্পটা মনে পড়ল । এক যাদুকর খেলা  
দেখাচ্ছে লাগ ভেলকি । হঠাৎ জিভ আটকে সমাধি হয়ে গেল । সবাই  
ভাবলে যা ভাগ্যবানের মোক্ষলাভ হল । ওমা যেই জ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গে

সঙ্গে আবার সে বলতে লাগল, লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি, মহিলারও সেই এক অবস্থা। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে, মহিলা পাখি ফাঁক করে দেখতে লাগলেন।

—এই যে দেখে যান, দেখে যান, আপনাদের কান্ড দেখে যান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শশাঙ্ক এগিয়ে গেলেন। মাথাটা নীচু করছেন মহিলাও। মাথা তুলছেন। কপালে আর মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

—লাগল তো ?

শশাঙ্ক বললেন,

—না না, এত সামান্য লাগাকে লাগা বলে না।

চশমাটা নাকের ডগায় হেলে গেছে। চুলের তেলে কাঁচ কাপসা। শশাঙ্ক অস্পষ্ট হলেও ওই বাড়ির শোবার ঘরে পদ্রুপজাতির কান্ড দেখে সীতাই অবাক হলেন। কত্তা মেঝেতে খেবড়ে বসে আছেন মেরেটি পেছন দিক হতে গলা জড়িয়ে আছে। কত্তা পিঠে ফেলে দোল দোল করছেন। ছেলে-বেড়ায় মার পিঠে চেপে শশাঙ্ক এইভাবে দোল খেতেন। মা বলতেন, দোল দোল দোল দোল, থোকা দোলে থোকা দোলে, দোল দোল দোল দোল।

—মনে হয় ব্যায়াম করছেন। এই বয়েসে শিরফির টেনে থাকে। বারবেলের বদলে ওই মেরেটিকেই ওজন হিসেবে ব্যবহার করছেন। ফিজিওথেরাপি। অনেকে মোটা বই মাথার ওপর তুলে কাঁথের একসারসাইজ করেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যায়ামই হচ্ছে। ফিজিওথেরাপি নয় সেই থেরাপি হচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে এখুনি গিয়ে চুলের মূঠি খরে শয়তানীটাকে রাস্তায় বের করে দি। হাতের তেমন জোর থাকলে এখান থেকে ঢিল ছুঁড়তুম। কিছুর তো একটা করতে হয়। বলুন না মশাই কি করা যায়? একটা বুদ্ধি দিতে পারছেন না?

—আমেরিকা হলে ডিভোর্স করার পরামর্শ দিতুম। অ্যাডালটারির চার্জ এনে ঠুকে পাও মামলা।

—সাক্ষী দেবেন?

—আমি নিবিবাদী। আমাকে কেন জড়াচ্ছেন?

—সেকি! আপনার কোনও সামাজিক দায়িত্ব নেই? চোখের সামনে অনাচার! একটা মেরেছেলে সংসার তছনছ করে দিচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলবে না? আগেকার দিন হলে গ্রামের মোড়ল মাথা কামিয়ে খোল দেলে

ছেড়ে দিত। কাজির আমল হলে গর্ত করে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুতে দিয়ে ভালকুকুর দিয়ে খাওয়াত।

—আপনি শ্রাবণমণী মহিলা আপনার অত ভয় किसের? কেন পড়ে পড়ে মার খাবেন?

—বাঃ খুব বললেন যা হোক। আমি ডিভোর্স করলে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?

—আমি? শশাঙ্ক হাসলেন, আমার বিয়ের বয়স আছে আর?

—বিলেতে বদুড়োবুড়ির বিয়ে হয় না?

—তা হয় তবে এটা তো বিলেত নয়।

—তা হলে ডিভোর্সও হয় না, হয় ক্যাঁটা পেটা। কোঁটিয়ে আমি আপদ বিদেয় করব। এক গেলাস জল খাওয়াবেন?

শশাঙ্ক জল এনে দিলেন। মহিলা ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে খেলেন।

—প্রেসারটা আবার বেড়েছে। আজ আপনি আমার যা করলেন, জীবনে ভুলব না। আপনারও কেউ নেই আমারও কেউ নেই। মিলেছে ভাল। মেরেরাও একটু আদর চায় যত্ন চায়। শ্রুতাই সংসারের হাঁড়ি ঠেলবে আর বাচ্চা বিলোবে তা হয় না। এই নিন কিছু ওষুধ রাখুন, এইটা অম্বলের, এটা মাথাধরার, এটা আমাশয়। আরও আরও এনে দেবে। যাই, নরকে ফিরে যাই। সতীন নিয়ে সোনার সংসার। এই বাড়িটা কি শাস্তির। সেই চটের হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে মহিলা ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোলেন। শাবার ইচ্ছে নেই তবু ত যেতেই হবে।

## তিন

কিছু ক্রেনাকাটার ছিল। বিসকুট ফ্রিজেছে, টুথপেস্ট গেল গেল হয়েছে, সাবানের ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। দাড়ি কামাবার ব্রেড। চিঠি লেখার প্যাড। স্টেশনারি দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছেন। মালপত্তর ওজন হচ্ছে। নজর চলে গেল একটা প্যাকেটের ওপর হেয়ার ডাই, ব্র্যাক। অনেকক্ষণ থাকিয়ে রইলেন। এক শিশি কিনে দেখলে হয়। ন্যা মাঝে মাঝে বলত,

কি বড়োটে হয়ে যাচ্ছ, চুলে একটু কলপ লাগাও না। চুল কাল করে দেখতে ইচ্ছে হয়, দাদু থেকে দাদা হওয়া যায় কিনা।

পাগল। পাগল। বড়ো শালিকের ঘাড়েরো।

একশো গ্রাম লজেনসও কিনলেন। একটা মূখে ফেলে পাকের বার কতক পাক মেরে বাড়িমুখে হলেন। পাকের আজকাল বড়াড়াদের বেড়ান চলে না। ছেলেমেয়েরা বড় সাহসী হয়ে উঠেছে। তাকালে আবার সিটি মারে। বইয়ে পড়েছেন লন্ডনের হাইড পাকের সকালবেলা খুঁড়ি খুঁড়ি সেই সব পড়ে থাকে। নাঃ, পৃথিবীটা চিরকালই যুবক যুবতীদের! তারা যা করবে সেইটাকেই মুখ বুদ্ধ মেনে নিতে হবে। ওই যে রাধাচুড়া গাছের তলায় যে জোড়াটি বসে আছে তাদের কেউ যদি বলে, অ্যায়, কি হচ্ছে? সব কটা জোড়া তেড়ে এসে তার জিওগ্রাফি পাল্টে দেবে।

বাড়ি ফিরে এসে কাপড়ের আলমারিটা খুললেন। সব সন্ধ্যা নেমেছে। দিন শেষের তরল অশ্বকারে জনপদের বাতি সারি সারি ভাসছে। এখনও কিছু কিছু বাড়িতে শীথ বাজে। শশাতক তাঁর স্ত্রীর একটি শাড়ী বের করলেন। ভুলে শাড়ী! রংটি বেশ গাঢ়। শাড়ীটাকে পাশ বালিশের ওপর ছাড়িয়ে দিলেন। সূদা যেন শূন্যে আছে। একটা সায়্য বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। অর্গান্ডির একটা, ব্লাউজ হাতে ধরে স্পর্শ নিলেন। পুরনো জিনিসগুলোকে জোড়াতালি লাগিয়ে হারানো অতীতকে বর্তমানে টেনে আনার চেষ্টা। যে শরীরের এই সব আচ্ছাদন সেই শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে। কালে এগুলো কীটদন্ড হয়ে হারিয়ে যাবে। তাঁকেও যেতে হবে। বিছানার দিকে তাকিয়ে ডাকলেন,

—সূদা, ওঠো, সন্ধ্যাবেলা শূন্যে থাকতে নেই, ওঠো, উঠে বসো।

নিজের পাগলামিতে নিজেই হেসে উঠলেন। দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? সব পাট করে তুলে রাখলেন। ইন্ডিয়েট, ইন্ডিয়েট। একটা টিনের কোটর মধ্যে কাঁচা সিঁধের পাতা ছিল। দু'চিমটে মূখে ফেলে চিবোলেন। তেতো, তেতো। আজ একটু নেশা চাই, নেশা। স্বপ্ন চাই। সেই স্বপ্ন। সূদার হাত ধরে নৌকা থেকে পারে নামাচ্ছেন। সাবধান, দেখো পড় না যেন।

অনেকদিন তোমাক চিঠি লেখা হয়নি।



মাঝে মধ্যে সূধাকে চিঠি লেখেন শশাঙ্ক। পৃথিবীর কোন পোস্টম্যান সে চিঠি বিলি করতে পারবে না। লিখে তাই ছিঁড়ে ফেলেন। ছোট ছোট সাংসারিক কথা। মান অভিমান।

সূধা, বহুদিন হয়ে গেল, জানি না তুমি আগের ঠিকানাতেই আছ, না অন্য কারুর মেয়ে হয়ে নেমে এসেছ। ভেবেছিলুম অন্তত একদিনও তুমি আমার মাথার সামনে এসে দাঁড়াবে, রাত তখন গভীর নিশ্চল। আমার জ্বর হল, মানু এসে কপালে হাত বুলিয়ে দিল, তুমি কিন্তু এলে না। ওখানে তুমি হয়ত আমার চেয়ে প্রিয় কোন সঙ্গী পেয়ে গেছ। যে সব দায়িত্ব তুমি দিয়ে গেছ সবই আমি একে একে গৃহীয়ে এনেছি, কেবল সূধীর বিয়েটাই বাকি। ওর কাজটা শেষ হলেই, কয়েকটি তীর্থ ঘুরে বাড়ি। তীরে আমার নৌকো বাঁধা। জোয়ার এলেই ভেসে যাব। আর কটা দিন। বাত প্রায় কাটিয়েই এনেছি, আর প্রহরখানেক মাত্র বাকি, একটুর জন্যে তাল আর ছাড়ছি না। বড় ক্লান্ত তবু মজুরো শেষ করেই যাব। ততদিন তুমি কি আমার অপেক্ষায় থাকবে? আর এক সূধা এসে কদিন খুব হামলা করছে। তোমার বিছানা দখলের তাগে আছে কিনা কে জানে? মন না মতিভ্রম।

পরজার কড়া নাড়ে উঠল।

কে এল? সূধী! আজ বেশ একটু সকাল। কোনদিন কখন আসে।

—যাক আজ বেশ সকাল সকাল এসেছি।

—হুঁ।

—শরীর ভাল ত?

• —হুঁ।

শশাঙ্ক একটু ঘাবড়ে গেলেন। সব প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত জবাব। সূধীর ত এমন কাটাকাটা স্বভাব নয়।

—কি খাবি এখন? একটু চা বসাই?

—কোনও প্রয়োজন নেই।

ছেলেটা আজ মনের ওপর বড় খারাপ মারছে ত! কি হল। অসহ্য।  
বুড়ো মানুস। বড় ভয় করছে।

—আজ তোর কি হয়েছে সূধী?

—কিছু না।

—কিছু একটা হয়েছে, তা না হলে এমন কাটাকাটা উত্তর কেন?

পোর্টফোলিও ব্যাগটা বিছানার ওপর ঝপাং করে ফেলে দিয়ে সুদী রিস্টওয়াচ  
খুলতে খুলতে বলল,

—তুমি আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে চুনকালি মাখিয়েছ।

বীকড়া কীকড়া চুল কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখের ওপর চশমা!  
চশমার কাঁচে আলোর ছটা। চোখ দেখা যাচ্ছে না।

—আমি!

—হ্যাঁ তুমি। তুমি এই বয়েসে বাড়িতে একটা মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে সাগর-  
দিন যা তা কর।

—সে কি! কে বললে?

—যাদের মধ্যে বাস করছ তারাই বললে। সমাজের চোখে ফাঁকি দিয়ে  
কিছু করা যায় না বাবা!

—ভুল শুনিয়েছি। এ সব অপপ্রচার।

—তুমি অস্বীকার করতে পার, এ বাড়িতে কোন মহিলা আসে না?

—হ্যাঁ আসে, কিন্তু কেন আসে তুমি জানিস? আসল রহস্য জানিস?

—জানি জানতে চাই না। শুধু এইটুকু জানি, আমার দুর্ভাগ্য তোমার  
ছেলে হিসেবে আমাকে পরিচর দিতে হয়।

—এত বড় কথা।

—হ্যাঁ এত বড় কথা। বৃথা বয়েসে পদস্থলন। তোমার ওপর আমার  
সামান্যতম প্রমাণও আর নেই।

—তুমি আমার কাছে ঘটনটা শুনাবি না?

—না, যা শোনার আমি প্রতিবাসীর কাছে থেকেই শুনিয়েছি। চরিত্রহীন  
এক মহিলা, প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দু নম্বর একজনের সঙ্গে যা বৈধে তিন  
নম্বরের কাছে নাচতে আসেন। হিঁ হিঁ!

## চার

সকালে দশটাকে কিঞ্চিৎ উদ্ভ্রান্তের মত মনে হল। শুকনো মৃৎ  
রাতজাগা লাল চোখ। বিছানা সারারাত শুন্য পড়ে রইল। বসার ঘরেই  
রাত কাটালেন। সুদীর সামনে দাঁড়বার ইচ্ছে নেই। দুজনেই দুজনের

কাছে ঘূর্ণিত। সুধী শোবার আগে ভেবেছিল বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিছানায় এনে শোয়াবে। বোজা ঘেমন গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইভাবেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু নিজের মনকে রাজি করাতে পারল না কিছতেই। ফেরার পথে রাজেনবাবু তাকে যা তা বললেন,

—তোমার বাবার আবার বিয়ে দাও হে। তোমার বিয়ে না হয় পরেই হবে।

কথাটা শুলে মত মনে বিঁধে আছে। চরিত্রহীন পিতার পুত্র এই পরিচয়ে সে পরিচিত হতে চায় না। সে নিজেকে বোঝাল, বেশ বয়েছি বলেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই করা উচিত। হলেনই বা বাবা। যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, নিজের স্বভাবের জন্যেই পেলেন। যেখানে খুশি বেভাবে খুশি রাত কাটান। বাড়িতে মেয়েছেলে এনে ফুটি'র সময় তোমার মনে ছিল না বিপরীক বৃন্দ। সমাজের হাজারটা চোখ।

দুপুরের দিকে নিজ'ন ঘবে দাঁড়িয়ে শশাঙ্ক উম্মাদের মত বার কতক হাসলেন।

—তোমার সংসার আজ ভেঙে গেল সুধা। চারদিকে সাজান সব তাসের ঘর। জীব শিব সম সুখ মগন সপনে কিছ'র কর তু'তি। জাগত দীন মলিন সেই বিকল বিবাদ বিভূতি। স্বপ্নের ভোগৈশ্বর্য' স্বপ্নেই মিলিয়ে গেল। আমি এখন সজাগ মায়ামুক্ত, সুখের স্বপ্ন আমার কাছে ঘোর বিবাদ। তোমার স্মৃতি রইল, তোমার ছেলে রইল। আলমারি ভর্তি তোমার জামা কাপড়, গয়না রইল। তোমার ছেলের বউ এসে পড়বে। তোমারও দেখা হল না, আমারও দেখা হল না। রাত যায়, স্বপ্ন যায়, আবার রাত আসে, নতুন স্বপ্নও আসে। আমি শুধু আমাদের বিয়ের আংটিটা তোমার কাছে চেয়ে নিলাম। সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে। জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি। তুমি যেন ঘৃণা কর না।

সাদা টেনিস সার্ট, পায়ে ক্যাম্ব্রিসের জুতো, হাতে কিটব্যাগ। একমাথা উস্কাখুস্কা কাঁচাপাকা চুল। চোখে পু'রু কাঁচের চশমা। শশাঙ্ক সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। শেষবারের মত তালাবন্ধ দরজার দিকে তাকালেন। মায়া কাছা ধরে টানছে। না, আর না। জয় শিবশঙ্কু, উথার দে মকান লাগা দে তাম্বু।

নিচের স্ক্যাটের মেয়েটির কাছে চাবি রাখলেন। বলা যায় না—এই চাবিই

হয়ত আঁচলে বেশে তুমি একদিন ওপরে উঠবে।

—মা! আমার এই কলমটা তোমার খুব ভাল লাগত। এই কলমটা তোমাকে দিয়ে গেলুম মা। তুমি বলেছিলে বেশ লেখে।

—আপনি কোথায় চললেন, এই দুপুরবেলা?

—মনটা বড় উতলা হয়েছে মা, যাই মেয়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি কদিন। তোমরা সব সাবধানে থেকো।

—কলমটা দিয়ে দিলেন?

—আর কি হবে মা। চিঠিও লিখি না, চোখেও দেখি না। তোমার কাছে আমার একটা স্মৃতি থাক, কে বলতে পারে, আজ আছি, কাল হয়ত থাকব না।

শশাংক রাস্তায় নেমে এলেন। মোড়ের মাথায় সেই বড়ো বিকশাঅলা পাদানিতে বসে গাছের ছায়ায় ঝিমোচ্ছে। শশাংক তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—তুমি গত শীতে আমার কাছে একটা সোয়েটার চেয়েছিলে?

—হাঁ বাবু।

—এই নাও।

—শীতের ত এখনও দেরী আছে।

—দর বোকা! দেরি আছে ত কি হয়েছে। একদিন ত আসবেই, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে না।

পাড়ার সকলেই শশাংককে চলে যেতে দেখেছেন। ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো সেই সব কথা থেকে কিছতেই পরিষ্কার হল না, তিনি কোথায় গেছেন। সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বললেন,

—আমাকে ওয়েলসের ডায়েরিয়া অ্যান্ড ডিসেন্ট্রি বইটা দিয়ে বললেন, রাখ তোমার কাজে লাগবে। এক পুরানো অশ্রের ওষুধ খেলেন। জিহ্বের কলম, এমন সময় কোথায় চললেন কাকাবাবু? হাসতে হাসতে গান গেয়ে ওঠেন, জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই।





## মেন্সাল অফিসার

রামপ্রসাদ গান গেয়েছিলেন, মা আমার ঘুবাবি কত, এমন চোখ বাঁধা কল্লুর  
বলদের মত। আর আমাদের এই প্রসাদ, প্রসাদ মিত্র ডাকবাংলার হাতার বসে  
মনে মনে বলছেন, কি ফ্যাসাদে ফেললে প্রভু। কারুর ওয়াইফও নই, মিউ-  
ওয়াইফও নই, অথচ এ কি পাপ! কুকুং ছানা কোলে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকতে  
হবে কে জানে! কংই বংই করলেই চাকরি চলে যাবে।

সময়, সন্ধ্যা। স্থান, একটি জেলা শহর। শীত আসছে। বাতাসে ঠান্ডার  
আমেজ। বেলা একটার সময় ডাকবাংলার এবটা জিপ এসে ঢুকেছিল। ত্রি-  
পথকে নেমেছিলেন সন্তীক এস. ডি. ও.। মেমসাহেবের কোলে ছিল এই কুকুরটি।  
এখন প্রসাদের কোলে।

প্যারেরিয়ানের বাচ্চা। মেমসাহেব মন্থে ককককে দাঁতের হাসি খেলেছে,  
শরীর দু'লিঙ্গে মস্তুর হাতে কুকুর বাচ্চাটি দিতে দিতে বলেছিলেন, দিস ইজ ময়  
ইওর ওয়াইফ স্যার। গতবার এসে আমাকে বলেছিলেন। আই প্রিমিড হার এ

বিট। আমাদের কুকুরটা তখন প্রেগনান্ট ছিল। সেন্টপারসেন্ট পের্ডিগ্রাড। ঠিক মত মানুষ করতে পালে শি উইল বি এ জয় ফর এভার।

এস. ডি. ও. ভেট দিয়ে চলে যাবার পরই মিনিষ্টারের খেল শুরুর হয়েছে। মিনিট পাঁচেক কুকুরটাকে খাঁটোখাঁটির পরই তাঁর অরুচি ধরে গেল। (দলে অরুচি ধার মত। তিনবার দল বদল করে, এই খেপে গাঁদা পেয়েছেন।) কুকুরটা প্রসাদের হাতে দিয়ে ডি. এমের সঙ্গে লাগে যেতে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, যত্ন করবে, আদর করবে, আনন্দ রাখবে, যেই দেখবে পেট পড়ে গেছে, দুধে তুলো ভিজিয়ে চুকচুক করে খাওয়াবে। দুধ যেন বেশি বন না হয়, বেশি তরল না হয়। মায়ের দুধের ডাইল্যুসানে নিয়ে আসবে জল মিশিয়ে মিশিয়ে।

কুকুরের মায়ের দুধ কতটা ঘন, কতটা তরল প্রসাদের জানা ছিল না। ডাক বাংলার চৌবিদার, ঝাড়ুদাব, খানসামা কেউই জানত না। পশুপালন হেলথ অফিসারও এ বিষয়ে অজ্ঞ। এত অজ্ঞতায় দেশ চলছে কি কবে, কে জানে। যাই হোক প্রসাদ হাফ দুধ, হাফ জল মিশিয়ে হাতাপাতাল থেকে বরিক তুলো এনে নুটি করে ভিজিয়ে দুধপুঁরে কুকুর বাচ্চাটাকে নানা ভাবে চেষ্টা কবেছিল দুধ খাওয়াবার। সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেঁউ কেঁউ করবে, না হবে। একটু জোর জবরদাস্তি করতেই তুলোর ভালটা কুকুরের গলায় চলে গেল। চোখ উল্টে দম বন্ধ হয়ে মরে আর কি। প্রসাদ রেডি ছিল। কুকুরের প্রাণ বায়র বোরোলেই সেও বুলে পড়বে গলায় দাঁড়ি দিয়ে। কুকুরের কান দুটো ধরে পেছনটা কোঁটো ঠোকার কায়দায় কার্পেটে ষাঁর কতক ঠুকতেই তুলোব ডেলা গলা ছেড়ে পেটে চলে গেল। বিপদ কাটলেও ভয় রয়ে গেল। তুলো পেটে গিয়ে হজম হবে তো। না লিভারে মেয়েদের খোঁপার জালের মত জড়িয়ে বসে থাকবে। সপ্তে সপ্তে নিজেও সমপরিমাণ তুলো দুধে ভিজিয়ে খেয়ে বসে রইল। সেই পক্কর টিকে যে সাহেব আবিষ্কার করেছিলেন তিনিও তো প্রথম নিজের ওপরেই পরীক্ষা করেছিলেন। প্রসাদ একবার ভেটিরিনারি অফিসারকেও ফোন করেছিল। সরাসরি জিগ্যেস করেনি। কায়দা করে জানতে চেয়েছিল, কুকুরে তুলো খেলে কি হয়?

ডাক্তার বলেছিলেন, জুতো খেয়ে যে জাত হজম করে, তুলো তো তাদের কাছে বেঁচের মোরশ্বা মশাই।

দুধের গাড়িয়ে সম্ব্যে এসেছে। মশাই মহোদয় নান সেরে শরীরে পাউডার ঢেলে ভক্ষমাখা মহাদেবাটি হয়ে ধ্যানে বসেছেন। মাথার ওপর পাই পাই পাখা

ঘুরছে। শরীরের চাপে ডানলোপিলো দেবে গেছে। কোণের টেবিলে রূপোর ফোল্ডিং ফেমে মশরী গুরুদেব বাঘছালে বসে আছেন। শিবনেত্র হয়ে। আর একদিকে মা মহামায়া। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ধ্যানের মাথাও তত বেড়ে যাচ্ছে। জন্মপত্রিকা নিয়ে জ্যোতিষীরা অংক কষে চলেছেন। হস্তরেখাবিদরা হাতের ওপর ম্যাগনিফাইং গ্লাস ফেলছেন।

মশরীর হুকুমে প্রসাদ কুকুর কোলে পাকুড় গাছের তলায় বসে আছে। কেউ কেউ শব্দে ধ্যানভংগ যেন না হয়। তৃতীয় নয়নে ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছেন। আর একবার গদি চাই। কত কাজ বাকি! নিজের এলাকায় জমিজমা গেড়েছে। বাস আর ট্যাক্সি খাটছে। এইবার সিনেমা হল, আর একটা কোল্ডস্টোর হলেই কে আর গদির পরোয়া করে! চুলোয় যাক তোদের দেশ, চুলোয় যাক রাজনীতি। চাষীর জমিতেও চাষ হবে, মশরীর জমিতেও চাষ হবে। চাষ হলেই হল। হিমঘর তো দেশের চাষ আবাদে কল্যাণেই। অর্থনীতি বলছে, ধরো, ধরে রাখ, চড়ো আরো চড়ো, তারপর ছাড়ো। মশরী বলে কি মানুষ নন। মানুষের কাজই তো গুরুত্ব। আখের চাষের মতই, আখেরের চাষ।

রাতে মশরী বিশেষ কিছু খেলেন না। লাগে গুরুভোজন হয়েছে। মাছের মূড়ো দিয়ে সোনামুগের স্পেসাল ভাল। সরু সামতী চালের দুচামচে ভাত, একটা মুরগীর ঠ্যাং, এক চৌকো পুডিং দিয়ে রাতের আহার শেষ করে বিশাল একটি চেকুর তুললেন। পেটের মত মুখও গুরুগম্ভীর হয়ে আছে। নির্বাচন আসন্ন। জেলায় পার্টির ভেতরের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। ফাটল ধরেছে চাকল চাকলা। যে যেমন পারছে খাবলা খাবলা টাকা মেরে সরে পড়ছে। কৌদল শূরু হয়ে গেছে। কৌদল থেকে কোদাল। কোদালেই কবর তৈরি হয়। দাঁতে কাঠি খুঁচতে খুঁচতে ডাকবাংলার বারান্দায় পায়চারি করছেন আর সদর করে বারে বারে একটি নামই উচ্চারণ করছেন, বসন্ত, বসন্ত। অসুখ বসন্ত নয়, মানুষ বসন্ত। রাজনীতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। হজমী পায়চারি চালাতে চালাতে প্রগম করলেন, খাওয়া হয়েছে?

প্রসাদ বললে, এইবার বসব স্যার।

মশরী বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার নয়, তোমার নয়, কুকুরের খাওয়া হয়েছে? হয়েছে স্যার।

সারাদিন কলিটার দুষ খেয়েছে।

প্রসাদ বিপদে পড়ে গেল। ক ফোটার লিটার হয় জানা নেই। কেউ যদি প্রগম

করেন ক'লিটার কে'দেছে, কোন উত্তর হয় কি ? প্রসাদ বললে, প্রায় এক বাটি ।

ইডিয়েট । তোমার মাপজোকের কোনও ফ্যাকালটি নেই । চেষ্টাও কর না । সেদিন ডিস্ট্রিক্ট কনফারেন্সে জিগ্যোস করলুম, জেলায় কত ধান হয় ? বলতেই পারলে না । ইনএফিসিয়েন্ট ! মন্ত্রীর সঙ্গে ঘুরছ, স্ট্যাটিস্টিকস তোমার মূখে মূখে থাকা উচিত । যখন যা চাইব, চটপট বলে দেবে । তা না, হাঁ করে নিরেট নীরেনের মত মূখের দিকে তাকিয়ে থাকবে । দেশের বারোটা তোমরাই বাজাবে । যেমন অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের অবস্থা, তেমনি পলিটিক্সের অবস্থা । আমার কি, তোমরাই বদ্ববে ঠালা ।

মন্ত্রী হাই তুললেন । ঘুম আসছে । জড়ান গলায় বললেন, আমি শূন্যে পড়ছি । কাল ভোরেই বেরতে হবে । তুমি কুকুরটাকে কাছে নিয়ে শোবে । মাতুলেহে সারারাত রাখবে । একটা মা বের করার চেষ্টা কর প্রসাদ । পৃথিবীতে মাগের বড় অভাব । খরা চলেছে । স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই, থাকার মধ্যে ছত্রিশটা দল । ভোট ভাগাভাগি । ভাগের মা গংগা পায় না !

চৌকিদার প্রসাদকে বললে, বাবু ওটাকে হিঁস করিয়ে নিয়ে শূন্যে যান । তা না হলে বিছানা ভেজাবে । সব সময়েই তো কে'উ কে'উ করছে । বদ্ববেন কি করে, কোন কে'উটা হিসির । প্রসাদ গাছতলায় কুকুরটাকে রেখে হিস্‌হিস্‌ হিসসস করতে লাগল । চারপাশে গাছ, মাথার ওপর তারাভরা অকাশ । ঠান্ডা বাতাস বইছে । কুকুরটা পায়ের কাছে গোল হয়ে ঘুরছে আর কে'উ কে'উ করছে । মানুষের বাচ্চা হিস বোঝে । কুকুরের ভাষাটা কি ? প্রসাদ বিরক্ত হয়ে বার কতক ঘেউ ঘেউ শব্দ করে কুকুরের ভাষা নকল করার চেষ্টা করল । লাভ হল না । শেষে খৈখৈ হারিয়ে বিছানায় চলে এল । সাথে বলে, মা হওয়া কি মূখের কথা !

অনেক রাতে প্রসাদের ঘুম ভেঙে গেল । পেটের কাছটা ভিজ়ে ভিজ়ে লাগছে । পাজামার দড়টাকে মাতুলন ভেবে মূখে পুরে মন্ত্রীর কুকুর সারারাত চুকুর-চুকুর চুষে ভিজ়িয়ে দিয়েছে । কেমন গদ্ব্টিসদ্ব্টি মেয়ে কোলের কাছে শূন্যে আছে । প্রসাদ বড় সন্তুষ্ট হল, যাক এতক্ষণে কুকুরে কুকুর চিনেছে ।

হাইওয়ে দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ি ছুটেছে । সবদুজ রঙের ঝংঝকে অ্যামবা-সাডার । অন্যান্যাবার প্রসাদ সামনে ড্রাইভারের পাশে বসে, এবারে ইঞ্জিনের গরমে কুকুরের কণ্ট হবে বলে মন্ত্রী নিজেই সামনে বসেছেন । প্রসাদ

পেছনের আসনে। কোলের ওপর তোয়ালে, তার ওপর কুকুর। পাশে প্রাণ্টিকের খুড়িতে দুটো ফিডিং বোতল। একটায় দুধ, আর একটায় জল। প্রসাদের নিজের চান আর ব্রেকফাস্ট না হলেও কুকুরের প্রসাদ না হ'চ্ছে। পাউডার পড়েছে গায়ে, লোমে বর্ষণ পড়েছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে মাঝে মাঝে প্রসাদের কোল ছেড়ে খচরমচর করে পালাবার চেষ্টা বরলেও সুবিধে করতে পারছে না। একদিনে প্রসাদ বাচ্চা সামলাবার কায়দাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। মন্ত্রীকে সামলাতে পারে না ঠিকই, মন্ত্রীও কি পারেন ভোটার সামলাতে, দপ্তর সামলাতে, দল সামলাতে। প্রসাদ ডান হাতের বড়ো আঙুলটা কুকুরকে চুমতে দিচ্ছে, তাইতেই জীবটি বোকা বনে প্রসাদের কোলে পড়ে আছে। সেই একই টেকনিক। দশ মিনিটও তো ওই একই ভাবে পড়ে আছে, রাজনীতির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঘষে। ওঁও জীব এরাও জীব। ওরা পাঁচ বছর পারে আবার এ ব্যাটা ঘণ্টা ছয়েক পারবে না। বোকা বানান কি এতই শক্ত!

মাইল চারেক আসার পর মন্ত্রী বললেন, প্রসাদ এবাব এখানে নাও। প্রসাদ রাস্তার পাশে নেমে কুকুরকে হিস হিস করতে করতে নিজেরই পেয়ে গেল। করার উপায় নেই। গাড়িতে ফিরে এল। মন্ত্রী বললেন, ড্রাই হয়ে গেছে সিসটেম, একটু জলের বোতলটা ধর।

আবার মাইল চারেক গিয়ে মন্ত্রী বললেন, প্রসাদ ড্রাই কর। প্রতি চার মাইল অন্তর প্রসাদ নামে আর ওঠে। এদিকে নিজের পেট ফেটে যাবার অবস্থা। কুকুরের বদলে তাকে রতে বললে ছোটখাট একটা পুকুর তৈরি করে দিতে পারে। শেষে শান্তিপুত্রের কাছে একটা জংলা জায়গায় প্রসাদ কুকুর নিয়ে নেমে আর সামলাতে পারল না। নিজেরও বসে পড়ল। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বোধহয়। পেছন ফিরেই চক্ৰ চড়ক গাছ। কুকুর নেই। কিছন্ন দূরে হাইওয়ের ওপর মন্ত্রীর সবুজ গাড়ি। প্রসাদ চাপাগলায় ডাকল, আয় আয় তু তু। ডাক শুনলে নীচের ঢালু জমি থেকে একটা ঘিমে ভাজা নোড়ি কুকুর উঠে এসে ন্যাজ নাড়তে লাগল। ধ্যার ব্যাটা তাকে কে ডেকেছে। প্রসাদের মনে হল, সে যে ডাকে ডেকেছে তাতে নোড়িই সাড়া দেবে। বিলিতির ডাক আলাদা। জোরে ডাকতে পারছে না, মন্ত্রী শুনতে পেলো যাবেন। হঠাৎ নোড়িটা ঢাল বেয়ে একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে গড়গড় গড়গড় শব্দ করতে লাগল। মরেছে। মন্ত্রীর কুকুর বোধহয় ঝোপে

গিয়ে ঢুকেছে। কানড়ে ছেড়ে দিলে বন্ধে নেই। পাড়ি কি মারি করে প্রসাদ ঢাল বেয়ে নম্রতে গিয়ে পা হড়কে সড়াত করে ফুট ছয়েক হেঁচড়ে নেমে গেল। প্রসাদের পতন দেখে নেড়িটা ভয়ে সরে গেছে। প্রসাদ কোপঝাড় থেকে বাচ্চাটাকে বগলদ্বা করে কানড়ের হাত থেকে বাঁচালেও নিজে আর ওপরে উঠে আসতে পারছে না। পতন যত সংজ্ঞে হয় আরোহণ তত সহজ হয় না। দুটো হাত কাজে লাগাতে পারলে হয়ত হত। এক হাতে কুকুর। ছফুট ওপরে আকাশের পটে মন্ত্রী মহাশয়ের মুখ দেখা গেল। তিনি কিছন্ন বলার আগেই প্রসাদ নীচে থেকে বললে,

পড়ে গেছি স্যার।

মন্ত্রীর মুখটি প্রসাদের চোখে কালো আর বীভৎস দেখাচ্ছে। পেছনে উজ্জ্বল আকাশের জন্যেই বোধ হয় ওই রকম মনে হচ্ছে। সাদা সাদা দাঁত ফাঁক হয়ে লাভা স্রোতের মত মন্ত্রীবাক্য নিঃসৃত হল,

পড়লে কি করে?

প্রসাদ কুকুরটাকে দেখিয়ে বললে, আজ্ঞে এ বড় বাইরে বরতে নেমেছিল।

ড্রাইভারের সাহায্যে প্রসাদ ওপরে উঠে এল। কেটেকুটে গেছে। হাতে বাবলা কাঁটা ফুটে গেছে। চেহারা দেখে মন্ত্রী বললেন, অপদার্থ! গুড ফর নাথিং।

এক মাসের মধ্যে প্রসাদের প্রমোশান হয়ে গেল। যে ফাইল কিছন্নতেই নড়ছিল না, কখনও ডিপার্টমেন্টে আটকায়, কখনও ফাইনালস থেকে অবজেক্শান নিয়ে ফিরে আসে, সেই ফাইল হঠাৎ সচল হয়ে প্রসাদকে ভাঙা চেয়ার থেকে চেম্বারে তুলে দিলে। মন্ত্রীর কুকুরের বয়েস বেড়েছে, প্রসাদের পদমর্যাদাও বেড়েছে। চেম্বার ছোট হলেও চেম্বার। টেবিলে কাঁচ। চেয়ারের পেছনে ভাঁজ করা তোয়ালে। প্রসাদের কতদিনের আশা। চেম্বারের বাইরে নেমস্টেট। কাঠের টুকরোর ওপর সাদা হরফে লেখা—স্পেসাল অফিসার। কিসের স্পেসাল অফিসার তা ঠিক না হলেও স্পেসাল অফিসার। টেবিলে আবার ঘণ্টা পেয়েছে। টিপলেই কৌঁ কৌঁ করে বেজে ওঠে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল চকখাড়ি দিয়ে স্পেসাল অফিসারের পাশে ব্র্যাকেট দিয়ে কে বা কারা লিখে গেছে, ডগ। প্রসাদ মিত্র। স্পেসাল অফিসার (ডগ)। তা লিখুক। প্রসাদ এখন মিত্র সাহেব। অধস্তনেরা স্যার সম্বোধন করে।

# ওজ আছি কল নেই



‘কে, দীনবন্ধু নাকি? এখানে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছ?’।

‘আরে ভবেশ নাকি? তুমি এ সময়ে। কোথায় চললে? বাড়ি ঢুকলে না? আমাব পাশ দিয়েই ত দূরমুশ করতে করতে গেলে, বোরিয়ে এলে কেন? অফিস থেকে ফিরলে, চা জলখাবার খাবে। কুশল বিনিময় করবে সারাদিনের পর। এমন আধলা ইট খাওয়া লেড়ি কুকুরের মত মূখ কেন গো?’

‘তোমার পাশে একটু স্থান হবে ভাই?’

‘হবে, বারোয়ারি রক, ধুলো বেড়ে বোসো। বেশি ওপাশে যেও না। কেলো এইমাত্র বেপাড়ার এক মস্তান কুকুরের সঙ্গে চুলোচুলি করে এসে সবে ন্যাজ গুটিয়ে শূয়েছে। মেজাজ চড়ে আছে। ষা্যাক করলেই তলপেটে চৌন্দটা।’ ফংফং করে ধুলো উড়িয়ে ভবেশ বসে পড়ল। বসার সময় হাতের আঙুলে কি একটা ঠেকল দীনবন্ধুর বাজারের ব্যাগ। কাঁপ মূলো, ভিজ়ে পালংশাক চারপাশে ছেতরে আছে। দীনবন্ধু অফিস থেকে ফেরার পথে,

রোজই বাজারটা সেয়ে আসে। অভ্যাসটা মন্দ নয়। শীতের ছোট্ট সকাল  
খানিক সময় বেয়েয়। একটু তারিয়ে তারিয়ে দাঁড়ি কামান যায়। নয়ত তাড়া-  
হুড়োয় ধরো আর মারো টান। ছাল চামড়া গুঁটিয়ে স্যফ।

ভবেশ বলে, 'একি বাজার নিয়ে বসে আছ? দু'কদম এগোলেই ত বাড়ি'।  
বাজারটা রেখে এলেই পারতে। এই নোঙবাব মধ্যে ফেলে রেখেছ? পালমে  
ইনফেকসান ঢুকবে।'

দীনবন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'হাতে ঘড়ি নেই, কটা বাজল তোমার  
ঘড়িতে?'

'আটটা বাজতে দশ।'

'উঃ এখনো ঝাড়া দেড় ঘণ্টা।'

'হাঁরে ভাই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা।'

'বন্ধুতে তাহলে পেবেছ কেন বসে আছি?'

'হাঁরে ভাই পেরেছি। একটু চা হলে মন্দ হত না।'

'এখান থেকে হে'কে বিভূতিকে বলো, ভাঁড়ে দুটো চা। দুটো লেড়ো বিস্কুটও  
দিতে বলো।'

দীনবন্ধু আশ ভবেশ খান ছয় বাড়ি ব্যবসানে থাকে। দু'জনেই ভাল  
চাকরি করে। নির্বিরোধী ভদ্রলোক বলে পাড়ায় যথেষ্ট সুনাম আছে।  
এ তল্লাটে সম্ভার জমি পেয়ে দু'জনেই বাড়ি তৈরী করে। দু'পুত্র পরিবার  
নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করছে। সেই কথায় আছে, খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত  
বুনে, কাল হল তাঁতীর হেলে গরু কিনে। দু'জনের বাড়ির ছাদের দিকে  
তাকালে দেখা যাবে পাঁচটি কবে অ্যালুমিনিয়ামের আঙ্গুল আকাশের গায়ে  
ঈশ্বরের আশীর্বাদ খুঁজছে। চ্যাটালো তার বেয়ে সেই আশীর্বাদ ভেন্টিলেটর  
গলে কাঁচের পর্দায় কখনো নৃত্যে, কখনো কথকথায়, কখনো সঙ্গীতে  
গলে গলে পড়ে। সবচেয়ে মারাত্মক দিন শনিবার। সেদিন হয় বাংলা, না  
হয় হিন্দী ছান্নাছাঁবি। গেরস্থের আত'নাদ, পাঁচু প্রাণ যায়।

অদ্য সেই শনিবার। বাংলা ছান্নাছাঁবির আসর। অশ্রুসিক্ত ছাঁবি।  
খটখটে ছাঁবি হলেও দর্শকের অভাব হয় না। পালে পালে ঝলপল করে  
আসতে থাকেন নোন্ডগোন্ড, পুঁচিপেটাকি নিয়ে। দীনবন্ধু টীভি কিনে-  
ছিল এরিয়ারের টাকার স্থায়ীকে খুঁশি করার জন্যে। আহা! একা একা  
ঝড়িতে থাক, সম্মোটা তোমার ভালই কাটবে। স্থায়ীও খুব নেচেছিল। টিভি.



আসবে শুনে আহলাদে আটখানা হবে কচুরি ভেজে স্বামীকে খাইয়েছিল।  
জুট কার্পেট পাভা লবিতে টিভি সগোরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ছাদে ফোস  
করে ফুসে উঠল টিভিগদূলি। সারা পাড়াকে জ্ঞানান দিতে লাগল, আমি  
এসেছি, আমি এসেছি। তোমরা এস হে। এম্বার বুকিয়ে দিয়ে যাও কত  
ধানে কত চাল।

ভবেশ টিভি ফিগেছিল গৃহবন্দী, অবসরভোগী বৃদ্ধ পিতার সাম্যাসংগী  
হিসেবে। দোতলায় পিতার সন্দুহে শয়নকক্ষে নীল পর্দা আটা সেই যন্ত্র  
এখন শক্তিশালী যন্ত্রণা। উজনখানেক বিভিন্ন স্বভাবের বৃদ্ধের পাঠস্তান।  
ভাঁদের হাঁচি, কাসি, নাসিকাঝড়ন, কসহ, মতামত প্রকাশের ঘনঘটাণ প্রতিটি  
সম্মা ভ্রু শকে স্মরণ কবিয়ে দেয়, য পলায়তে স জীবতি।

দুই কৃতকর্মভোগী কৃতী পুরুষ পাঁচবাবুর বকে বসে ভাঁড়ের চা  
খাচ্ছেন। মশা তাড়াচ্ছেন। নর্দমার চাপা গন্ধ শুকছেন আর মনে মনে  
বলছেন, একেই বলে, বাঁশ ফেন কাড়ে আর মোর হিন্দিস্থানে। ভাঁড়টাকে  
সাবধানে পাল্লের তলাব বন্ধ নর্দমায় বিন্দুর্ন দিয়ে ভবেশ বললে, ভট করে চা  
খেয়ে ফেলুন, এড় বাইরে পেলে মরব।

মরবে কেন? বাঁড়িতে গিলে নামিয়ে আসবে।

বাথরুম খালি পেলে তো? বারোটা শকরারোগী মিনিটে মিনিটে  
ছুটছেন, আর প্রতিবার হাতে জল নিয়ে সেইখানে আর গোড়ালিতে  
শাস্ত্রাসম্মত কাপটা মারছেন। চোখ বুকিয়ে বাথরুমের অবস্থাটা একবার  
অবলোকন করার চেষ্টা কর ভাই। কর্পোরেশনও লজ্জা পাবে।

তোমার বাথরুম? আমি মানচক্ষে আমার বনার ঘর দেখছি আর অঁতকে  
আঁতকে উঠছি।

দীনবন্ধুর বসার ঘর ঠেসে গেছে। অনাহুতরা সারি সারি বসে আছেন  
বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মত। কাউকেই ফেরাবার উপায় নেই। শব্দেতা বেড়ে  
যাবে। বলে বেড়াবে, বেটার অহংকার হয়েছে। ভগবানের গুনছুঁচ যোঁদন  
বেলুন ফুটো করে দেবে সেদিন চার্মাচিকির এত চুপসে গাবগাহের তলায় পড়ে  
থাকবে। দীনবন্ধুর স্ত্রী শাপগাপাত্তকে ভীষণ ভয় পায়। লাল আলোয়ান  
গায়ে ওই যে বসে আছেন মীনুর দিদিমা। দুই টুঙেই বাত। অন্য সবাই  
মেঝেতে কার্পেটের ওপর বেবেড়ে আছেন, তিনি বসেছেন সোফায়। মুখপোড়া  
বাত আর জায়গা পেলে না, ধরল এসে হাটুতে। 'কস্তা যাবার সময় ওইটি

‘দিয়ে গেছেন।’

গোবিন্দর মা কোণের দিক থেকে বললেন, ‘ও কথা বলছেন কেন? কতটা এটা বাড়ি রেখে গেছেন, তিনটি ছেলে দিয়ে গেছেন, চার মেয়ে। আর কি চাই?’

‘আ মোলো কথার ছিঁড়ি দেখ। আমরা আজকালের বিবি ছিলুম না তোমাদের মত। সারা জীবন পেটে এটা-টা বিধু না থাকলে আমাদের কালে শরীরটা খালি খালি মনে হত। বহা গব’ করে বলতেন, সুখদা আমার ইন্দুরাল, একটু ঠুকরেছ কি অমনি ঝপাং। হাত ঠেকালেই সোনা। তোমরা হলে ফাঁকিবাজ। একটা কি দু’টা অমনি ছুটলে। কাটিয়ে কুটিয়ে ফাঁকা হয়ে ফিরে এলে।’

দীনবন্ধুর স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললে, ‘কি হচ্ছে দিদিমা? বাচ্চারা বসে আছে।’

‘তুমি আর সাউকুড়ি করতে এস না। ওরা সব বাচ্চার বাবা। দেখলে না ঠুলির বিজ্ঞাপনের সময় কি রকম হাসাহাসি করছিল। তুমি মা এষুগের মেয়ে। তুমি ওসব বুঝবে না। তোমরা হলে মেয়েমানুষ। আমাদের কালে মৃতের কাঁতা শ্রুত পৈত না। দাও এক গেলাস জল দাও। আ মর, সিনেমা বন্ধ করে মাগী সেই থেকে বকেই মরছে। আহা কি রূপের ছিঁড়ি। চুলে বব কবে বসে আছেন। বন্ধের দিকে না তাকালে ছেলে কি মেয়ে বোঝে কার বাপের সাথ্য।’

বুলডগের মত মুখ করে মীনুর দিদিমা পাগলে পাগলে হাওয়া খেতে লাগলেন।

একেবারে লাগোয়া বাড়ির চার বউ রেলের পিস্টনের মত আসা যাওয়া করছেন। স্থির হয়ে বসার উপায় আছে কি? পাশে ছড়ান সংসার। টিলাপাখির ঠুকরে ঠুকরে পেরোয়া খাবার কারদার চার বউয়ের টিঁভি দেখা চলেছে। বোম্বে পাররা বসার মত। বড় বউ যেন দিশী গোলপাররা। বয়সের মাঝ সমুদ্রে বয়সার মত শরীর। তিনি একটি বেতের মোড়া দখল করেছেন।

ভাঁগ সন্ধ্যাসন্ধ্যাত্তে চারপাশে গোল করে মাকে ঘিরে রেখেছে। বসতে না বসতেই তাঁর খেয়াল হল, আলমারির গারে চাবিটা হুলিয়ে রেখে এসেছেন। সন্দি পড়ে আছে আলমারিতে। দিনকাল ভাল নয়। বড়

মেয়েকে বললেন, ‘চাবিটা নিয়ে আয় তো ।’ বড় মেয়ে ছবিতে মশগুল । প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে গান ধরেছে, এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত ? লাল্লা লাল্লা লাল্লা । বড় বললে, ‘ধাক না ।’ মা একটা চাপা হুংকাব ছাড়লেন, ‘টিভি দেখা ঘূঁচিয়ে দেব তোব ।’ মেয়ে অন্যমনস্ক উত্তর দিলে, ‘যাও, সব করবে ।’ মা হুঁহুংকারে বললেন, ‘দেখবি ?’

মীনুর দিদিমা বললেন, ‘দুটোকেই বের করে দাও ।’

বড় বউ মৃদু বেসিকয়ে ভেঙিচি কেটে বললেন, ‘কত বড় সাহস ! যার খন তার খন নয় নেপায় মাবে দই । আপনি বের করে দেবার কে ?’

মীনুর দিদিমা হুংকার ছাড়লেন দীনবন্ধুর স্ত্রীকে, ‘বউমা, ‘বউমা, ‘বউমা ।’

বড় বউ ততোধিক জোবে বললেন, ‘বউমা কি করবে ? বউমা এসে আমার মাথা কেটে নেবে ?’

টিভির পর্দায় নায়ক নায়িকাবা তখন কোরাসে চেপ্সাচ্ছেন, লা লাল্লা, ল্যল্লা, লাল্লা ।

মেজ বউটি যেন সীরাজু পায়রা । লাট খেতে খেতে এলেন । এসেই বললেন, ‘যাও দেখগে যাও, তোমার নতুন সূজনিতে ছোটর ছেলে পেছাব করেছে ।’

‘তোশক ভিজছে, তোশক ভিজছে ?’ বড় বউ মোড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন । ধাক্কার ‘মোড়া কাত হয়ে মহাদেবের ডুম্বরুর মত গড়াতে গড়াতে গদায়ের মার কোলের ছেলেটাব মাথায় গিয়ে খোঁচা মরল । আঁচলচাপা ছেলে চুকুর চুকুর দুধ খাচ্ছিল । অষ্টপ্রহর তিনি চুষতে না পেলে চিল্পে বাড়ি মাথায় করেন, মোড়ার খোঁচায় বোঁটা ছেড়ে তিনি ‘হাইফাই’ স্পিকারের মত ওংরা ওংরা, হোঁয়াও, ওংরাও কবে মিউজিক ছাড়লেন । প্রেমিক প্রেমিকার ‘তুমি, তুমি’ হুঁইসপার চাপা পড়ে গেল । মেজ পত্নী নাচে খসেপড়া পত্নীদের মত জমির হাতখানেক ওপর দিয়ে লাট খেয়ে একপায়ে ঝপাৎ করে বসে পড়ে বললেন, ‘কার মিউজিক ? কার মিউজিক রে ?’

পম্পা, পম্পা চম্পা তিন বোন । বাপ মা দু’জনেই চাকরে । মাথায় মাথায় তিন বোন । পম্পা শরীরের চেয়েও ঘেরে বড় ম্যাকাসি পরে, একবার করে আসছে, বসছে, আবার বোঁরসে যাচ্ছে । আসা আর যাওয়ার পথে এপাশাফের ধাক্কার সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে । প্রথমে উল্টে গেল দাঁড়া টেবিল-ল্যাম্প । শেডফেড ছিটকে চলে গেল ।

মীনুর দিদিমা বললেন, 'দীনুর কা'ড দেখ। মাথার ওপর এত আলো তাতে হচ্ছে না। ব্যাণ্ডের ছাতার মতো আলো গজিয়েছে মেজে থেকে।'

দ্বিতীয়বার ছটকে পড়ল কাটগ্রাসের অ্যাশট্রে। সিগারেটের টুকরো, ছাই, দেশলাই কাঠি কাপের টের ওপর ছত্রাকার। তার ওপর থেবড়ে বসলেন পাশের বাড়ির সেজ বউ। 'সতে বসতে বললেন, 'বৈশিষ্ণব বসবো না। ডাল চাপিয়ে এসেছি।' যেন সমবেত মহিলামন্ডলী তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল তিনি কতক্ষণ বসবেন? কেন বসবেন না?

হঠাৎ সামনের সারির এক বাচ্চা আর একটা বাচ্চার কণ্ঠি ধরে বেশ বারংকক ঝাঁকিয়ে দিল। লেগে গেল দু'জনে ঝটাপটি। তারফার ছিঁড়ে লংডংড হবার আগেই দীনুর বউ দৌড়ে গিয়ে দু'জনকে দু'পাশে সারিয়ে দিল। এ বলে তুই বাপ তুললি কেন, ও বলে তুই বাপ তুললি কেন? দীনুর বাড়ি যে মহিলা কাজ করেন, এরা তাঁর বংশপরম্পরা। কান ধরে বার করে দিলে কাল থেকে তিনি আর কাজে আসবেন না। দু'জনকে দু'কোণে বসাতে হল। সেখান থেকেই তারা মূখ ভ্যাঙার্ভেঙ করতে লাগল। একজনের বই ভাল লাগেনি, সে হাত পা ছাড়িয়ে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে। ঠ্যাং ধরে টেনে সারিয়ে দেবার উপায় নেই। এখুনি বাড়ি ঘেরাও হয়ে যাবে। দীনের বন্ধুরা এসে দীনুর মাথা কামিয়ে, ঘোল ঢেলে ছেড়ে দেবে।

বড় বউ লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে মেয়েদের হুকুম করলেন, 'যা ছোটর বিছানায় করে আয়। ভাসিয়ে দিয়ে আয়।'

মেজ হাতের তালুতে চিবুক রেখে দাঁত চাপা সুরে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ করে আয়, যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তে'তুল।'

যে মেয়ে চাঁবি আনতে রাজি হ'চিছিল না, ঝগড়ার গন্ধ পেয়ে সে তাঁর বেগে ছুটল। ছোট মেয়ে বোকা বোকা, সে ক্রমাম্বয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'দিদি কি করতে গেল মা?' ওপাশ থেকে কে একজন বলে উঠল 'হিসি।'

দীনুর স্ত্রী থাকতে না পেরে রাগ রাগ গলায় বললে, 'টিভি বন্ধ করে দি।'

মীনুর দিদিমা বললেন, 'বাড়িতে বায়স্কোপ বসালে অমন একটু হবেই মা। . 'অধৈর্য' হলে চলে?'

নায়ক নায়িকাকে একটু আদরটাদর করছিলেন। কোণের দিকে বাচ্চাবাঘা বঁসক করে সিটি মেরে উঠল। ওরই মধ্যে প্রবীণা একজন আপত্তি করলেন,

‘এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয় ! ভন্দরলোক ছোটলোক এক হয়ে গেলে যা হয় ।’

ব্যস লেগে গেল ধুন্ধুমাব। ‘ছোটলোক, কথার ছিরি দ্যাখো। নিজের ভাষি ভন্দরলোক। ছেলে তো ছ’মাস বাইরে ছ’মাস ভেতরে ।’

মীনুর দিদিমা হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁগা এই বুঝি তোমাদের উত্তমকুমার ?’

পম্পা পাল তুলে ফড়ফড় কবে চলে গেল। বাতানে দেয়াল থেকে ক্যালেন্ডার খসে পড়ল। পম্পা হ্যাটটিক না করে ছাড়বে না জানা কথা। দৃকপাত নেই। বসেই একগাল হেসে বললে, ‘কি সুন্দর ?’

বড়র মেয়ে ফিরে এনে বললে, ‘ওদের চান্দে হলুদে হাত মূছে দিবে এসেছি। গোদাপায়ের ছাপ মেয়ে এসেছি।’

সেজ বউ বললে, ‘কাঙটা ভাল করনি।’

মেজ বললে, ‘কেন করেনি ? বেশ করেছে। ওদের সঙ্গে ওইরকমই করা উচিত। যেমন কুকুর তেমন মৃগুর। শাস্ত্র আছে।’

সেজ বললে, ‘বাক্স ছেলে শীতের সময় একটু কবে ফেলছে। তোমরা দুজনে আদাজল খেয়ে মেঘেটার পেছনে লেগছে।’

‘তোমাকে ষে উল দিয়ে হাত করেছে। তুমি তো বলবেই।’

দীনবন্ধু ভবেগকে বললে, ‘আমি তো পারা যায় না। সময় যে চলতে চায় না।’

‘প্রায় মেয়ে এনেছি।’

কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়ে গা-ঝাড়া দিল। দীনু বললে, ‘এ ব্যাটাও পেছনে লেগেছে। সেই থেকে খ্যাচর খ্যাচর গা চুলকোচ্ছে আর ভটাস ভটাস গা-ঝাড়া দিচ্ছে।’

বাড়ি ঢুকে দীনবন্ধু প্রথমে গেট বন্ধ করল। দুটো পাল্লাই হাট খোলা ছিল। সদবে ঢোকর মূখে খেড়ে পাপোপাস পায়ের ধাক্কায় মাতালের মত কাত হয়ে পড়েছিল। দীনু ধুলোসমেত টেনেটুনে সেটাকে বধাস্থানে নিয়ে এল। টেবিল ল্যাম্পটাকে সোজা দাঁড় করাতে করাতে বললে, ‘এটা কি হয়েছে। হকি খেলোছিল নাকি ?’

দীনুর স্ত্রী বললে, ‘ওই রকমই হবে।’

‘এ কি, দামী অ্যাশট্রে, এখানে উল্টে পড়ে আছে। তোমরা সত্যি। মীনুর

লিদিমা সিগারেট খাচ্ছিল ?’

দীনুর স্ত্রী বললে, ‘একটা কথা নয়, ওইরকমই হবে।’

‘এক এখানে কে চীনাবাদামের খোসা জড়ো করেছে ? তুমি সত্যি একেবারে কাছাকোঁচা খোলা।’

‘ওইরকমই হবে।’

‘তার মানে ? সামনের শনিবার স্ট্রেট বলে দেবে, হবে না, ঢুকতে দেওয়া হবে না।’

‘আমি পারব না, পারলে তুমি বোলো।’

দীনু চাপা গলায় বললে, ‘আপদ।’

‘তোমারই আমদানি।’

দীনু কাপে’টের ওপর ঝাড়ু চালাতে চালাতে বললে, ‘ধূপ জ্বালো, ধূপ। সারা ঘর ভেপসে উঠেছে।’

টিভির সামনে এসে মনে মনে সেই প্রার্থনা আবার জানাল, ‘হে পিকচার টিউব দয়া করে বিকল হও।’

ওদিকে ভবেশ বৃদ্ধ সিধু জ্যাঠাকে বাড়ি পেঁাছে দিতে দিতে একই প্রার্থনা বিধাতার দরবারে পেশ করল। বৃদ্ধ কাশতে কাশতে বললেন, ‘চোখে ছানি, দেখতে পাই না, তবু সময়টা বেশ কাটে। একটা হিসেবও পাওয়া যায়, কে রইল, কে গেল আজ আছি কাল নেই।’





আমার ছেলেকে আমি সালেব বানাবো।

বঙে নম। শিক্ষায়, দীক্ষায়, মেজাজে, সহবতে। আমি কালো। আমার ছেলে কালো। যখন হাসে, মনে হয় ভাল্লুকে শাঁকালু খাচ্ছে। বাপ হসে-ছেলের সমালোচনা কবা উচিত নয়। বউ ফর্সা, ছেলেটা কেমন যেন আবলুস কাঠের মত হল? অভিজ্ঞরা বলেন, ভেব না, মেয়ে তোমার মেম হবে। ছেলেরা বাপের দিকে যায়, মেয়েরা মায়ের দিকে। কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, কালো চোখের মণি। কালো জগৎ আলো।

সালেব-পাড়ার ইস্কুলে ব্যাটাকে ভাঁত করাতে হবে।

পরস্য যখন আছে কেন করব না। কিন্তু পরস্যার ত আর নামকরা স্কুলের দরজা খুলবে না। সে অনেক হ্যাঁপা। শূনোছি, শিশু যখন মাতৃজঠরে শূনের আকারে গর্ত-সলিলে হেঁট মূন্ডু উখর্ব পুচ্ছ তখনই নাকি ভাল স্কুলের ওয়েটিং লিস্টে নাম লেখাতে হয়। স্ত্রীর কানের কাছে চিংকার করে ইংরেজি বই পড়তে হয়। পূরনো দিনের লেখকের লেখা চলবে না। হাল আমলে লেখক চাই। আমেরিকান লেখক হলে ভাল হয়। গোর ভাইডাল, সল বেলো, স্টেইনবেক। স্ত্রী ডাকলে হ্যাঁ বলা চলে না। বলতে হবে ইয়েস্। এমন

‘কিছু বই পড়ে শোনাতে হবে যাতে ইরানিক স্ল্যাং আছে ! হ্যারলড্ রবিনস, হেডলি চেজ । এ সব করার উদ্দেশ্য, শ্রুণের চারপাশে একটা ইংলিশ মিডিয়াম তৈরী করা । মানে বনেদটাকে বেশ শক্ত করে গেঁথে তোলা ।

আমার শ্যালিকা এ সব ব্যাপারে ভারি এক্সপার্ট । আমার বউয়ের মত গাইয়া নয় । বহুকাল আগেই চুলে তেল মাখা ছেড়েছে । শ্যাম্পু করে চুলের চেহারা করেছে কি সুন্দর । ম্যারিলিন মনরোর মত । ফুবফুর করে হাওয়ার উড়ছে । ঠোঁটে চকোলেট কালারের লিপস্টিক, তার ওপর লিপগ্লস ! আজ পর্যন্ত, আমি একবারও ফ্যাক ফ্যাকে ঠোঁট দেখিনি । অলওয়েজ স্মার্ট । চোখে স্ল্যাক পান্থারের চোখের মত বিশাল এক গগলস । সেকসকে সোচ্চার করে রেখেছে । শাড়ি পরার অসাধারণ কায়দা কোথা থেকে সে রপ্ত করেছে । যেমন কোমর তেমনি তার কায়দার প্রদর্শনী । চীনে খাবার ছাড়া খায় না । মাঝে মাঝে ফদাই খায় । সন্ধ্যা দেখলে আমার বউয়ের মত মেগো করে ওঠে না । শুনোছি মাঝে মধ্যে একটা দুটো বিড়ি ফোঁকাও করে থাকে । নাইটি পরে শতে যায় ।

সেই মায়ের ছেলে পেট থেকে ড্যাডি ড্যাডি করে পড়বে, তাতে আমি আশ্চর্যের কি আছে ! শ্যালিকা বলে, সাজ, পোশাক, আহার বিহারের ওপর মানুষের অনেক কিছু নির্ভর করে । বিকিনি পরলে বাঙালী মেয়েও, কিস মি কিস মি ডার্লিং বলে মি-বীচে ছুটতে থাকবে । শাড়ি পরলে, বলদ, গোমাল, সাজালে, সিঁথির সিঁদুর সম্বন্ধীয় শীথ এই সব মনে আসবে । মনে আসবে ঘুটে, গোবর, গদুল, গজাজল । দোজ ডেজ আর গন পাঁচু !

এখন বাইকের পেছনে বসে ফেন্ডের কোমর জড়িয়ে ধরে অফিসে যাবার যুগ পড়েছে । জীবনের পেছনে লেখা থাকে—Look here. সন্ধ্যার বেলায় আর সাঁঝাল নয় পার্ক স্ট্রীটের আলো আঁধারী, ঝকঝক, ঝকঝক করে বসে লাল ঠোঁটে, লাল পানীয়ের গেলাস !

আমার ছেলের মা সারাজীবন কি করে এল ? ছাপা শাড়ি পরে এতখানি একটা ঝোঁপা করে স্বশ্রু, শাশুড়ির সেবা । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হোসল ঠেলা । পেটে পুই শাক, লাউয়ের ডাল, ছাঁচড়া, খোসা চচ্চড়ি । সেই মায়ের ছেলে ব্যাবা, ব্যাবা করবে না ত, কি করবে ?

বউয়ের ত অনেক ধরন আছে । কেউ বউমা, মানে যার মধ্যে মা মা ভাবটা বেশ প্রবল । কেউ বধু । যার মধ্যে কন্যাভাব প্রবল । কেউ শুধুই বউ,



সাদামাটা, ঘরোয়া একটা ব্যাপার। কেউ ওয়াইফ। স্লিভলেস শ্লাউজ, অর্গ্যান্ডার শাড়ি, সে এক আলাদা ব্যাপার। কেউ আবার মিসেস। একটু রঙ চটা। দেহে তেমন বিন্যাস নেই একটু এলোমেলো। বেঁচে থাকার ধরনটা গেলেও হয়, থাকলেও হয়। সংসার চলছে চলুক।

কথায় আছে, স্বভাব না যায় মলে, ইচ্ছাত না যায় ধূলে। ইচ্ছাত বলে না ইচ্ছলত বলে কে জানে। একই মায়ের দুটি মেয়ে। আমারটি এক রকম, শ্যালিকাটি আর এক রকম। ওই জনোই মানুষের উচিত শ্যালিকাকে বউ করে বউকে শ্যালিকা কবা। সে ত আর হবার উপায় নেই, ভেতরে ভেতরে ফোঁস-ফোঁস করে জীবন কাটাই।

একদিন, দু'দিন ইংরেজী সিনেমায় নিয়ে গেলুম। ঘুমিয়ে ঘুটা পার করে দিলে। কি গো, ঘুমোচ্ছ কি, ছবি দেখ। অত বড় একজন অভিনেতা মারলেন ব্র্যান্ডো।

মুখে সুন্দরি ঠুসে কি যে ইংরিজী বলছে কিছুই বুদ্ধিতে পারছি না মাথামুণ্ডু।

বোঝার চেষ্টা কর।

তুমি কর। পরে আমাকে গল্পটা বলে দিও।

লাও, বোঝা ঠালা।

দ্বিতীয়বার ঘুমের আয়োজন করতে করতে বললে, মোগলাই খাওয়াবে ত। ওই এক শিখে রেখেছে, কলকাতায় এলেই মোগলাই। মোস্তার দৌড়।

কেন চাইনিজ খাবে চলো।

না বাবা আরসোলার গন্ধ!

ফিস ফুই।

না বাবা, হাঙরের তেলের গন্ধ।

আমাদের পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি বললেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, ও সহজে ফগ্নসালা হবে না। এখন দয়া করে চুপ করুন, পরে বাইরে গিয়ে যা হয় করবেন।

ইস্। লজ্জার একশেষ। তারপর থেকে কোনও দিন আর বউকে কোনও ব্যাপারে চাপাচাপি করিনি। যা হবার তা হবে। এখন ছেলেটা বেশ চড়কো হয়েছে, তাকেই মানুষ করার চেষ্টা করি।

অনেক ধর্যারির পর বেশ নামজাদা এক সাবেবী স্কুল থেকে একটা ভর্তি

ফর্ম মিলল। আমার চোশপদ্রুঘের ভাগ্য। ফর্ম জমা পড়বে, তারপর পরীক্ষা দিতে হবে। রেজাল্ট দেখে দশজনকে নেওয়া হবে।

এইটুকু ছেলের কি পরীক্ষা হবে? মূখে এখনও আধো আধো বুলি। কোমর থেকে প্যান্ট খুলে খুলে পড়ে যায়। কেউ কোনও উলটোপালটা কথা বললে অঁড়ে কামড়ে দেয়।

ওই ঠাঁড়ানোটাই ভয়ের। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে যদি কামড়ে দেয়। সারা জীবনের মত হয়ে গেল। নারসারি বাইম আর পড়তে হচ্ছে না। দু'লে দু'লে পড়ে যাও, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। পাড়ার বাঙলা স্কুলে ইন্সটির চটবান জামা প্যান্ট পরা ছেলেদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে কেহানিগিরি কর। পিন্ডি-চটকান ভাত, চাঁড়স ভাতে, কাঁচ কাঁচাল-কা দিয়ে বারিক জীবন গিলে মর।

ছেলেকে খুব ভালিম দিতে খাবলুন মাসখানেক ধরে। পার্থক ইংরেজী, ব্যাড। সাহেনরা উচ্চারণ করে ব্যাড। টিবিটিকির ইংরেজী গেকো। পার্থিট— দ্য ব্যাড, স্ট্রী লোকটি, দ্য উওম্যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি? মানদুষ কবে চাদে গিয়েছিল? কি তাঁদের নাম? স্দুপ্রভাত, গুড মনিং। আমি স্যাণ্ড উইচ খাই, আই ইট স্যাণ্ডউইচেস। স্যাণ্ড মানে বালি, উইচেস মানে ডাইনিয়া। আগামী কাল, টুমরো। হাডের ভেতর থাকে ম্যারো। টুম্যারো। গতকাল, ইয়েসটারডে। বলো বাবা, বলো। মানিক বলো! না, মানিক বড় সেকলে, বাঙলা নাম। বলো জ্যাকি, বলো! আমি ভাল ছেলে, আই অ্যাম এ গোড, গোড না গুডই বলো, আই অ্যাম এ গুড বয়!

পরীক্ষার দিন সাত সকালে স্বামী-স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে গেলুম পরীক্ষা দেওয়াতে। কর্মকর্তারা বললেন, আপনারা রাস্তায় দাঁড়ান, অভিভাবকদের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। ছেলেকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ছেলেও শালা তেমনি। নিজের ছেলেকে কেউ শালা বলে। রাগে বলে। সে ব্যাটা মায়ের কোমর জাঁড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় চেঁচাতে লাগল, না, আমি যাব না।

বলতে চেয়েছিলুম, ডোন্ট বি ফাদিস জ্যাকি। রাগে মূখ দিয়ে বোঁরিয়ে এল, ভুতো, মারব এক চড় রাসকেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফাদার কিচলু। তিনি বললেন, ও, দ্যাটস নট দি ওয়ে।

কি করব ফাদার। রাগে মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।

ওঃ নো নো, খুন চাপলে চলবে না। বি সফ্ট, বি এ ফাদার, নট এ।  
বুচার।

কাম, মাই সান। মাই লিটল হোলি চাইলড।

ফাদার জানোয়ারটার কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মিশনারী কারদার কাছে  
টেনে নিতে চাইলেন।

কোন মাল থেকে কি মাল বেরিয়েছে জানা ছিল না। ভুতো তার পুরনো  
দাওয়াই ছাড়ল। ঘাঁক করে ফাদারের ডান হাতে দাঁত বসিয়ে দিল।

ও গড, হি ইজ এ লিটল সেটান, অ্যান আগলি ডার্কলিং। আই নিড সাম  
অ্যান্টিসেপটিক, এ টেট ভ্যাক।

টেট ভ্যাক লাগবে না ফাদার। ট্রিপল অ্যান্টিজেন দেওয়া আছে।

অ্যান্টি র্যাবিজ দিচ্ছেলেন কি?

সে তো কুকুরকে দেয় ফাদার।

হি ইজ মোর দ্যান এ ডগ।

আমি ওকে একটা কষে চড় মারতে পারি ফাদার! ভীষণ রাগ হচ্ছে।

নো নো ডোন্ট ভু দ্যাট। একটি চড় আপনি আপনার গালে মারুন।

কামড়াবার পর ছেলে একটু শান্ত হল। ফাদারের গাউনের কোলা বেগু ধরে  
আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে স্কুলে গিয়ে ঢুকল। আহা চেহারার যা ছিঁরি  
হয়েছে। তখন অত করে বারগ করলুম, ভদ্রমহিলা শুনলেন না, চোখে কাজল  
পর্যাবার কোনও প্রয়োজন ছিল! সারেরদের ছেলেরা কাজল পরে? সারা মুখে  
কাজল চটকেছে। ভার্গাস, ভুতের মত গায়ের রঙ, তা না হলে কি সুন্দরই না  
দেখাত!

স্কুল বাড়ির দিকে তাকিয়ে দু'জনে গাছতলায় বসে রইলুম পাশাপাশি।  
শালীর ছেলেটা কি স্মার্ট! এই বয়েসেই ইংরেজি গালাগাল দিতে শিখেছে।  
আধো আধো ভাষায় কি সুন্দর লাগে শুনতে! ও ছেলে বিলেত যাবেই। ওই  
জন্মেই লোকে মেম বিয়ে করে। ছেলেটা অন্তত সায়েব হবে। আমার বউটাকে  
দেখ! ঠিক যেন শাড়ি জড়ান প্যাকিং কেস! প্যাকিং কেস থেকে ভুতই বেরবে।

সারা স্কুল বাড়িটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। অসংখ্য শিশু কাঁদছে। হাজার রকম  
সুরে! ঠিক যেন শুরোরের খোঁরাড়ে আগুন লেগে গেছে। কি হল রে বাবা!  
সব অভিভাবকই চণ্ডল হয়ে উঠলেন। কামার পরীক্ষা হচ্ছে নাকি! পরীক্ষক  
হয় ত প্রশ্ন করেছেন—হাউ টু ক্রাই। একটু পরে হয় ত হাসি শোনা যাবে। ঝাক-

বাবা, এই একটা আইটেমে আমার ছেলে ফুল মার্ক'স পাবে। কেউ হারাতে পারবে না।

এক বাঙালী ভদ্রলোক আমার ছেলেকে চ্যাংদোলা করে স্কুল বাড়ি থেকে-  
বেরিয়ে এলেন, ব্যাটা হাত পা ছুঁড়ে চেপ্টাচ্ছে দেখ। কানের পোকা বেরিয়ে  
আসবে।

নিন মশাই, আপনার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান। টিসীমানা থেকে দূর হয়ে  
যান। নিজেকে কেঁদে সব ছেলেকে কাঁদিয়ে এসেছে। নিয়ে যান, নিয়ে যান!

এসো বাবা এসো, কে মেরেছে বাবা?

মায়ের আদিখ্যেতা শূন্য হল। আদর দিয়ে বাদর হয়েছে। দু'চোখ বেয়ে  
কালো জল পড়ছে। ভূতের কাহ্না ত কালোই হবে।

গটাকে নর্দমায় ফেলে দাও!

আহা, বাছা আমার! ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রাসকেল আমার।

কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললাম—চল, তোর আর সায়েব হয়ে দরকার  
নেই। তুই বাঙালীই, হাবি চল।





টিফিনেৰ সময় সোমনাথ বললে, 'আমাৰ মনে হয় যুঁথিকা তোৰ প্ৰেমে  
পাড়েছে।'

যুঁথিকা আমাদেৱ নতুন টাইপিষ্ট। এই মাসখানেক হল চাকৰি পেষেছে।  
শ্যামবৰ্ণা বিস্তৃত মূখটি ভাৱি মিণ্টি। দেহটিও মন্দ নয়। না লম্বা, না বেণ্টে।  
মাথায় অনেক চুল, তা না হলে অত বড় খোঁপা হয় কি করে। চোখে সোনালী  
ফেমেব ফিনফিনে চশমা। হাসলে গালে টোল পড়ে। সামনে দিঘে চলে গেলে  
হৃদয়ে দোলা লাগে। অফিসে আৰু মেঘে আছে, তবো তাদেৱ বেউ না কেউ দখল  
কৰে বসে আছে। যেমন সোমনাথ ৰেবাকে। একমাত্ৰ যুঁথিকাই কি আছে।  
আৰু অপৰপক্ষে আমাৰা দুজন, আমি আৰু বিধান। বিধানৰ সম্প্ৰতি ফুৰেহেছে।  
অফিসে আসছে না।

'কি কৰে বন্ধুটি?'

'টাইপ কৰতে কৰতে মাৰে মাৰেই তোৰ দিকে তাকিলে থাকে।'

আমি যেখানে বসি তার পেছনেই বিশাল একটা জানলা। সেই জানলায়  
হাওড়ার পোল আটকে আছে। যুঁথিকা হয়ত পোলটাই দেখে। মেয়েৰা অত  
সহজে প্ৰেমে পড়বে বলে বিশ্বাসই হয় না। বহুত কাঠখড় পুড়িযে তবো প্ৰেম।  
প্ৰেম কি যাচিলে মেলে, আপনি উদয় হয় শুভ যোগ পেলে।

‘আমার দিকে তাকায় না, আমার পেছনের হাওড়ার পোলের দিকে তাকায়।’

‘তোমার দিকেই। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই কেমন ঘাবড়ে যায়।’

‘ঠিক বলছিঁস?’

‘ডেড সিওর।’

হতেও পারে। সোমনাথ ভেটারেন প্রেমিক। প্রেম কা কচ্ছে। হিন্দি ছবিতে এইরকমই যেন কি একটা বলে। মেয়েহেলে একসপার্ট। মেয়েদের চোখে চোখ রেখে মনের গভীরে ঢুকে যেতে পারে। কথায় কথায় বলে, এই সংসার সমুদ্রে এমন কোন মেয়ে নেই যাকে আগার চারে ভেড়াতে না পারি! বলে বলে লটকে আনব।

সেই সোমনাথ যখন বলছে তখন সত্যিই হয়ত যুথিকা আমার প্রেমে পড়েছে।

‘আমার এখন তাহলে কি করা উচিত?’ প্রশ্নটা বরে কেমন যেন বেখাম্পা লাগল। মেয়ে যেন প্রথম গর্ভবতী হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ চাইছে।

সোমনাথ গম্ভীর মুখে বললে, ‘নট ব্যাড। মেয়েটা ভালই। পটাতে পারলে সহজেই পটবে। তবে প্রেম আর মামলা মকদ্দমা একই নেচারের জিনিস। সময় দিতে হবে। ভাল খেলোয়াড়ের মত খেলতে হবে, খেলাতে হবে। তোকে একটু স্মার্ট হতে হবে। এই ম্যাদামারা, ভিজ়ে বেড়াল ভাবটা সামলাতে হবে। বিএ সোডা ওয়াটার বটল। মূখ খুললেই ভাব আর ভাষার গ্যাজিলা বৃজবৃজ করে বেরোতে থাকবে।’

‘কিন্তু ব্যাপারটা ত এখনও মুখোমুখি হয়নি। চোখাচোখি হয়েছে বললেও ভুল হবে। চোখা হয়েছে চুখি হয়নি।’

‘দ্যাটস ট্রু। তোমার সেই চোখকে এবার কায়দা দেখাতে হবে। চোখে চোখ মারতে হবে।’

‘ছি ছি ছি চোখ মারা খুব গহিত কাজ, লোফারদের কাজ। আমাদের পাড়ার একটা মেয়ে আছে সে চোখ মারে বলে তার নামই হয়ে গেছে চোখমারা মিন্দু। ও ভাই আমি পারব না। ভীষণ শক্ত কাজ। একটা চোখ খোলা রেখে আর একটা চোখ পিচিক করে বোজান।’

‘আরে সে চোখ মারা নয়। এ হল নজরো কা তীর মারে কষ কষ কষ, এক নেহি, দো নেহি, আট নও দশ। স্ট্রেট তাকিয়ে থাকবি প্রেমিকের পাওয়ারফুল দৃষ্টিতে। বিবেকানন্দের চোখ, মজনুুর হৃদয় এই হল প্রেমিকের অ্যানার্টম।’

আমরা দুজনে পাশাপাশি বসে কথা বলছি। চা দিয়ে গেছে চা খাচ্ছি। ওদিকে

আমাদের আলোচনার সাবজেকট উল্টো দিকের দূর সার টেবিলের ওপারে বসে খুঁট খুঁট করে টাইপ করে চলেছে। সোমনাথের কথা শোনার পর আমি একবারও ওদিকে তাকাইনি। যুঁথিকার পাশে বকুল, বকুলের পাশে রমা, রমার পাশে আশা। সারি সারি যুবতী, যৌবন যায় যায় এমন সং মহিলা। সকলেরই কিছু না কিছু অ্যাফেয়ারস আছে।

সোমনাথ বললে, 'তোরা ডেসটাইণ্ড পালটাতে হবে। এই মালকোঁচা মারা ধুঁতি আর দাদু মার্কা শার্ট চলবে না। কের্মারিকের পাজাবি গোটা চারেক বানা। স্টিম লন্ড্রিতে কাচারি। তিন দিনের বেশি পরবি না।'

'বেশ কস্টলি হয়ে যাবে না?'

'তা একটু হবে ভাই। প্রেম আর ব্যবসায় ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কিছু থাকবেই। বিনা পরসায় হয় না। সে হয় মেয়েছেলেদের। মেয়েরা হল রিসিভার। আমরা দিয়ে যাব, ওরা নিয়ে যাবে।'

'কি দেবে?'

সোমনাথ বেমক্কা প্রগ্ন শব্দে রাগ রাগ মূখে তাকাল।

'তুমি শালা জান না কি দেবে? যা দেবার তাই দেবে। প্রেম পাকলে বিয়ে হবে। বিয়ে হলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবি, লাভ ম্যারেজ। লাভ ম্যারেজে একটা ছেলের ইজ্জত কত বেড়ে যায় জানিস? লাভার হল হিরো, টক অফ দি টাউন।'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলুম। প্রেম এবং বিবাহ। প্রেম জিনিসটা মন্দ নয়। কিন্তু বিয়ে! যুঁথিকার সঙ্গে বিয়ে মানে অসবর্ণ বিবাহ। মেয়ে ফেলবে। বাড়ি থেকে লাথি মেয়ে দূর করে দেবে। ত্যাগপদন্তুর করে দেবে। আমার কোর্ডিটাও আবার তেমন ভাল নয়। বদনামের যোগ আছে। চরিত্র নাকি চোট খাবে।

'আচ্ছা সোমনাথ, শুধু প্রেম হয় না ভাই? বিয়ে ফিয়ে বড় কামেলার ব্যাপার। ওটা এভলুয়েট করা যায় না?'

'যায়, তবে কিছু স্টিকি মেয়ে আছে, আঠাপাতার মত গায়ে লেপটে যায়, ছাড়ান যায় না।'

'যুঁথিকাকে তোরা কি মনে হয়?'

'আর একটু স্টাডি করে বলব। তবে জেনে রাখ, প্রেমে অনেক হোঁচট থাকে। কটা প্রেম ম্যাচিওর করে রে! হাতে গোনা যায়। আমাদের

ইনসিওরেন্সের মত। প্রিমিয়াম ল্যাপস করবেই। কেস কাঁচ। ভের্নি-  
ডিফকালট সাবজেকট। মেয়েরা প্রথম প্রেমে খাত পাকায়, দ্বিতীয় প্রেমে-  
খেলা করে, তৃতীয় প্রেমে দাগা খায়। তারপর যখন দেখে যৌবন যায় যায়,  
তখন নাছোড়বান্দা হয়ে ঝুলে পড়ে। বিয়ের ভয়ে পেছিয়ে যান। সিমটম  
যখন দেখা গেছে তখন ব্যাপারটা নিয়ে একটু ড্রিবল কর।’

‘কি ভাবে করব, বলবি ত?’

‘তুইও কাজ করতে করতে যখন তখন তাকাবি। চোখে চোখ ঠেকলে  
উদোবংকার মত ভয়ে চোখ নামিয়ে নিবি না। ধরে রাখবি। আঙুলে আঙুলে  
সময় বাড়াবে। চোখে হাসবি।’

‘চোখে হাসব কি রে! লোকে ত মূখেই হাসে।’

‘আঙুলে না স্যার। প্রেমিকের হাসি চোখে। রোজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে  
প্র্যাকটিস করবি।’

‘ভয় করে।’

‘কি ভয় করে? কাকে ভয় করে? ভয়ের কি আছে রে। প্রেমে আর  
রণে ভয় পেলে চলবে না।’

‘আমাদের পাড়ার মধুকে একটা মেয়ে একবার জুতো মেরেছিল। মধুর  
অপরাধ সে মেয়েটাকে দেখলেই মূর্চকি মূর্চকি হাসত।’

‘মধু ইডিয়েট।’

‘ইডিয়েট! কেন ইডিয়েট?’

‘প্রথমে চোখে চোখে সহিয়ে নিয়ে তারপর হাসতে হয়। দেওয়ালে পেরেক  
ঠোকা। প্রথমে ঠুকুর ঠুকুর তারপর ঠকাস ঠকাস।’

‘যদি আবার ঠেকে বাই।’

‘ঠকে বাই মানে?’

‘এই ত তিন চার দিন আগে। আমি যাচ্ছি, উলটো দিক থেকে একটা  
মেয়ে আসছে। পাড়ারই মেয়ে। মূখ চেনা। হঠাৎ হাসল। আমিও  
হাসলাম। আমি হাসতেই তার মূখটা গম্ভীর হয়ে গেল। খুব নাভাস  
হয়ে গেলম। ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরে তাকালম। আমাকে দেখে হাসে  
নি। সে হেসেছে আমার পেছনে একটা ছেলে আসছিল তাকে দেখে।  
মনটা এত খারাপ হয়ে গেল মাইরি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে কি  
হয়েছিল। মেয়েটা এত নিষ্ঠুর। কুকুরের মত। ওয়ান মাস্টার ডগ।’



সোমনাথ সিগারেট খেতে খেতে বলল, 'ও রকম একটু আধটু মিসফায়ার হবেই। ভাল শিকারীর বন্দুক থেকেও মাঝে মাঝে শিকার ফসকে যায়। প্রেমের পেছনে চোখ নেই। সাকসেসের বাস্তা হল লিপ বিফোর ইউ লুক। জীবনবর্তের মত, ভয় মা বলে ঝাঁপ মার আগুন।'

সোমনাথ মেয়ে মহলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট টানছে। ষড়্ধিকা বকুলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। এবারিন আমার সঙ্গেও হাত হেসে হেসে ও ভাবে কথা লেবে। জগত্যান্ত্র একটা মেয়ে। চুল, খোঁশ, আঁচল। ভাবা মাথ না। ভেতরটা বিকল শূণ্য শূণ্য কবে উঠছে। প্রেমের উপন্যাসে যা পড়েছি তা এবার সত্য হবে। হবে তো?

সিগারেটটা অ্যান্ট্রিতে ঢেপে বসে সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। আমার মথার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে বে বাবা? লোকে হাত দেখে, কপাল দেখে, মুখ দেখে। মাথা দেখে বলে জানা ছিল না। সোমনাথ অ্যাম্পুলজি বলে শুনেনি। অবশ্য নিজে কখনও নামনে হাত ফেলে পবিত্র করে দোঁধনি, অ্যাম্পুলজি না হেয়ারোলাজ।

সোমনাথ হাতের একটা আঙুল আমার মথার চুলে ঠেকিয়েই চার্টিন চাখার মত করে তুলে নিল। 'ইস ছি ছি, তুই চুলে তেল মাখিস? থার্ড ক্লাস। কবে যে তুই মানুষ হাব। নো তেল। চুলে তেল মেখে প্রেম হয় না। প্রেম হল সুবকুবে ব্যাপার। চুল ফুরফুরে, মন ফুরফুরে, প্রেম ফুরফুরে।'

সোমনাথ চলে গেল। আজ আবার ময়দানে খেলা। খেলার মাঠে বাবে। ঠিক ম্যানেজ করে অফিস কাটবে। আমাদের অত সাহস নেই। সাহস না থাকলে পৃথিবীতে কিছু করা যায় না। ক্রীতদাস হয়ে ফাইল রগড়াও। একবার আড়চোখে ষড়্ধিকার দিকে তাকালুম। না আমার দিকে তাকিয়ে নেই। মাথা নীচু করে টাইপ করছে। কানের দুল নড়ছে টিনিটিনি করে। কে কার প্রেমে পড়ছে। আমি ষড়্ধিকার না ষড়্ধিকা আমার। ভেবে লাভ নেই। দেখা যাক কি হয়।

টিফিনের পর দেখা গেল। ছোট্ট লেডিজ রুমাল বের করে ঠোঁটের ঘাম মুছতে মুছতে ষড়্ধিকা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ মাথা ঠোকা-ঠুকির মত চোখে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চোখ নামিয়ে নিলুম। চোখ নামালেও মন-ঝড়িটা

যুধিকার আকাশেই লাট খেতে লাগল। কমলালেবু রঙের শাড়ি পরেছে। সাদা ব্লাউজের হাতা ওপর বাহুতে খাপ হয়ে বসে আছে। একপলকের দেখা? কি জানি, আমাকে দেখছিল, না আমার পেছনে আকাশের টঙে হাওড়ার পোলের সদ্য রঙ করা বলমলে মাথা? সোমনাথ বলে যায় নি কতক্ষণ অন্তর অন্তর দেখা উচিত। পরের বার যখন চোখ তুলে তাকালুম যুধিকা নেই। শূন্য চেয়ার। ধাৎ তেরিকা, গেল কোথায়! এখন ত সব তিনটে। ছুটি হতে পাক্সা দু'ঘণ্টা বাকি। এর নাম প্রেম। গ'দের আঠার মত চেয়ারে যদি আটকেই না বইল তাহলে আর প্রেম হল কি। বড় অভিমান হল। সোমনাথ বলার পর থেকে আমি একবারও সিট থেকে উঠিনি। সামান্য অদর্শনে প্রেম যদি চটকে যায়? সব সময় চোখের সামনে নিজেকে হাজির রেখেছি। দুয়ারে খাড়া এক যোগী। ধূর, প্রেম ফ্রেম সব ফল্‌স। আসলে ক্লান্ত চোখটাকে নীল আকাশে একটু খেলিয়ে নেয়। আমার দিকে তাকাবে কেন? আমি কি সিনেমার হিরো। মেয়েরা হয় হিরোর প্রেমে পড়ে, না হয় ভিলেনের। আমি ত কোনোটাই নই। মাছি মারা কেরানি।

॥ দুই ॥

আমার একটু সকাল সকাল অফিসে আসা অভ্যাস। বাসে-ট্রামে ভিড় কম থাকে। তাছাড়া চড়া রোদে রঙ কালো হবার ভয় থাকে না। দরজা দিয়ে ঢুকতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। যুধিকা এসে গেছে। কেউ কোথাও নেই। বহু দূরে নূপেনবাবু টেবিলে জোড়া হাঁটু ঠেকিয়ে উঠ হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। একটা পিওন খালি এসেছে। পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করে একমনে সারা মাসের ঘুঘের হিসেবে ব্যস্ত। আড়চোখে যুধিকাকে একবার দেখে নিলুম। বেশি দেখ দেখ না। কালকের ঘটনার ঘণ্টনায় আমার ভীষণ অভিমান হয়েছে। কথা বললে বন্ধ করে দিতুম। বলি না বলে বেঁচে গেল।

যুধিকা নিচু হয়ে টেবিলের নীচের ড্রয়ারটা খরে টানাটানি করছে।

‘সরকারী টেবিল। মাঝে মাঝেই ড্রবার আটকে যায়। আমাদেরও আটকায়। লাথাল্যাথি করলে তবে খোলে। খেলোয়াড় না হলে যেমন প্রেম হয় না, সরকারী চাকরিও করা যায় না। তবে একমাস চাকরি হয়েছে মইলার। এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি।

হঠাৎ মনে হল, এই সন্ধ্যোগ। নাও অর নেভার। পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

‘কি খুলছে না? আটকে গেছে?’

উঃ। যুথিকা ওই নিচু অবস্থাতেই ঘাড় বের্কিয়ে খোঁপা লতপতিয়ে আমার দিকে তাকাল। কি মনোরম, কি অপূর্ব, কি অসাধারণ।

‘দেখুন না খুলছে না। চাবি ঘুরে যাচ্ছে অথচ...

‘একেই বলে কলের গ্যাঁড়াকল।’ বাঃ বেশ বোলোছি স্ট্রেট বোলোছি, একটুও আটকাষনি।

‘দেখি, সরুন। এসব লোয়েস্ট কোটেশানের মাল। খোলার ব্যয়দা আছে।’

যুথিকা সোজা হল। এতক্ষণ হেঁট হয়েছিল। আহা মূখটা বেগুন হয়ে গেছে। আমি উবু হয়ে চেম্বারের পাশে বসে পড়লুম। ধূতি পরার ঐ সুবিধে। আমার মন্ডুর একেবারে পাশেই যুথিকার জোড়া ফল। সেটের কি প্রসাধনের গুমোট গন্ধ। ফ্লোরে শাড়ির ঘের ছাড়িয়ে আছে। ভেবেছিলুম আমাকে বসতে দেখে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বন্ধুর মত একটা ভাব করে সরে বসবে। না সে সব কিছুই করল না। একেবারে সহজ। যেমন ছিল তেমনিই বসে রইল জমাটি হয়ে। উঃ সোমনাথ, মার দিয়া কেজলা। যুথিকার একটা হাত তখনও চাবির ওপর।

‘কই দেখি।’

গলাটা একটু কাঁপা কাঁপা মনে হল। হাতে হাত ঠেকল। যেন শক খেলুম। ঠিকই, মেয়েদের শরীরে বিদ্যুৎ আছে। ঠেকলেই কটাস করে মেয়ে দেয়। প্রথম প্রথম ডি-সি। তারপর কনভার্টারে পড়ে এ সি। আঁকড়ে মাকড়ে ধরে।

চাবিটা বোঁ করে ঘুরে গেল। বাঃ বেশ কল ভো। জর মা, দেখো, মা, খুলে দাও মা। প্রেম একবারই জীবনে আসে। বোঁজত করে দিও না। খুলতে পারলেই হিরো। ডানদিক ঘোরান্ছি আর কানদা করে টান্ছি। আমার

ড্রয়ারটারও এই একই অবস্থা ওয়ান, টু, থ্রি। কি গদরবল! খুস করে খুলে গেছে।

‘এই নিন।’ আমার সারা মুখে বিজয়ীর হাসি। দাও শ্যামা সুন্দরী, গলায় বরমাল্য পরিয়ে দাও। এত বড় একটা দরুহ কাজ করে দিলাম। হরধনু ভঙ্গের মত ব্যাপার।

‘খুলেছে?’ যুধিকা কণ্ঠে পড়ল। ডান গালটা আমার মুখের কাছে। ধন্যবাদ টন্যবাদ দেবার কোনও ইচ্ছেই নেই। কাগজ, কার্বন বের করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জাত টাইপিষ্ট। কোথায় প্রেম? উঠে দাঁড়ালুম। পা ব্যথা হয়ে গেছে। আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি! এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেল, মনে কোন রেখাপাত করল না। কি মন রে বাবা! মা কালীর মত পাষাণী। এদিকে বকুল এসে গেছে। আমাকে যুধিকার চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। আমার কৃতিত্বটা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

‘বুঝলেন, আটকে গিয়েছিল। ঘোরে কিন্তু খোলে না।’

বকুল হাতব্যাগ রাখতে রাখতে বললে, ‘কি আটকে ছিল?’

আমাকে উত্তর দিতে হল না, যুধিকা টাইপ মেশিনে কাগজ আর কার্বন পরাতে পরাতে বললে, ‘ড্রয়ারের চাবি।’

বকুল বললে, ‘মুখপোড়া ড্রয়ার, ভেঙে ফেলে দে না?’

আমি হেলে দুলে ধীরে সুস্থে বেশ খেলে খেলে নিজের সিটে গিয়ে বসলুম। চোখ বুজিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাববার মত ব্যাপার। এর পর কি! সোমনাথ আসুক। বেলা বারোটোর আগে আসবে না। ততক্ষণ একটু কাজের অভিনয় করা যাক। তাড়াতাড়ি একটা প্রমোশন চাই। বলা যায় না, যদি ফেসে যাই, বিয়ে করতে হবে। বিয়ে করলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে। তখন এ মাইনেতে চলবে না।

সোমনাথ এসে গেল। বসতে না বসতেই শূন্য করে দিলুম। সিগারেট খেতে খেতে মন দিয়ে শুনল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, ‘এইবার? হোমস্ট নেকসট?’ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমনাথ বললে, ‘কত আছে?’

কি কত আছে?’

‘হ্যাড’ ক্যাশ?’

‘সে আবার কি! হ্যাড’ ক্যাশ দিয়ে কি হবে? দশ টাকা পড়ে আছে।

‘মাস শেষ হতে চলেছে !’

‘গোটা পনের টাকা পড়ে আছে ! কোন রকমে মাসটা চলবে !’

‘ওতে হবে না রে ! তোর একটা ফান্ড তৈরি করতে হবে মিনিমাম পাঁচশো নিম্নে নামতে হবে !’

‘পাঁচশো ! অত টাকা পাব কোথা থেকে ?’

‘কো-অপারেটিভ থেকে লোন নে, আমি গ্যারান্টির দাঁড়াচ্ছি !’

‘ধার বরে প্রেম !’

‘শান্তই আছে ঝগ করে যি। প্রথমে পাঁচশো তারপর কেস বেশ জমে গেলে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে। তোর পাড়ায় লাইব্রেরী আছে !’

‘হ্যাঁ আছে !’

‘মেমবার ?’

‘এক সময় ছিলুম। চাঁদা বাকী পড়ায় ছেড়ে দিয়েছি, একটা বই মেরে দিয়েছি !’

‘বেশ করেছিস। আজই আবার মেমবার হয়ে যা !’

‘লাইব্রেরীর মেমবার হবার সঙ্গে প্রেমের কি সম্পর্ক ! লেখাপড়া করতে হবে নাকি ?’

‘থাক্তে না। অফিসের মেয়েরা বই পড়তে ভীষণ ভালবাসে। কালকে তুই...’

‘কালকে আমি কি করব ?’

‘তুই একটা বই হাতে, মলাটের দিকটা সামনে করে যুথিকার সামনে দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করবি, হেসে হেসে জিজ্ঞেস করবি—কি ড্রয়ার আটকে গেছে নাকি ?’

‘তারপর ?’

‘তারপর বইটা হল টোপ। কি বই দেখি ? ব্যাস বইটা দিবি পড়তে। দিবি আর নিবি, নিবি আর দিবি। দেবে আর নেবে মেলাবে গিলবে !’

‘ভীষণ ভয় পাই রে ! ছাঠ জীবনে এক পড়ুয়া মেয়ের পাল্লায় পড়ে-ছিলুম। বইয়ের পর বই দিয়েই যাই, ফেরত আর পাই না। সাহস করে চাইতেও পারি না। বই পেলে খুশি খুশি ভাব। মেয়েদের খুশি করে ছেলেরা কি রকম আনন্দ পায় ভাব ! বই ফেরত চাইলে যদি রেগে যায়। সেই ভয়ে মাইরি দিয়েই যাই। আমি দিতে থাকি সে নিতে থাকে !’

হাতে তেমনি পরসাও নেই। জলখাবারের জন্য রোজ এক আনা বরাদ্দ। তিরিশ দিনে তিরিশ আনা। পাঁচটা রোববারে পাঁচ আনা বাদ। তার মানে পঁচিশ আনা। এদিকে যাদের যাদের কাছ থেকে বই এনে পড়তে দিয়েছি তারা বই চেয়ে না পেয়ে খেপে বোম! একদিন সবাই মিলে রাস্তায় চেপে ধরে বেথড়ক ধোলাই দিলে। তিনমাস জলখাবার বন্ধ রেখে যার যার বই কিনে ফেরত দিলুম। আর আমার কুমকুম!’

‘কুমকুমটা কে?’

‘আরে সেই বই-মারা মেয়েটা। কি জিনিস মাইরি। পরে জেনেছিলুম ওই মেয়েটা আমাদের মত এক একটা বোকা ছেলে ধরে ধরে বই মেরে নিজের বাড়িতে একটা লাইব্রেরী তৈরি করছিল, একটু মিণিট হাসি, সুন্দর করে টেনে টেনে কথা, উয়ঃ কি সুন্দর ব্যাস, আমরা কাত। গিলোটিনে মাথা পেতে বে-হেড।’

সোমনাথ ফুস্ করে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে;

‘তোর প্রেম নেই! তোর দ্বারা প্রেম হবে না। শালা ইন্সট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বেনেদের মত মেটালিটি। প্রেমিক আর যোগী একই মতের মানুষ। একজন মেরে-পাগল আর একজন ব্রহ্ম-পাগল। দুজনেই পাগল। পাগল না হলে প্রেম হয় না। শ্যাম পাগল বৃন্দাচিকি আগল হারা, তাদের জন্যে সংসার, হিসেবের খাতা, বগলে ছাতা, মৃত্যুতো কীথা।’

‘তুই বুদ্ধিহীন না, আমরা এখন একস্ট্রা খরচ করবার মত টাকা নেই ভাই। এক একটা বইয়ের দাম আট টাকা, দশ টাকা, পঁচিশ টাকা। মেরে দিলেই হাতে হ্যারিকেন।’

‘তবে হাঁ করে বসে থাক। ওদিকে বিধান ভিড়ে পড়ুক।’

সোমনাথ আর কথা না বাড়িয়ে একটা পুরোন বস্তাপচা ফাইল খুলে বসল। ওরকম ফাইল আমার টেবিলেও গোটা কতক আছে। একটা খুললেই সারাদিন হেসেখেলে চলে যাবে। বাইরের আকাশে চাঁপা ফুলের মত রোদ খেলে যাচ্ছে। ফুরফুরে বাতাস। এমন দিনে কি মানুষের দুঃখ কষ্টের ফাইল খুলে বসে থাকা যায়। রাজ্যের আরাজি। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-চিত্র দুটো বাদামী মলাটের তলায় যতদিন চাপা থাকে ততদিনই ভাল। কল্পনার যুদ্ধিকাকে নিয়ে বোটানিকসে ঘুরে বেড়াই।

সোমনাথ চিঠি ড্রাফট করছে। আজ দেখছি কাজে খুব আঠা। দেশের

উন্নতি না করে ছাড়বে না। ওদিকে প্রসন্ন গিয়ে যুঁথকার টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। মূলোর মত দাঁত বের করে খুব হাসছে। যুঁথকাও হাসছে। কোনও মানে হয়! প্রসন্ন আবার ভাল রবীন্দ্র সংগীত করে। চাকরিতে যেমন প্রতিযোগিতা, প্রেমও তেমনি। কোন মেয়ের সঙ্গে একা প্রেম করার উপায় নেই! ফোড়ে, ফেউ জুটবেই। কেকের টুকরো। ডিশে রাখলেই পিল পিল পিঁপড়ে। এখুনি এক কলি গান গেয়ে কেব্লা দখল করে নেবে। দাঁত বড়, গাল ভাঙা, চোখ বসা, এসবের কোনটাই যুঁথকার চোখে পড়বে না। গান গাইতে পারে, বাস, সাতখুন মাপ। আমি নাচ দেখাব। ভাঙড়া নাচ। খুঁত প্রসন্নটা আচ্ছা হারামজাদা! কিছন্নুতেই নড়তে চাইছে না।

‘সোমনাথ!’

‘বল।’

‘গান শিখবি?’

‘গান শিখে কি করব?’

‘ওই দেখ, প্রসন্ন বাটা পাকাধানে মই দিতে গেছে।’

‘শ্যাক না তাতে তোর কি? ভ্যাকুয়ামে প্রেম করবি ভেবেছিস? ফেউ, এর পর ফেউ আসবে। লড়ে জিততে হবে। রোপ ওয়াক। গেল গেল. এল এল। কোন দিন ঘুড়ি উড়িয়েছিস? তুমি ত শালা জীবনে কিছন্নুই করনি শূন্য জন্মে বসে আছে, প্রেম হল ঘুড়ির পাঁচ। কাটতে থাক, কাটতে থাক, একসময় ফাঁকা নীল আকাশ, প্রাণ খুঁড়ে ওড়া। নীলাকাশের সঙ্গে প্রেম।’

সোমনাথ আবার খসখস কবে চিঠি লিখতে শুরুর করল। আমি টেবিল থেকে উঠে পড়লুম। ওদের পাশ দিয়ে একবার চলে যাই। ননপ্লেনিং ক্যাপটেন হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যা ভেবেছি তাই। প্রেমে পড়লে সিকসথ্ সেনস বেড়ে যায়। প্রসন্ন বলছে, এ মণিহার আমার নাহি সাজে রেকডটা আমার আছে। কালই এনে দেবো। ঢং করে একটা সিকি পানের কাছে পড়ল। উঃ কি লাক্! যুঁথকার পরস্যা ব্যাগ থেকে ছিটকে এসেছে। তাড়াতাড়ি তুলে দবার ফন্স মেরে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে গেলুম।

‘আপনার পরস্যা।’

প্রসন্ন হাত বাঁড়িয়ে সিকিটা নিয়ে পকেটে ফেলে গম্ভীর মুখে বললে, খন্যবাদ। হাঁ হাঁ, আকাশ ভরা সুখ তারটাও আছে। কি নেই আমার

কাছে ।’

যাঃ শালা । কি বরাত । প্রসূনের পরসা জানলে কে তুলত । পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেতুম । প্রেম তুমি আমাকে উদার কর । বেশ জমিয়ে প্রেমে পড়ার আগেই কেন হিংসে এসে যাচ্ছে । কেন মনে হচ্ছে প্রেম বড় এক ভরফা । প্রেমে গালি কি গুলান ওয়ে ? হৃদয়ের গাড়ি ঢেকে । ঢুক্ষ আটকে যায় । বেরোতে গেলে ব্যাক করে বেরিয়ে আসতে হয় । আপাতত ব্যাক করে নিজের জায়গায় চলে যাই । মাথায় কিছু আসছে না । সোমনাথই ভরসা ।

মুখ খোলার আগেই সোমনাথ বন্ধে গেছে ।

‘প্রসূন লাইন দিয়েছে । দেখেছি । তোর চেয়ে ভাল ক্যান্ডিডেট । শীতকালে কাশ্মীরী শাল গায়ে দেয় । পাঞ্জাবীটা দেখেছিস, চিকনের কাজ করা । ভাল গান গায় । প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বেশ শক্তিশালী । বেশ কায়দা বরে লড়তে হবে রে ! মেয়েছেলের মন পদ্মপাতায় জল । যাক, তোর আর একটা সুযোগ করে দি । এই চিঠিটা টাইপ করতে দিয়ে আয় । বলবি ডবল স্পেসিং, দুপাশে মার্জিন । আর ফট করে জিঙ্ক্রেস করবি, বিকেলে কি করছেন ?’

‘যদি বলে কেন ? কেনটা আবার যদি খুব চিংকার করে বলে ! পাশে যারা বসে আছে তারা যদি শুনতে পায় !’

‘আ মোলো ।’ সোমনাথ মেয়েলী ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠল । ‘রাসকেল যদি যদি করেই তোর জীবনটা যাবে । যদি যদি আবার কি । জীবন হল, তত্তা মারা পেরেক ।’

‘যদি বলে কেন ।’

‘আবার শালায় যদি । বলবি সোমনাথ কোরবানীর টিকিট কেটেছে ।’ একেবারেই জামপ করে অভদূর !’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ । একেই বলে বলিষ্ঠ অ্যাপ্রোচ । সেকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা । যা যা ।’ যুধিকাকে চিঠিটা টাইপ করার জন্যে দিতেই, সোমনাথ সঙ্গে তার চোখাচোখি হল । সোমনাথ ইশারায় হাতের ভঙ্গী মূখের হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল টাইপ । যুধিকা চোখের সামনে মেলে ধরে বললে, ‘কি সাংঘাতিক হাতের লেখা !’

আমি অমনি ফট করে বলে ফেললাম, ‘আমার হাতের লেখা খুব ভাল ।



মুক্তোর মত ।’ বলে ফেলেই ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলুম । প্রেম মানুষকে জাহির করতে শেখায় । অহমটাকে খুঁচিয়ে তোলে । ভোর ব্যাড ।

যুদ্ধিকা বললো ‘দেখেছি । শিল্পী শিল্পী চেহারা, শিল্পী শিল্পী কথা মানানসই লেখা ।’

যুদ্ধিকার কথা শুনে পা কাঁপছে । উবে বাব্বা, প্রেমের ঘণ্টা বেজেছে ঢং করে । মুখে কথা সরছে না । কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারে ফিরে এলুম ।

সোমনাথ বললে, ‘কি হল ? জিজ্ঞেস করেছিস ? কি বললে ? বিকেলে কি করছে ?’

‘দাঁড়া, এক গেলাস জল খাই ।’

‘কেন ? খিঁচি কবেছে ?’

জলের গেলাসটা নামিয়ে বেখে, হাত দিঘে ঠোট মুছে ফিস ফিস করে বললুম,

‘মরে গেছি, ফিনিশ । বুকটা কেমন বরছে ।’

‘পেটে উইন্ড হয়েছে । একটা পান খা ।’

‘ভাগ শালা । বুক হিল্লোল বইছে, হিল্লোল ।’

‘কেন রে । চোখ মেরেছে ?’

‘মোর দ্যান দ্যাট । তীর মেরেছে । তোর হাতের লেখার নিন্দে করে আমার বললে, “যেমন আপনার শিল্পী শিল্পী চেহারা, ঠিক সেই রকম আপনার কথাবার্তা, ঠিক সেই রকম আপনার মুক্তোর মত হাতের লেখা ।”

‘এইতেই তোর বুক খড়ফড় । ওর গদিতে তোকে দিয়ে খাতা লেখাবে না কি । তোর গালে হাত দিলে কি করবি । দম ফেল করে মরে যাবি । শোন, কোনটা মেরেদের কথা আর কোনটা কথার কথা আগে, বুকতে শেখ । যা জিজ্ঞেস করে আয় ।’

এবার আমার সাহস বেড়ে গেছে । বরফ যখন গলতে শুরু করেছে তখন আর ভয় কি । নদী বইবে কুল কুল । পাখি গাইবে গান, পিউ কাঁহা । গড়গড়িয়ে চলে গেলুম ।

‘আজ বিকেলে কি করছেন ?’

‘ক্লাস আছে ।’

‘কিসের?’

‘স্টেনোগ্রাফির।’

‘ও।’

সোমনাথের কাছে ফিরে এলুম, ‘ওর স্টেনোগ্রাফির ক্লাস আছে।’

‘বলে আর ক্লাসফ্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা।’

আবার ঘেতে হল, ‘ক্লাসফ্লাস যাই থাক, আজ সিনেমা। কোরবানী।’

‘কোরবানী।’ যেন লাফিয়ে উঠল। ‘কে বললে?’

‘গ্রেট সোমনাথ।’

‘ঠিক আছে।’

সোমনাথকে এসে বললুম, ‘ঠিক আছে।’

সোমনাথ বললে, ‘সিনেমার কথায় যে মেয়ে না বলবে, জানিবি সে অসুস্থ।  
স্ট্রীরোগে ভুগছে।’

সারাটা দুপুর পেটটা কেমন কেমন করতে লাগল। নার্ভাস ডায়েরিয়া  
বেয়ারাকে দিয়ে দুটো ট্যাবলেট আনিয়ে খেয়ে নিলুম। বলা যায় না হলে বসে  
প্রকৃতির বেগ এসে গেলে লজ্জার একশেষ হবে। একেই মেয়েরা গ্যাডিয়েটর  
কিম্বা বুল ফাইটার কিম্বা কাউবয়দেরই ভালবাসে। আমার আবার একটু মেয়েলী  
মেয়েলী ভাব। হরমোন খেয়ে পুরুষ পুরুষ হতে হবে।

দেখতে দেখতে বিকেল। সোমনাথের দুপ্যাকেট সিগারেট উড়ে গেছে।  
অফিস প্রায় ফাঁকা। আমরা তিন জনে লিফটে করে নিচে নেমে এলুম। রাস্তায়  
সোমনাথ হাঁটছে আগে আগে। লিডার অফ দি টিম। পেছনে আমি। আমার  
এক কদম পেছনে যুথিকা। সোমনাথ আমাকে প্রেম বরাতে নিয়ে যাচ্ছে। একেই  
বলে বন্ধুর মত বন্ধু। বন্ধু হো তো অ্যায়সা।

বাইরের আলোয় যুথিকাকে একটু বেশি শ্যামবর্ণ মনে হচ্ছে। হলেও খারাপ  
লাগছে না। হাতে ফোলডিং লেডিজ ছাতাটা না থাকলেই ভাল হত। ছাতা  
হাতে তেমন রোমান্টিক লাগে না। থাকগে, যা করে ফেলেছে। সিনেমায় যাব  
বলে ত আর বাড়ি থেকে বেরোয় নি। বেরিয়েছিল অফিসে।

সোমনাথ ভস ভস করে সিগারেটের খোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আগে আগে গটগট  
করে চলেছে। স্টিম ইঞ্জিন চলেছে। আমরা যেন দুটো বগি। পেছন পেছন  
চলেছি লাফাতে লাফাতে। ইঞ্জিন যে দিকে যাবে, বগিও সেই দিকে যাবে।  
ইঞ্জিন হেলেদুলে একটা নামজাদা রেশোরীর অশ্বকার গভে গিয়ে ঢুকল। বেশ

মনোরম পরিবেশ । প্রেমের সুখপাখি এমন জায়গাতেই পাখা মূড়ে বসতে পারে । ফিসফাস খুঁসখাস, ঘেঁষাঘেঁষি । দুল, চুড়ি, গোর্ফ, দাড়ি, ঘাড়, গলা, চিবুক সব একাবার ।

সোমনাথ ত খুব গ্যাটগেটিয়ে মেয়ে বগলে ঢুকল ! মেয়ে ঢুকল ছাতা বগলে । আমি ঢুকলুম কোঁচা বগলে । কিন্তু ! কিন্তু আর যদিভেই আমার জীবনটা শোয়াপোকার মত কঁকড়েই রয়ে গেল । প্রজাপতি আর হল না । কত বিল হবে কে জানে । টাকা কে দেবে ! আমার পকেটে পনের টাকা পড়ে আছে ।

সোমনাথের বাঁ পাশে যুঁথিকা । আমি বসেছি উল্টো দিকে একা । সোমনাথ মেজর জেনারেলের মত হাঁকল ‘ওয়েটার’ ! বাব্বা কি দাপট ! ‘মেনু প্লিজ’ ! মেনুটা হাতে নিতে নিতে সোমনাথ বললে, ‘জিরাপানি’ । সেটা আবার কি রে বাবা ! মেনুর ওপর আবছা চোখ বুলিয়ে পরের অর্ডার, ‘রোগনজুস । নান । স্যালাড । আইসক্রীম, ভ্যানিলা’ । মেনুটা ওয়েটারের দিকে ঠেলে দিল । হাতটা নিস্পিস্ করে উঠল । একবার টেনে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল, ক-টাকার ধাক্কা । দেখার সুযোগ পাওয়া গেল না । নেভি রু স্টুট পরা ময়ূব ছাড়া কার্তিকের মত ওয়েটার টুক করে তুলে নিয়ে আলোছায়া ঘেরা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে গেল ।

‘তারপর ম্যাডাম !’ সোমনাথ সব মেয়ের সঙ্গেই ম্যাডাম দিয়ে শুরু করে । এইটাই হল ওর টেকনিক । বিরাট পার্সোনিয়ালিটি, মেগালোম্যানিয়াক । ম্যাডাম বলে যুঁথিকাকে দেয়ালঠাসা করে বসল । ম্যাডাম টেবিলের ওপর হাত রেখে আঙুলে আঙুলে কিলিবিলা খেলছেন । নাকছাঁবি, দুল, চশমা আলো পড়ে চিক চিক করছে । স্বপ্ন, স্বপ্ন ।

সোমনাথ হঠাৎ ছাতাটা যুঁথিকার কোল থেকে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললে, ‘ফরেন ?’

‘হ্যাঁ ফরেন । আমার এক পিসতুতো দাদা আমেরিকা থেকে এনে দিয়েছে !’

সোমনাথ ছাতাটা আবার যুঁথিকার কোলে খচর মচর করে গুঁজে দিল । মেয়েটা সোমনাথের হাতের স্পর্শে কঁপে কঁপে উঠল । উঃ ভাবা যায় না । সোমনাথের কি সাহস রে বাবা । মেয়েরা বোধহয় এই রকম হাতকেই বলে অগ্রেসিভ হ্যান্ড । আমি একটা ভ্যাভাচ্যাকা জরদগ্গবের মত উল্টো দিকে বসে আছি । প্রেম ফ্রেম মাথায় উঠে গেছে । বেশ বুদ্ধিতে পারছি প্রেমের মাঠে আমি এক নাবালক ।

টক টক করে তিন গেলাস জিরাপানি ওয়েটার আমাদের সামনে নামিয়ে রেখে গেলা । সোমনাথ বললে, ‘নে খেতে থাক অ্যাপেটাইজার ।’

পৃথিবীতে কত রকমের যে খাদ্য আছে, পানীয় আছে। এই পঁচিশটা বছর ধরে শূন্য ভাত ডাল আর ডাল ভাত খেতে খেতেই জীবনে অরুচি ধরে গিয়েছিল। জিরাপানিতে চন্দ্রক মেরে পঁচিশ বছরের বোদা মদ্য ছেড়ে গেল। বিশেষ একটা সময়ে মেরেদের স্বাদ না সাধ কি একটা হয় না! মনে হল আজ আমার তাই হচ্ছে।

খাবার এসে গেল। সে এক এলাহি ব্যাপার! ব্যাঙের মত ফুলো ফুলো নান না কি ফেন ওই। মাঝখানে ঘি, কালো জিরে। রোগনজরুস। স্যালাড। সোমনাথ গপাগপ খেতে শূন্য করল। ঘৃথিকাও কম যায় না। আমি মাঝে মাঝে আড় চোখে দেখছি। মনে হচ্ছে আমার সামনে বসে আছে জামাইবাবু আর দিদি। আমি যেন ছোট্ট শ্যালকটি। দৃজনে বেশ জমে গেছে। কথা চলছে, হাসি চলছে। সোমনাথ মাঝে মাঝে বাঁ হাতে চামচে দিয়ে ঘৃথিকার প্লেটে স্যালাড তুলে দিচ্ছে। কোলের ওপর ন্যাপার্কিন পেতে দিচ্ছে। সোমনাথের কাঁধে আমার মদ্য ঘৃথিকায় আসছে। হলে গেল আমার প্রেম। নদী এখন অন্য খাঁড়িতে শূন্য করেছে।

আবার এসে গেল। মাঝখানে আবার কারদা ফরে পাতঙ্গা পিচবোড গোঁজা। মাঝে মাঝে বললে, 'পিচবোড' নয় রে, গুটা বিসকুট। ওকে বলে ওয়াকার।' ঘৃথিকা মাঝে মাঝে সায় বললে, 'আইসক্রীম খাব না। গলা ধরে যাবে।'

সোমনাথ মাঝে মাঝে 'কিছু হবে না ম্যাডাম। ঠান্ডা ঘরে বসে আইসক্রীম খেলে গলায় ঠান্ডা লাগবে।'

সোমনাথ মাঝে মাঝে বেসবাক্য। ঘৃথিকা হেসে হেসে খেলে খেলে আইসক্রীম খেতে লাগল। মাঝে মাঝে আবার গরম জল এল বাটিতে। এক টুকরো লেবু ভাসছে। আমি ভেবেছিলাম মাঝে মাঝে পাক খাওয়া হল ত, তাই জিরাপানির মত লেবুপানি গুসেছে। সোমনাথ মাঝে মাঝে 'মদ্য', একে বলে ফিঙ্গার বোল। লেবুটা হাতে তটকে দে। ইট বোল ফিঙ্গার।' পেছনের দিকে মদ্য ঘৃথিকায় চিংকার করে উঠল, 'বেয়ারা, বিক'।

কি আদেশের সূচনা। ঘৃথিকা মাঝে মাঝে পৃথিবী শাসন করতে পারে, ঘৃথিকা ত সামান্য মহিলা। বিক আমার জিভেতে আটকে গেছে। আমাকে দিতে হলে ঘাঁড় খুলে দিতে হবে। সোমনাথ পকেট থেকে এক গোছা নোট বের করল। ঠোটে সিগারেট। মাঝে মাঝে ঘৃথিকা ছুঁয়ে ধোঁয়া উঠছে চোখের সামনে দিয়ে। নাকের কাছটা কৌচকান। মাঝে মাঝে হলে আছে গ্রেট গ্যাম্বলারের ভাসের চাল

দেবার মত। বিল সমেত পঞ্চাশ টাকার একটা নোট প্লেটের ওপর ফেলে দিল।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরোবার সময় যুথিকার পিঠে তবলার ভেতাই মারার মত ঝরে আঙুলের তিনটে চাপড় মেরে বললে, 'চল, চল।'

বাঃ ভাই। বত কায়দাই জান? আমার প্রেমিকার পিঠে তবলা বাজানো। আমার আর কি রইল। যুথিকা যে ভাবে তোমার কক্ষলানা, তৃতীয় চোখে দেখলে মনে হবে পারফেকট স্বামী-স্ত্রী।

রেস্তোরাঁর উল্টো দিকেই পান সিগারেটের দোকান। বরফের চাঙড়ার ওপর হলদে হলদে পান পাতা শোয়ান। বিশাল দোকান। বিশাল আয়না। বোতলের জল। জর্দার গন্ধ। ধূপ জ্বলছে। সোমনাথ বললে, 'তিনটে মখাই পান। এবটায় পিলাপাতি জুর্দা। আর এক প্যাবেট সিগারেট নিয়ে আস।'

'আমি পান খাই না।'

'তাহলে দুটো নিয়ে আস।'

বুঝলাম এটা আমার ইনভেস্টমেন্ট। সাড়ে বিন টাকা খসে গেছে। যুথিকা পান চিবোচ্ছে আর ঠোঁট উলটে উলটে দেখছে কি রকম লাল হল।

সোমনাথ আমাকে ফুটপাথের একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললে, 'শোন, আমার কাছে দুটো টিবিট আছে। ব্যাপারটা তোর জন্যে প্রায় সড়গড় করেছি, বাবিটা সিনেমা হলে গিয়ে করব। এবটু ইজ দ্য বেস্ট দিলে তুই সামলাতে পারবি না। আমরা চলি, কাল ভোকে সব বসে হবে এসেছে। যেটুকু বাকি আছে হলে হয়ে যাবে।'

সোমনাথ ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে। এবার একটা বগি। আর একটা বগি সাইডিং-এ পড়ে রইল। সেই বগি থেকে কে একজন হই হই করে হেসে উঠল, মূখ্য মূখ্য। প্রেম বলে কিছ: লটকালটকি। আছে শ্যানটিং।